ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী : অবস্থা ও অবস্থান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মালবিকা বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০১৫

ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী : অবস্থা ও অবস্থান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মালবিকা বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী : অবস্থা ও অবস্থান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি আমার পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত যথাযথভাবে উল্লিখিত ও স্বীকৃত হয়েছে। আমি এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর অংশবিশেষ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করিনি।

তারিখ : ২৫ জুন, ২০১৫

মালবিকা বিশ্বাস
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং : ১৪৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, সংস্কৃত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মালবিকা বিশ্বাস কর্তৃক উপস্থাপিত "ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী : অবস্থা ও অবস্থান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি গবেষকের একক মৌলিক গবেষণার ফল। তিনি এই অভিসন্দর্ভটি সামগ্রিক বা আংশিকভাবে অন্যকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি অভিসন্দর্ভটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং এর মৌলিকত্ব বিচার করে অভিসন্দর্ভটিকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী
তত্ত্বাবধায়ক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০

তারিখ : ২৫ জুন, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আভা রানী বিশ্বাস
আমার পরমশ্রদ্ধেয়া মাতা
– যাঁর নিরন্তর আশীর্বাদ ও
অশেষ স্নেহ আমার জীবন চলার পাথেয়

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

সূচিপত্র

মুখবন্ধ			[ক]
প্রথম অধ্যায়	:	অবতরণিকা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	ভাস ও তাঁর নাট্যসাহিত্যের পরিচয়	৭
তৃতীয় অধ্যায়	:	প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী	৩৭
চতুর্থ অধ্যায়	:	ভাসের নাট্যসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	১৪৯
পঞ্চম অধ্যায়	:	ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান	২১৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	উপসংহার	২৭৩
গ্রন্থপঞ্জি			২৮১

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের অভূতপূর্ব নাটকীয় পরিবর্তনে অভিভূত হই। এই অভূতপূর্ব নাটকীয় পরিবর্তন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়ভাবে পরিদৃষ্ট হলেও সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে এর কতটুকু প্রভাব পড়েছে বা নারীরা সামগ্রিকভাবে এর সুফল কতটুকু ভোগ করছে তা নিয়ে পণ্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে —— দেশে-বিদেশে নারীবাদী আন্দোলন তথা নারী-স্বাধীনতা, নারী-বৈষম্য, নারী-সমাধিকার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা-আন্দোলন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর এই ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে সামনে রেখে নারীর সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থান লক্ষ করার জন্য পিছনে ফিরে তাকানোর এক অত্যুগ্র ইচ্ছা দীর্ঘদিন ধরে পোষণ করে আসছি এবং প্রাচীন ধ্রুপদী সংস্কৃতসাহিত্য বিশেষ করে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য পাঠ করেছি। আমার এই পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতায় আমি লক্ষ করেছি যে, ধ্রুপদী সংস্কৃতসাহিত্যের মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দীর নাট্যকার মহামতি ভাস তাঁর নাট্যসাহিত্যকর্মে সবচেয়ে বেশি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীচরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিভিন্ন ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-প্রতিবেশের মধ্য দিয়ে তৎকালীন নারীসমাজের এক সামগ্রিক বাস্তব ও বিচিত্ররূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার ভাস তাঁর নারীচরিত্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন অভিজাত শ্রেণির নারীজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন, তেমনি সমাজের নিম্নস্তরের তথা শ্রমজীবী শ্রেণির নারীদের সঙ্গে অভিজাত শ্রেণির নারীদের সম্পর্কের দিকটিও তুলে ধরেছেন। আমরা এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ভাসের নাট্যপ্রতিভার প্রশংসা না করে পারি না। বর্তমান নারীসমাজের অবস্থা ও অবস্থান উপলব্ধির জন্য ভাসের বিশাল নাট্যকর্ম আমাদের সহায়ক হবে —— এই ভাবনা থেকেই আমি আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারীর নিকট এই সুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করি এবং ভাসের নারীচরিত্র নিয়ে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করার কথাও তাঁর নিকট নিবেদন করি। তিনি অত্যন্ত সানন্দচিত্তে আমার এই প্রস্তাবে সদয় সম্মতিজ্ঞাপন করে “ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী : অবস্থা ও অবস্থান” শিরোনামটি নির্বাচন করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নির্দেশনা দেন। আমি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় এই অভিসন্দর্ভ রচনার কাজটি শুরু করি, যার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের এই অভিসন্দর্ভটি।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ্য যে, আমি আমার সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান ব্যবহার করেছি। এছাড়া আমি এই অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত 'রূপক' বা 'নাট্যসাহিত্য' বোঝাতে ক্ষেত্র বিশেষে 'নাটক' শব্দটি ব্যবহার করেছি এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদির নাম সংস্কৃতভাষায় লিখেছি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাক্যের সাবলীলতার জন্য গ্রন্থগুলোর নাম বাংলাভাষায়ও লিখেছি। 'কৌসল্যা', 'বালি', 'কিষ্কিন্ধা' বানান মূল রামায়ণে এভাবেই লিখিত হয়েছে; কিন্তু নাট্যকার ভাস তাঁর নাট্যসাহিত্যে এই বানানগুলোকে 'কৌশল্যা', 'বালী', 'কিষ্কিন্ধ্যা' রূপে লিখেছেন। রামায়ণ আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা রামায়ণের বানান এবং ভাসের নাট্যসাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে ভাসের বানান অক্ষুণ্ন রেখেছি।

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করতে চাই যে, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারীর সার্বিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে এরূপ একটি কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন হতো। শুধু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নয়, সকল প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি প্রদান করে আমার এই কাজটিকে একটি সমন্বিতরূপ প্রদানের জন্য তাঁর উদ্যোগকে আমি হৃষ্টচিত্তে স্বাগত জানাই এবং আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। গবেষণা কর্মের জন্য সময়ে অসময়ে তাঁর বাসায় গেলে তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী মাধবী শর্মা সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও আপ্যায়ন করে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ। সংস্কৃত বিভাগের সকল শিক্ষক বিশেষ করে সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. ফয়েজুন্নেছা বেগম, অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক, অধ্যাপক ড. মাধবী রাণী চন্দ, মিসেস সঞ্চিতা গুহ, ড. ময়না তালুকদার প্রমুখ আমাকে সকল প্রকার সমর্থন ও উৎসাহ দিয়েছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সংস্কৃত বিভাগের সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক, বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ ও সংস্কৃতজ্ঞ ড. পরেশচন্দ্র মণ্ডল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীজীবন থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থানে আসা পর্যন্ত অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আমি মুক্ত ও উদারচিত্তে আজ তাঁকে স্মরণ করছি। আমার একান্ত কামনা তাঁর বিদেহী আত্মা স্বর্গবাসী হোক। একই সঙ্গে আমি আমার অকাল প্রয়াত শিক্ষক অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্যকেও স্মরণ করছি। আমি তাঁরও বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ আমার গবেষণা কর্মে নানা ধরনের পরামর্শ এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়াও আমাকে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়া সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা শ্রী সুকুমার চৌধুরীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমার প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। আমি এ সকল গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এই স্মরণীয় মুহূর্তে আমার স্বামী ডা. পরিতোষ ঘোষের অবদান ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। দীর্ঘ সময় ধরে এই অভিসন্দর্ভ রচনার সময় তাঁর সর্বপ্রকার সহযোগিতা না পেলে আমার এই অভিসন্দর্ভ সমাপ্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমার কন্যা দেবান্বিতা ঘোষ ও পুত্র প্রত্যয় ঘোষ নিরন্তর তাগাদা দিয়ে অভিসন্দর্ভটি দ্রুত সমাপ্ত করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এরা সকলেই আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে।

আমার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন আমার স্বর্গীয় পিতা মণীন্দ্র কৃষ্ণ বিশ্বাস। মূলত তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়-ই আমি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন ও শিক্ষকতা করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার এই উচ্চশিক্ষা সমাপ্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা তিনি দেখে যেতে পারেননি। আমার বিশ্বাস, স্বর্গলোক থেকে তাঁর অনন্ত আশীর্বাদ আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে এবং হবে। আমার বাবার স্বপ্নটি পরিপূরণের জন্য আমার মাতা আভা রানী বিশ্বাস সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পিতৃ-মাতৃ ঋণ অপরিশোধ্য এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আমার ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁদের আশীর্বাদ আমার জীবন চলার পথে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি স্বর্গীয় অধ্যাপক অজিত কুমার রায় আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত দিক-নির্দেশনা—বলা যায় একান্ত শিশুকাল থেকেই দিয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য তিনি কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেননি। আমি আনন্দিত যে, আমি তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে সফল হয়েছি। তাঁর অকাল

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়াণে আমি শুধু দুঃখিত ও ব্যথিত হইনি, আমার একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষীকে হারিয়েছি এবং সেই হারানোর ব্যথা আজও বহন করে চলেছি। আমার মেঝ ভগ্নীপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রদীপ রায়ের সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্যই আমি এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। তাঁর প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া আমি হৃষ্টচিত্তে আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শুক্লা রায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মণীষ রঞ্জন বিশ্বাস ও তাঁর সহধর্মিণী রীতা বিশ্বাস, মেঝ ভগ্নী নন্দিতা রায়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মানবেন্দ্র বিশ্বাস ও তার সহধর্মিণী কবিতা রানী বিশ্বাস, ভাগ্নি প্রজাপতি রায় তুলি ও পূজা প্রদীপ রায় পাপা, ভাগ্নে দিব্য প্রদীপ রায় অন্তর, ভ্রাতুষ্পুত্র ময়ূখ বিশ্বাস বুবকা, মউড় বিশ্বাস কাব্য ও মন্ময় বিশ্বাস কুশল এবং সর্বোপরি আমার ভাসুর ড. চঞ্চল কুমার ঘোষ ও তাঁর সহধর্মিণী দীপিকা ঘোষকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে আমি আমার অত্যন্ত স্নেহধন্য ভাগ্নে অকাল প্রয়াত শান্তনু রায়কেও স্মরণ করছি এবং তার বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করছি।

পরিশেষে দর্শন বিভাগের সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা শ্রী পানু গোপাল পাল ও তার সহধর্মিণী দর্শন বিভাগের সিনিয়র গ্রন্থাগার সহকারী শ্রীমতী জয়া সিংহ রায়কে একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মালবিকা বিশ্বাস

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০

তারিখ : ২৫ জুন, ২০১৫

email: mbbiswas65@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাবস্ট্রাক্ট (Abstract)

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম : **ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী : অবস্থা ও অবস্থান**

গবেষকের নাম : **মালবিকা বিশ্বাস**

বিভাগ : **সংস্কৃত বিভাগ**

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিতীয় শতাব্দীর নাট্যকার মহামতি ভাস নানা দিক থেকে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। ভাসের নাট্যসাহিত্য আকর্ষণীয় এ কারণে যে, তাঁর নাট্যসাহিত্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলরূপ প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁর নাট্যসাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, তাঁর নাট্যসাহিত্যের বিষয়বস্তু, বৈচিত্র্য, ঘটনার ক্রম বিবরণ, উপমা, অলংকার-অনুপ্রাসের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো আজও নাট্যপ্রেমীদের নিকট প্রাসঙ্গিক। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দাঁড়িয়ে আমরা এরূপ বহুমুখী (versatile) প্রতিভার অধিকারী নাট্যকারের নাট্যকর্মে তৎকালীন নারীর অবস্থা ও অবস্থান জানতে প্রয়াসী হয়েছি। মহামতি ভাস-বিরচিত নাটকগুলোকে (রূপক) বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আমরা মূলত চার ভাগে বিভাজিত করেছি: (ক) রামায়ণ-আশ্রিত নাটক (*প্রতিমানাটকম্* ও *অভিষেকঃ*) (খ) মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটক (*দূতবাক্যম্*, *কর্ণভারম্*, *পঞ্চরাত্রম্*, *দূতঘটোৎকচম্*, *ঊরুভঙ্গম্*, *মধ্যমব্যায়োগঃ*, ও *বালচরিতম্*) (গ) ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত নাটক (*প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়নম্* ও *স্বপ্নবাসবদত্তম্*) (ঘ) পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত নাটক (*অবিমারকম্* ও *চারুদত্তম্*)। ভাসের এই বিচিত্রমুখী বিষয়বস্তু চয়নে বিভিন্ন ও বহুমুখী চরিত্রের সমাবেশ থেকে আমরা শুধু তাঁর নাট্যসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রসমূহ নির্বাচন করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থানকে সহজ উপলব্ধির জন্য আমরা বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে ভাস-পূর্ব ধ্রুপদী সংস্কৃতসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, বৈদিকযুগে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কিছুটা সুদৃঢ় হলেও কালক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, *মনুসংহিতা*, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* এবং অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে নারীর অবস্থা ও অবস্থান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকেই দায়ী করেছি। কালের অগ্রগতিতে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজের সকল স্তরের নারীদেরকে নানামুখী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়েছে। নারীরা এর বিরুদ্ধে যে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদ করেননি–তা নয়; কিন্তু সেই প্রতিবাদ একটি সামষ্টিক রূপ (collective) ধারণ করার অভাবে নারীর অবস্থা ও অবস্থান শৃঙ্খলিতই থেকেছে। ভাস-পূর্ব যুগের বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে অশ্বঘোষ পর্যন্ত নারীর অবস্থা ও অবস্থানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা ভাসের নাট্যসাহিত্যে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রসমূহের যেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি, তেমনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এসব নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক. অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রের পর্যবেক্ষণে আমরা লক্ষ করেছি যে, ভাসও একজন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি নারীদের মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে ভাসের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে—তিনি তাঁর নাট্যসাহিত্যে প্রচলিত ধারার বাইরে এসে (প্রতিমানাটকে) সমাজের অভিজাত শ্রেণির নারী কৈকেয়ীকে এবং শ্রমজীবী শ্রেণির নারী মন্থরাকে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এছাড়া সমাজের নিম্নশ্রেণির গণিকাকে তাঁর *চারুদত্ত* নাটকের মুখ্যচরিত্রে স্থান দিয়ে সাহসী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সমাজের আর দশটি নারীর মতো তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় রূপদান করেছেন। ভাসের সমগ্র নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সামগ্রিক বিচারে প্রাচীন ভারতের বৈদিকসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বেশ উন্নত হলেও সমাজ বিবর্তনের ক্রমধারায় রামায়ণ, মহাভারত, *মনুসংহিতা*, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম ইত্যাদিতে নারীর সামগ্রিক অবস্থা উন্নত হওয়ার পরিবর্তে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের অধোগতিই হয়েছে। সুদূর বৈদিকসাহিত্য থেকে ভাস পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণির নারীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; কিন্তু অবস্থানের দিক থেকে অভিজাত ও শ্রমজীবী দুই-ই সমান। তারা পুরুষের সমস্তরে তো যায়-ই নি; বরং ক্ষেত্র বিশেষে দুই ধরনের নারীই পুরুষের নিগ্রহের শিকার। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সাফল্যের যুগে আমাদের সামগ্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হলেও নারীর সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থান প্রায় একই রূপ থেকে গেছে। যে সামান্য পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, তা যেমন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নয়, তেমনি আশানুরূপও নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের প্রতি পুরুষদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হলে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। অথচ আমাদের প্রত্যাশা, পুরুষদের এই দৃষ্টিভঙ্গির আশু পরিবর্তন হবে। আর এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা বৈদিকযুগ থেকে ভাস পর্যন্ত নাট্যসাহিত্যের নারীর অবস্থা ও অবস্থানের একটি অনুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল, মানুষের চিন্তাধারাও তেমনি পরিবর্তনশীল। এই

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনশীলতার হাত ধরেই মানবসভ্যতার অগ্রগতি এবং ক্রমবিকাশ হয়ে আজকের সভ্যতায় উপনীত হয়েছে। বর্তমান এই উন্নত সভ্যতায় মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। লিঙ্গ দিয়ে বিবেচনা করা অভিপ্রেত নয়, সমীচীনও নয়। মানুষ মানুষই। একজন পুরুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে, একজন নারীরও তদ্রূপ ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই নারী শুধু নারী নয়, নারী পুরুষের মতোই স্বমর্যাদায় মহীয়ান একজন মানুষ। এই চেতানাবোধ জাগ্রত হলেই নারী পুরুষের সমাধিকার অর্জন করবে, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর হবে। একটি সুস্থিত ও সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

(মালবিকা বিশ্বাস)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে মানবসভ্যতার উত্থান যেমন বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি ভারতবর্ষে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনসভ্যতার উত্থান বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক। সভ্যতা গড়ে উঠার জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন, তা বহু যুগ ধরেই বিদ্যমান ছিল। সবুজ-শ্যামল প্রান্তর, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী ইত্যাদিসহ অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং সর্বোপরি মাটি ও মানুষের সংস্পর্শে গড়া এক অভূতপূর্ব পরিবেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে বলে মনে করা হয়। ঠিক এরূপ পরিবেশে জীবন-জীবিকার পাশাপাশি মানুষের মনে জগৎ-জীবন সম্পর্কে কৌতূহল এবং পরিবেশ-প্রতিবেশকে জানার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে এক ধরনের বৌদ্ধিক ও অনুধ্যানমূলক চিন্তার জন্ম নেয়। যুগ যুগ ধরে এরই ধারাবাহিকতায় কখনো ধর্মকে কেন্দ্র করে, কখনো বা ধর্মকে বাইরে রেখে ভারতবর্ষে জ্ঞানচর্চার শুরু, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। তাই আমরা লক্ষ করি, খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে বৈদিকসাহিত্যের মতো উচ্চমানের চিন্তাসমৃদ্ধ মননশীল গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্য, পুরাণ, *মনুসংহিতা*, *অর্থশাস্ত্র*-এর মতো পার্থিব জীবনকেন্দ্রিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ঠিক একই ভাবে সভ্যতার অগ্রগতিতে এবং মানবজ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পেয়ে শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতিসহ হরেক রকমের গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জ্ঞানের এ সকল শাখায় মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত ও সৃজনশীল প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে।

ভারতীয় সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ এবং মননসমৃদ্ধ ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য। এই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কখন, কোথায় এবং কীভাবে উৎপত্তি হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতজনের মধ্যে মতভেদ থাকলেও একথা প্রায় নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, কুশানযুগে (খ্রি.পূ. ১ম শতাব্দী এবং খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দী) অশ্বঘোষের মাধ্যমে এই নাট্যসাহিত্যের সূচনা হয়। অশ্বঘোষ বিরচিত প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ এরই পরিচয় বহন করে। প্রাচ্য বিশারদ এস. কে. দে আমাদের এরূপই ইঙ্গিত দেন।[১]

নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ। বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন ভারতবর্ষের অরণ্য-গুহাবাসী মানুষ পরিবেশ ও প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ড অনুকরণ করত এবং তাদের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ও জীবনাচরণ অনুসরণের চেষ্টা করত। সে থেকেই নাট্যসৃষ্টির সূচনা। ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "... আদিম মানবের সেই অ-বাক অনুকরণ (mime) নাট্যসৃষ্টির গোড়ার কথা।"[২]

অশ্বঘোষ-পরবর্তী এবং কালিদাস-পূর্ব যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার মহামতি ভাস। কালিদাস-পূর্ব সংস্কৃত নাট্যাঙ্গনে ভাস শুধু একজন প্রথিতযশা নাট্যকারই নন, ভারতীয় উপমহাদেশের পরবর্তী নাট্যসাহিত্যের উপর ভাসের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব সর্বজন স্বীকৃত। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী তাঁর সময়কাল বলে ভাস বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। তাঁর নাটকসমূহ তাঁর সমকালে মঞ্চস্থ হয়েছে, একালেও তাঁর নাটক দেশ ও বিদেশে মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং দর্শকদেরও তা নন্দিত করছে।[৩] ১৯০৯ সালে মহামহোপাধ্যায় ড. টি. গণপতি শাস্ত্রী ভাসের তেরটি নাটক (রূপক) আবিষ্কার করেন :

১. *প্রতিমানাটকম্*
২. *অভিষেকঃ*
৩. *দূতবাক্যম্*
৪. *কর্ণভারম্*
৫. *পঞ্চরাত্রম্*
৬. *দূতঘটোৎকচম্*
৭. *ঊরুভঙ্গম্*
৮. *মধ্যমব্যায়োগঃ*
৯. *বালচরিতম্*
১০. *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*
১১. *স্বপ্নবাসবদত্তম্*
১২. *অবিমারকম্*
১৩. *চারুদত্তম্*

এসব নাটকের (রূপকের) কাহিনি নির্মাণ, গঠনকৌশল, চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ তথা ভাষা এবং বক্তব্য আকর্ষণীয় ও শিল্পমানসম্পন্ন।

মহামতি ভাস তাঁর সমসাময়িক সমাজে বিদ্যমান নানা ধরনের মানুষের চরিত্রচিত্রণে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। ভাসের নাটকসমূহের (রূপকের) নির্বাচিত নারীচরিত্রসমূহ আমাদের অভিসন্দর্ভের মূলীভূত বিষয়। আমরা দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিচার-বিশ্লেষণে সচেষ্ট হব। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাসের তিনটি নাটক, যেমন, *দূতবাক্যম্*, *কর্ণভারম্* ও *পঞ্চরাত্রম্* –এ প্রত্যক্ষভাবে নারীচরিত্রের উল্লেখ নেই। তবে অন্য চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে নারীচরিত্র উল্লিখিত হয়েছে। ভাসের অন্যান্য নাটকে প্রত্যক্ষ ও সংলাপের মাধ্যমে নারীচরিত্রের উল্লেখসহ পারিবারিক ও সমাজজীবনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ব্যতিক্রমভাবে কয়েকজন নারীর রাজকার্যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে ভাস বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমরা ভাসের নাটকসমূহকে (রূপক) প্রথাগতভাবে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নিম্নভাবে বিভাজিত করেছি :

১. রামায়ণ-আশ্রিত :

(ক) *প্রতিমানাটকম্*

(খ) *অভিষেকঃ*

২. মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত :

(ক) *দূতবাক্যম্*

(খ) *কর্ণভারম্*

(গ) *পঞ্চরাত্রম্*

(ঘ) *দূতঘটোৎকচম্*

(ঙ) *উরুভঙ্গম্*

(চ) *মধ্যমব্যায়োগঃ*

(ছ) *বালচরিতম্*

৩. ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত :

(ক) *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*

(খ)*স্বপ্নবাসবদত্তম্*

৪. পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত :

(ক) *অবিমারকম্*

(খ) *চারুদত্তম্*

উপর্যুক্ত নাটকসমূহে প্রত্যক্ষ এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত মোট নারীচরিত্রের সংখ্যা ১১৪টি। তন্মধ্যে আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিনিধিত্বশীল ৬১টি নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

আবহমানকাল ধরেই সমাজে নারীরা অবহেলিতা, নিপীড়িতা, নির্যাতিতা ও কম-বেশি বৈষম্যের শিকার। অথচ সমাজজীবনে নারীর ভূমিকা কোনো ক্রমেই পুরুষের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এজন্যই সমাজজীবনের রূপকার সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর জীবনকে রূপায়িত করেছেন। নাট্যকার ভাস তাঁর নাট্যসাহিত্যেও নানা ধরনের নারীচরিত্র, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে রূপায়িত করেছেন। নাট্যকার ভাস সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি গবেষণা করেছেন। সেই সব গবেষণা গ্রন্থাকারে এবং পত্র-পত্রিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন গবেষক নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নাট্যকার ভাসকে উপস্থাপন করেছেন। তবে তাঁর নাট্যসাহিত্যে নারীজীবনের রূপায়ণ বিষয়ে কোনো গবেষক পূর্ণাঙ্গ কোনো গবেষণা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এছাড়া ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহের আলোচনা হলেও পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কোনো আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়নি। এই অভাবের কথা বিবেচনা করেই আমি "ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী : অবস্থা ও অবস্থান" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। আশা করি, দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের নাট্যকার ভাস বিরচিত সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে নারীচরিত্রের রূপায়ণ এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও কৌতূহলী পাঠকের নিকট বর্তমান অভিসন্দর্ভটি প্রয়োজনে আসবে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক এবং বিচারমূলক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হবে। তৎকালীন সমাজর প্রেক্ষাপটে ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান কীভাবে বিন্যস্ত ও চিত্রিত হয়েছে, তার স্বরূপ উন্মোচনই বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানত ভাসের নাটকগুলোকেই (রূপক) অনুসরণ করা হবে। এছাড়া নাট্যকার ভাসের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ইতোপূর্বে যেসব গবেষণা কর্ম বিশেষ করে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছে, সেখান থেকেও তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য যে, তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এ যাবৎ প্রকাশিত প্রাপ্ত গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন ওয়েব-সাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করব। অভিসন্দর্ভের শিরোনাম অনুসারে আমরা ভাস বিরচিত নারীচরিত্রের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিসন্দর্ভের বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হব।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের অভিসন্দর্ভের গঠন-পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়	:	অবতরণিকা
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	ভাস ও তাঁর নাট্যসাহিত্যের পরিচয়
তৃতীয় অধ্যায়	:	প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী
চতুর্থ অধ্যায়	:	ভাসের নাট্যসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
পঞ্চম অধ্যায়	:	ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	উপসংহার

আমরা ইতোমধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ভাসের গুরুত্ব, অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণের যৌক্তিকতা, আলোচনা পদ্ধতি ও পরিধি ইত্যাদি নিয়ে আমাদের অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

'ভাস ও তাঁর নাট্যসাহিত্যের পরিচয়' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাসের পরিচয় ও তাঁর সময়কাল, 'ভাস-সমস্যা', ভরতের নাট্যতত্ত্বের আলোকে দশরূপকের লক্ষণ এবং ভাসের তেরটি নাটকের (রূপকের) শ্রেণিকরণসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হবে।

'প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে ভাস-পূর্ব ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, *মনুসংহিতা*, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* ও অশ্বঘোষের নাটকে উল্লিখিত কতিপয় মুখ্য নারীচরিত্রের পারিবারিক অবস্থা আলোচনা করে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থান তুলে ধরব। উল্লেখ্য যে, পুরাণ সাহিত্যের নারীচরিত্র আমরা আলোচনা করিনি। কারণ পুরাণের রচনাকাল দীর্ঘ সময়ব্যাপী। তাই পুরাণে কোনো একক যুগের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'ভাসের নাট্যসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা' শিরোনামে আমরা ভাসের নাট্যসাহিত্য পূর্ণাঙ্গরূপে উপলব্ধির জন্য তাঁর তেরটি নাটকের (রূপকের) অনুপুঙ্খিক বিবরণ, অর্থাৎ প্রতিটি নাটকের অঙ্কভিত্তিক বিষয়বস্তু, পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও নাটক উপস্থাপনা, মূল উৎস থেকে ভাসের নাটকের স্বাতন্ত্র্য এবং সর্বোপরি তাঁর নাটকের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ে 'ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান' শিরোনামে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে ভাসের নাট্যসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিশাল নাট্যসাহিত্যের ক্যানভাসে নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। এ অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে, একজন নারী শুধু নারীই নয়, একজন নারী একই সঙ্গে কন্যা, বধূ ও মাতা। এই পারিবারিক অবস্থার দিক থেকে আমরা ভাসের নাটকসমূহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মুখ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থান তুলে ধরব। এ অধ্যায়টিতেই অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন অধ্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা উপসংহার অধ্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করব যে, ভাস তাঁর নাট্যসাহিত্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান কীভাবে তুলে ধরেছেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Dasgupta, S.N., and S.K. De, *A History of Sanskrit Literature : Classical Period*, Vol. 1, University of Calcutta, Calcutta, 1947, p., 43.

২. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৩০৭

৩.১ বাংলাদেশেও সফলভাবে ভাসের কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ একাধিকবার ভাসের *মধ্যমব্যায়োগঃ* মঞ্চস্থ করেছে (২০১০ সালের ৪-৬ নভেম্বর ও ৩-৪ ডিসেম্বর ওয়াহীদা মল্লিকের নির্দেশনায়)

৩.২ সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (CAT) কামালউদ্দীন নিলুর নির্দেশনায় ঢাকায় শওকত ওসমান মিলনায়তনে নিরঞ্জন অধিকারীর রূপান্তরে *উরুভঙ্গম্* প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ঢাকায় এ নাটকটির আরো মঞ্চায়ন হয়েছে। উক্ত নাট্যদলটি নরওয়ে, জাপান ও ভারতে এ নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে।

৩.৩ ১৯৭৪ সালে বসন্তকালে আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Drama and Theater-এ ভাসের বিখ্যাত *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকটি *The Vision of Vasavadatta* শিরোনামে মঞ্চস্থ হয়। (Rachel Van M. Baumer and James R. Brandon, Edited, *Sanskrit Drama in Performance,* Vol. II, 1st edition : Delhi, 1993, 1st published: University of Hawaii Press, 1981, p. 137)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাস ও তাঁর নাট্যসাহিত্যের পরিচয়

২.১ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ভাস এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। তিনি তেরটি নাটক রচনা করেছেন বলে কতিপয় গবেষক উল্লেখ করেন। অবশ্য এ বক্তব্যের বিরুদ্ধবাদীরা ভাসের নামে প্রচলিত সবগুলো নাটকই ভাসের কি-না তা নিয়ে সন্দেহপোষণ করেন। তবে আমরা প্রথমোক্ত দলে। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

শুধু নাটক রচনার সংখ্যার দিক থেকেই নয়, বিষয় বৈচিত্র্য, সজীব চরিত্রচিত্রণ, উচ্চ কল্পনাশক্তি, স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত রচনাশৈলী ও শিল্পরীতির চাতুর্য, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে সিদ্ধি, অননুকরণীয় নাট্যভাষা প্রভৃতি নাট্যকার ভাসকে তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে।

শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই নয়—দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে ভাস আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন।[১] তাঁর মন, মনন ও মেধা সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে চিরজাগরূক হয়ে আছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রান্তরেখায় আবির্ভূত হয়ে তাঁর নাট্যসাহিত্যের রসগ্রহণের অগ্রযাত্রা কাল থেকে কালান্তরে অব্যাহত রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য-জগতের নাট্যকারদের ক্ষেত্রে এ সৌভাগ্য অর্জন বিরল। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর এই প্রতিভার ও অবদানের কথা মুক্ত ও উদাত্তচিত্তে স্মরণ করে।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ভাস অন্যতম প্রাচীন নাট্যকার। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যকলার পথিকৃৎ ও দিকপাল স্বয়ং কালিদাস উদার কণ্ঠে ভাসের প্রশস্তি গেয়েছেন। *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের প্রস্তাবনায় কালিদাস সূত্রধার-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সংলাপ বিনিময়ের সময় পারিপার্শ্বিকের উক্তিতে ভাসকে একজন প্রথিতযশা নাট্যকার বলে উল্লেখ করেন।[২] শুধু কালিদাসের কাছেই নয়, ভাসের সমসাময়িক অনেকের নিকটই তিনি বিরাট মহীরূহের মতো। তাই তিনি যুগ থেকে যুগান্তরে অনেকের প্রেরণার উৎসস্থল।

প্রাচীন ভারতের একটি চিরায়ত ঐতিহ্য হচ্ছে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে 'স্বেচ্ছায় আত্মসংগোপন'। তাই অতীত ভারতের কোনো কীর্তিমান লেখকদের যেমন সবিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না, ভাসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বৌদ্ধকীর্তির অমর কাহিনি নিয়ে চিত্রিত অজন্তা-ইলোরার অবিনশ্বর শিল্পীদের নাম কিংবা চিরন্তন প্রেমের নিদর্শন সৃষ্টিকারী আগ্রার তাজমহলের নির্মাতাদের নাম যেমন অজানা, তেমনি প্রাচীনকালের কাব্যচর্চার পথিকৃৎগণ উত্তরসূরিদের নিকট নিজনাম এবং কোনো প্রকার চিহ্ন রেখে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই একজন গবেষকের সখেদ উচ্চারণ:

> বিশ্বের সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী বৈয়াকরণ পাণিনি; ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বের ওপর বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থের প্রণেতা যাস্ক; বৈদিক যুগের সেই ঋষিগণ, যাঁরা আমাদের বিশ্বের সর্বাধিক প্রাচীন বলে পরিচিত সাহিত্যস্তম্ভ দান করে গেছেন; ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তা মনু; বৃহত্তম দার্শনিকদের অন্যতম শঙ্করাচার্য, যিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন; ভারতে বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের জনক বরাহমিহির; সংখ্যার যে দশমিক-স্থান পদ্ধতি গণিতের অগ্রগতিতে নীরবে বিপ্লব এনেছিল তার আবিষ্কর্তা আর্যভট্ট; কীর্তিমান্ বৈজ্ঞানিক ব্যাড়ি এবং সর্বশেষে যাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি আমাদের জাতির গর্ব সেই বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাস—এঁরা সকলে আজ আমাদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই নামমাত্র। পাণিনি তো তাঁর গ্রন্থের কোথাও নিজের নামটিও জানান নি।[৩]
>
> ভাসও এর ব্যতিক্রম নন।

উপর্যুক্ত কারণে ভাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে ভাস গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু ভাস যে কালিদাস-পূর্ব এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে কত পূর্বে তা বিচার করে তাঁর কাল নির্ণয় করাই একটি মূল প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে মহাজন বক্তব্য :

> Before 1912 Bhāsa was known only by reputation, having been honoured by Kālidāsa and Bān□a as a great predecessor and author of a number of plays, and praised and cited by a succession of writers in later times; but since then, much discussion has centred round his name with the alleged discovery of his original dramas. Between 1912 and 1915, T. Ganapati Sastri published from Trivandrum thirteen plays of varying size and merit, which bore no evidence of authorship, but which, on account of certain remarkable characteristics, he ascribed to the far-famed Bhāsa.[8]

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত টি. গণপতি শাস্ত্রী কেরলের অন্তর্গত ত্রিবান্দ্রাম থেকে একটি তালপাতার পুঁথিতে মালয়ালম হরফে লেখা তেরটি নাট্যগ্রন্থ আবিষ্কার করেন এবং উক্ত গ্রন্থগুলো যে একই ব্যক্তির রচনা সে সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, উক্ত গ্রন্থগুলোর রচয়িতা হলেন প্রাচীন নাট্যকার ভাস। তেরটি নাট্যগ্রন্থ হলো : *প্রতিমানাটকম্*, *অভিষেকঃ*,

Dhaka University Institutional Repository

দূতবাক্যম্‌, *কর্ণভারম্‌*, *পঞ্চরাত্রম্‌*, *দূতঘটোৎকচম্‌*, *ঊরুভঙ্গম্‌*, *মধ্যমব্যায়োগঃ*, *বালচরিতম্‌*, *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্‌*, *স্বপ্নবাসবদত্তম্‌*, *অবিমারকম্‌* ও *চারুদত্তম্‌* । শাস্ত্রী মহাশয় প্রধাণত নিম্নলিখিত যুক্তি ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বীয় সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেন :

(১) তেরটি নাট্যগ্রন্থের ভাষা, বাগভঙ্গী, নাট্যকলা, রচনাশৈলী প্রভৃতি একই প্রকারের এবং সবগুলো গ্রন্থই শুরু হয়েছে "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ"—এই বাক্যের মাধ্যমে।

কিন্তু সাধারণত সংস্কৃত নাটকের শুরুতেই নান্দী বা মঙ্গলাচরণ শ্লোক থাকে এবং নান্দীশ্লোক পাঠ করার পর উক্ত নির্দেশের মাধ্যমে সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। সুতরাং, গ্রন্থগুলোতে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়।

(২) সাধারণত সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক আরম্ভের পূর্বে নাটকের ভূমিকা অংশকে 'প্রস্তাবনা' বলা হয়। কিন্তু এই তেরটি গ্রন্থের সবগুলোতেই 'প্রস্তাবনার' পরিবর্তে 'স্থাপনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(৩) সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণত নাটকের প্রস্তাবনা অংশে নাটক ও নাট্যকারের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আবিষ্কৃত তেরটি গ্রন্থের কোনোটিতেই নাট্যকারের নাম বা পরিচয় নেই।

(৪) আবিষ্কৃত তেরটি নাট্যগ্রন্থের মধ্যে ছয়টিতেই সামান্য পরিবর্তিতরূপে প্রায় একই রকম 'ভরতবাক্য' লক্ষ করা যায়।[৫]

(৫) মঙ্গলাচরণের পর তেরটি নাট্যগ্রন্থের নয়টিতেই একই প্রকার বাক্য লক্ষিত হয়।[৬]

(৬) বেশ কয়েকটি গ্রন্থে হুবহু একই চরিত্রের একই নাম লক্ষ করা যায়। যেমন, *প্রতিমানাটকম্‌*, *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্‌* ও *স্বপ্নবাসবদত্তম্‌*-এর প্রতিহারীর নাম 'বিজয়া'। আবার *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্‌*, *পঞ্চরাত্রম্‌* ও *ঊরুভঙ্গম্‌*-এর কাঞ্চুকীয়ের নাম 'বাদরায়ণ'। এ ছাড়া অন্যসব সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থে ব্যবহৃত 'কঞ্চুকী' শব্দের পরিবর্তে আবিষ্কৃত সবগুলো গ্রন্থেই 'কাঞ্চুকীয়' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(৭) তেরটি গ্রন্থের বেশিরভাগেই প্রারম্ভিক শ্লোকে মুদ্রালংকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রধান চরিত্রগুলোর উল্লেখ লক্ষ করা যায়, কয়েকটিতে অপাণিনীয় পদের প্রয়োগ যেমন,

Dhaka University Institutional Repository

‘রক্ষন্তে’, ‘ধরন্তে’, ‘আপৃচ্ছামি’ প্রভৃতি এবং একই প্রকার ‘পতাকাস্থান’[৭] প্রয়োগ লক্ষণীয়।

(৮) নবাবিষ্কৃত নাট্যগ্রন্থের একাধিকে হুবহু একই প্রকার উক্তি বা শ্লোক অথবা শ্লোকাংশ লক্ষণীয়। যেমন, *স্বপ্নবাসবদত্তম্* ও *অভিষেকঃ* নাটকে — “কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশঙ্কিতং মে”; *চারুদত্তম্* ও *বালচরিত্রম্*-এ “লিম্পতীব তমোহঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ”; *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* ও *অভিষেকঃ*-এ “ধর্ম স্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতাঃ খলুমাতরঃ”; *স্বপ্নবাসবদত্তম্* ও *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*-এ “ভরতানাং কুলে জাতঃ”; *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*, *প্রতিমানাটকম্* এবং *উরুভঙ্গম্*-এ “উস্‌সরহ অয্যা! উস্‌সরহ”; *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, *প্রতিমানাটকম্*, *অভিষেকঃ*, *পঞ্চরাত্রম্*, *কর্ণভারম্* ও *দূতঘটোৎকচম্*-এ “নিবেদ্যতাং নিবেদ্যতাং” প্রভৃতি।

(৯) আলোচ্য তেরটি গ্রন্থের বেশ কয়েকটিতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের নিয়মবিরুদ্ধ নীতির অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, *প্রতিমানাটকম্*-এ মঞ্চে দশরথের মৃত্যু; *উরুভঙ্গম্*-এ দুর্যোধনের মৃত্যু; *অভিষেকঃ* নাটকে বালির মৃত্যু এবং *বালচরিত্রম্*-এ বধ ও যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। অথচ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মঞ্চে যুদ্ধ, মৃত্যু, বধ ইত্যাদি দৃশ্যের উপস্থাপন নিয়মবিরুদ্ধ।[৮]

সর্বোপরি তেরটি নাট্যগ্রন্থই একই স্থান থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং উপরিউক্ত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, টি. গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত ও প্রণিধানযোগ্য।

অধিকন্তু ভাস গবেষকগণ উল্লেখ করেন যে, টি. গণপতি শাস্ত্রীর সিদ্ধান্তের মূলভিত্তি সপ্তম শতকের কবি বাণভট্ট রচিত *হর্ষচরিত* এবং দশম শতকের কবি রাজশেখর বিরচিত সূক্তিমুক্তাবলীতে উল্লিখিত উক্তি। বাণভট্ট এ প্রসঙ্গে বলেন :

> সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
> সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥
> *হর্ষচরিতম্*, ১/১৫[৯]

অর্থাৎ, ভাস বিরচিত নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সূত্রধারের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আরম্ভ এবং এই নাটক নানা শ্রেণিবিন্যাস সমন্বিত চরিত্র রূপায়ণে সমৃদ্ধ ও কাহিনির বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। একে তুলনা

Dhaka University Institutional Repository

করা চলে পতাকাশোভিত বহুতলবিশিষ্ট সুদৃশ্য মন্দিরের সঙ্গে। আর এগুলোই ভাসের খ্যাতি, যশ ও প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

রাজশেখরও ভাসের নাট্যপ্রতিভার প্রশংসা করে বলেন :

ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ ॥
সূক্তিমুক্তাবলী, ৪/৪৮[১০]

অর্থাৎ, বহুল সমালোচিত ভাসের নাটকগুলোর মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্ত সমালোচনার অগ্নি পরীক্ষায় অক্ষত ছিল।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, নাট্যকার ভাস আলোচ্য *স্বপ্নবাসবদত্ত* ব্যতীত আরো বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং তন্মধ্যে *স্বপ্নবাসবদত্তই* শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত তেরটি নাট্যগ্রন্থের মধ্যেও *স্বপ্নবাসবদত্তম্* বিদ্যমান ছিল এবং গ্রন্থগুলো যে একই নাট্যকারের রচনা সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে যেমন, এ.বি. কিথ, কে.পি. জয়স্বয়াল, এ.ডি. পুসলকর, ড. থমাস, অধ্যাপক পরাঞ্জপে, অধ্যাপক দেবধর প্রমুখ পণ্ডিতগণ উক্ত সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন।[১১] অনেকে পুরোপুরি সমর্থন করেননি, কেউ কেউ আবার বিরুদ্ধাচরণ করেন। এস.এন. দাসগুপ্ত তাঁর *A History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে পণ্ডিত রামাবতার শর্মা, হীরানন্দ শাস্ত্রী, এল.ডি. বারনেট প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেন।[১২] বিরুদ্ধবাদীরা শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তিগুলো খণ্ডন করে নিজ নিজ মতের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁরা বলেন :

(ক) তেরটি গ্রন্থের কোনোটির প্রস্তাবনাতেই নাট্যকার ভাসের নাম উল্লেখ নেই এবং পরবর্তীকালের যে সকল গ্রন্থে ভাসের রচিত হিসেবে শ্লোকের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, সেগুলোর একটিও নবাঙ্কিত নাট্যসাহিত্যে নেই। তদুপরি ভাস রচিত *স্বপ্নবাসবদত্ত* থেকে গৃহীত হিসেবে উদ্ধৃত শ্লোকও শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত *স্বপ্নবাসবদত্তে* অনুপস্থিত।

(খ) গ্রন্থগুলো ত্রিবান্দ্রাম অঞ্চলে আবিষ্কৃত বিধায় এগুলোর বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্যকেই দক্ষিণ-ভারতের পুঁথিগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা যায়—যা অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

না। তবে বৈশিষ্ট্যগুলো কালিদাসসহ পরবর্তীকালের নাট্যকারদের দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিতেও লক্ষিত হয়।

(গ) গ্রন্থগুলোর সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা বা নাট্যশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্য থেকে নিশ্চিতভাবে সেগুলোকে কালিদাস পূর্ববর্তী বলে ধরা যায় না। এ ছাড়া গ্রন্থগুলোতে প্রয়োগকৃত অপাণিনীয় শব্দগুলোকে লিপিকর প্রমাদ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

(ঘ) একই প্রকার বাগধারা, নাট্যকৌশল ও ভরতবাক্যের প্রয়োগ নাট্য-নির্দেশক অথবা অভিনেতৃদের মাধ্যমে মূলরচনায় সংযোজিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যেমন, অনেক বিরুদ্ধবাদী মনে করেন যে, ভাস বিরচিত তেরটি নাটকের গঠনগত সাদৃশ্যসমূহ কেরালার পুঁথি-পুস্তক ও সেখানকার নাট্যকারদের নাটকের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ব্যতীত আর কিছু নয়। তাই তাঁরা বলেন, ভাসের নাটকের তথাকথিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরো দাবি করেন যে, ভাসের নামে প্রচলিত তেরটি নাটক 'চাক্যার' হিসেবে পরিচিত কেরালার নাট্যমঞ্চের পেশাদার অভিনেতাদের সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছু নয়।[১৩]

তাই শুধু রাজশেখর কর্তৃক ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকের উল্লেখ এবং টি. গণপতি শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকের নামের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে উক্ত তেরটি নাট্যগ্রন্থই যে ভাসের রচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অযৌক্তিক বলে বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন। এছাড়া বাণভট্ট কর্তৃক উল্লিখিত ভাসের নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলোও অধিকাংশ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলেও তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

ভাস সম্পর্কিত উপরিউক্ত সপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তি এবং তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তুলনামূলক বিচারে বিপক্ষের যুক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তদুপরি, রাজশেখর কর্তৃক ভাসের নামে *স্বপ্নবাসবদত্তে*র উল্লেখ ও প্রশংসা, কালিদাস ও বাণভট্ট কর্তৃক ভাসের প্রশংসা, ভাস ও কালিদাসের একত্র উল্লেখ ও প্রশংসা এবং গ্রন্থগুলোর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাদৃশ্য প্রভৃতির দ্বারা টি. গণপতি শাস্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই যৌক্তিক বিবেচনা করে প্রাচীন ও প্রথিতযশা নাট্যকার ভাসকেই শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত তেরটি নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে সমর্থন করা সমীচীন হবে বলে আমাদের মনে হয়। এর সপক্ষে ও সমর্থনে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো দেওয়া যেতে পারে : যেমন, ড. সরূপ বলেন, "কলাকৌশল, ভাষা, রীতি, ভাব, নাটকীয় পাত্রপাত্রীর পরিচালনা ও তাদের নামের অভিন্নতা, গদ্য ও পদ্য অংশ এবং

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্যাবলী এই সবকিছুর সঙ্ঘবন্ধ এতই লক্ষণীয় যে এগুলি যে একই লেখকের সৃষ্টি এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য।"[১৪] ড. পরাঞ্জপের মতে, ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলির সমান চেহারাই "সব চেয়ে বড় প্রশ্নাতীত প্রমাণ যা সমস্ত সন্দেহের ওপরে এই সত্য স্থাপন করে যে এই নাটকগুলি একই লেখনীনিঃসৃত।"[১৫]

এছাড়াও অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুরও টি. গণপতি শাস্ত্রীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐক্য মত্য পোষণ করেন। তিনি বলেন :

> নবাবিষ্কৃত রূপকগুলির সর্বাঙ্গীণ সাদৃশ্য হইতে বিশ্বাস হয় যে এইগুলি একই ব্যক্তির রচিত এবং পরবর্তী প্রখ্যাত লেখকগণ ভাসের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে এইগুলি ভাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার সেই যশের লাঘব হয় না। মোটকথা, বিরুদ্ধপক্ষে কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যে-সকল প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এইগুলি ভাসের রচনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে এবং স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে তবে এই সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে।[১৬]

ভাসের সময়কাল ও তাঁর নাটক (রূপক) নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘকালের। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস সম্পর্কে এই বিতর্ককে 'ভাস-সমস্যা' নামে অভিহিত করা হয় এবং বলা হয় যে, টি. গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর অমূল্য আবিষ্কার দ্বারা এই সমস্যার একটি আপাত সমাধান করেছেন এবং নাট্যগ্রন্থগুলো ভাস কর্তৃক রচিত বলেই পঠিত ও আলোচিত হচ্ছে।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, ভাস সম্পর্কিত বিতর্কটি আপাত শেষ হয়েছে এবং ভাসের অনুকূলেই তা মীমাংসিত হয়েছে। এতে সত্যের কোনো অপলাপ হবে বলে আমরা মনে করি না।

২.২ আমরা ইতোপূর্বে ভাস, তাঁর সময়কাল, ভাস বিরচিত সাহিত্যকর্ম তথা নাট্যসাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে বিদ্বৎসমাজে ভাস বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি-তর্ক প্রদানের মাধ্যমে তথা সপক্ষ-বিপক্ষের মতামত আলোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, উপর্যুক্ত তেরটি নাটকই (রূপক) ভাস কর্তৃক রচিত।

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ভাসের নাট্যসাহিত্যের নিম্নোক্ত শ্রেণিকরণ করা যায় :

১। রামায়ণ-আশ্রিত :

(ক) *প্রতিমানাটকম্*
(খ) *অভিষেকঃ*

Dhaka University Institutional Repository

২। মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত :

(ক) *দূতবাক্যম্*
(খ) *কর্ণভারম্*
(গ) *পঞ্চরাত্রম্*
(ঘ) *দূতঘটোৎকচম্*
(ঙ) *উরুভঙ্গম্*
(চ) *মধ্যমব্যায়োগঃ*
(ছ) *বালচরিতম্*

৩। ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত :

(ক) *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*
(খ) *স্বপ্নবাসবদত্তম্*

৪। পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত :

(ক) *অবিমারকম্*
(খ) *চারুদত্তম্*

এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা বাংলায় 'নাটক' ও ইংরেজিতে 'Drama' বলতে যা বুঝি, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পারিভাষিক নাম 'রূপক' বা 'দৃশ্যকাব্য'। "রূপারোপাত্তু রূপকম্" (*সাহিত্যদর্পণঃ*, ৬/১)[১৭] অর্থাৎ, রূপ আরোপিত হয় বলে একে রূপক বলা হয়। আবার দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলার কারণ হলো — এতে নটের উপর রাম ইত্যাদি স্বরূপ আরোপিত হয় : "দৃশ্যং কাব্যং নটে রামাদিস্বরূপারোপাদ্ রূপকমিত্যুচ্যতে"।[১৮] ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম আলংকারিক ও নাট্যতাত্ত্বিক মহামুনি ভরত-কৃত *নাট্যশাস্ত্র* অনুসারে রূপক দশ প্রকার : 'নাটক', 'প্রকরণ', 'অঙ্ক' (বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক), 'ব্যায়োগ', 'ভাণ', 'সমবকার', 'বীথী', 'প্রহসন', 'ডিম' ও 'ঈহামৃগ'।[১৯] সুতরাং, সংস্কৃত নাটক দশ প্রকার রূপকের একটি শ্রেণিমাত্র। নিম্নে ভরতের মতানুসারে উক্ত দশ প্রকার রূপকের লক্ষণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

নাটক :

প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কং চৈব।
রাজর্ষিবংশচরিতং তথা চ দিব্যাশ্রয়োপেতম্ ॥
নানাবিভূতিসংযুতমৃদ্ধিবিলাসাদিভির্গুণৈশ্চাপি।
অঙ্কপ্রবেশকাঢ্যং ভবতি হি তন্নাটকং নাম ॥
নৃপতীনাং যচ্চরিতং নানারসভাবচেষ্টিতৈর্বহুধা।
সুখদুঃখোৎপত্তিকৃতং তজ্জ্ঞেয়ং নাটকং নাম ॥

নাট্যশাস্ত্র, ২০/১০-১২[২০]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, নাটকের বিষয়বস্তু হবে বিখ্যাত ঘটনাকেন্দ্রিক এবং নায়কের চরিত্রে থাকবে উদারতা ও মহানুভবতা। এই গুণগুলো নায়ককে খ্যাতিমান করে তুলবে। নায়কের প্রতি থাকবে দেবতার আশীর্বাদ এবং তার কার্যাবলির মধ্য দিয়ে রাজবংশীয় আচরণ প্রতিফলিত হবে। নাটকের গুণাবলির মধ্যে থাকবে ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ, ঋদ্ধি ও বিলাস। নাটক হবে বিভিন্ন অঙ্কবিশিষ্ট এবং প্রবেশক দ্বারা সমন্বিত। নাটকের অঙ্কের মধ্যে থাকবে রাজ-রাজাদের সুখ-দুঃখানুভূতি থেকে উদ্ভূত কার্যাবলি, নানা প্রকার রস ও ভাব।

এছাড়াও ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকের আরো কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন :

নাটকে নায়কের পরিচারক থাকবে সীমিত এবং কার্যকরী ব্যক্তির সংখ্যা হবে অনধিক চার থেকে পাঁচজন। নাটকের কার্য হবে গোপুচ্ছাগ্র ভাগের ন্যায়, অর্থাৎ, শুরু হবে সামান্য ভাব দ্বারা যা ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির দ্বারা পরিপুষ্ট হবে এবং মূলভাব প্রয়োগের মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তি হবে। সর্বোপরি নাটকে নানা রস ও ভাবযুক্ত সর্বনিম্ন পাঁচটি এবং সর্বাধিক দশটি অঙ্ক থাকবে।

প্রকরণ : যত্র কবিরাত্মশক্ত্যা বস্তু শরীরঞ্চ নায়কং চৈব।
উৎপত্তিকং প্রকুরুতে প্রকরণমেতদ্ বুধৈর্জ্ঞেয়ম্ ॥
নাট্যশাস্ত্র, ২০/৪৮[২১]

অর্থাৎ, কবি নিজস্ব কল্পনাশক্তি দ্বারা প্রকরণের বিষয়বস্তু, শরীর (অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত অর্থবোধক পদসমষ্টি) এবং নায়ক সৃষ্টি করেন।

এছাড়াও প্রকরণ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে :

(ক) প্রকরণের নায়ক হবে অনার্য।

(খ) প্রকরণে ব্রাহ্মণ, বণিক, সচিব, পুরোহিত, অমাত্য এবং সার্থবাহদের নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হবে।

(গ) প্রকরণ সাধারণজন কর্তৃক সমন্বিত হবে।

(ঘ) প্রকরণে দাস, বিট, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি চরিত্র থাকবে।

(ঙ) প্রকরণের বিষয়বস্তুতে বেশ্যার সেবা থাকবে এবং কুস্বভাবা কুলবধূর কার্যকলাপ বর্ণিত হবে।

(চ) প্রকরণে নানা প্রকার রস ও ভাবযুক্ত পাঁচ থেকে দশটি অঙ্ক থাকবে এবং প্রকরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নাটকের অনুরূপ হবে।

অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক :

প্রখ্যাতবস্তুবিষয়স্ত্বপ্রখ্যাতঃ কদাচিদেব স্যাৎ।
দিব্যপুরুষৈর্বিযুক্তঃ শেষৈরন্যৈর্ভবেৎপুংভিঃ ॥

করুণরসপ্রায়কৃতো নিবৃত্তযুদ্ধোদ্ধতপ্রহারশ্চ।
স্ত্রীপরিদেবনবহুলো নির্বেদিভাষিতশ্চৈব ॥
নানাব্যাকুলচেষ্টঃ সাত্ত্বত্যারভটীকৈশিকীহীনঃ।
কর্তব্যোঽভ্যুদয়ান্তস্তজ্ জ্ঞৈরুৎসৃষ্টিকাঙ্কস্তু ॥
যদ্‌দিব্যনায়ককৃতং কাব্যং সংগ্রামবন্ধবধযুক্তম্।
তদ্ভারতে তু বর্ষে কর্তব্যং কাব্যবন্ধেষু ॥

নাট্যশাস্ত্র, ২০/৯৪-৯৭[২২]

অর্থাৎ, অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্কের বিষয়বস্তু প্রখ্যাত-অপ্রখ্যাত দুই-ই হতে পারে। এতে দিব্যপুরুষ ব্যতীত (তবে নায়ক, দিব্যপুরুষ হলে ঘটনাস্থল হবে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ) অন্যসব পুরুষ থাকবে। এতে আরো থাকবে করুণ রস, যুদ্ধ ও তীব্র প্রহার, স্ত্রীলোকের বিলাপ ইত্যাদি। এছাড়াও উৎসৃষ্টিকাঙ্ক হবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা 'অভ্যুদয়ান্ত' এবং এ শ্রেণির রূপক হবে সংগ্রাম, বন্ধন ও বধসংযুক্ত দৃশ্যকাব্য।

ভাণ : আত্মানুভূতশংসী পরসংশ্রিতবর্ণনাবিশেষস্তু।
দ্বিবিধাশ্রয়ো হি ভাণো বিজ্ঞেয়স্ত্বেকহার্যশ্চ ॥
পরবচনমাত্মসংস্থং পরবচনৈরুত্তরোত্তরৈর্গ্রথিবাক্যম্।
আকাশপুরুষকথিতৈরঙ্গবিকারৈরভিনয়েত্তৎ ॥
ধূর্তবিটসংপ্রযোজ্যো নানাবস্থান্তরাত্মকশ্চৈব।
একাঙ্কী বহুচেষ্টঃ সততং কার্যো বুধৈর্ভাণঃ ॥

নাট্যশাস্ত্র, ২০/১০৮-১১০[২৩]

অর্থাৎ, ভাণে মঞ্চে শুধু একজন অভিনেতা অভিনয় করবেন; তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনার পাশাপাশি অন্যের সম্পর্কেও বর্ণনা করবেন। তাই ভাণ দুই প্রকার। ভাণে অন্য ব্যক্তির কথা নিজ উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করা হয় এবং তার কথা দিয়েই ক্রমশ বাক্য বিন্যস্ত হয়। ভাণ কাল্পনিক ব্যক্তির উক্তি ও তার অঙ্গভঙ্গি সমৃদ্ধ। ধূর্ত ও বিটসম্বলিত ভাণের অঙ্কসংখ্যা একটি—যাতে নানা কথা বর্ণিত হয়।

সমবকার : দেবাসুরবীজকৃতঃ প্রখ্যাতোদাত্তনায়কশ্চৈব।
ত্র্যঙ্কস্তদ ত্রিকপটস্ত্রিবিদ্রবঃ স্যাৎ ত্রিশৃঙ্গারঃ ॥
দ্বাদশনায়কবহুলো হ্যষ্টাদশনাডিকাপ্রমাণশ্চ।

নাট্যশাস্ত্র, ২০/৬৪-৬৫[২৪]

অর্থাৎ, দেবতা, অসুর এবং মহান নায়ক নিয়ে হবে সমবকারের বিষয়বস্তু। তিন অঙ্কবিশিষ্ট সমবকারে থাকবে তিন ধরনের কপটতা, বিদ্রব ও শৃঙ্গারের বর্ণনা। এর নায়কের সংখ্যা হবে বার এবং সময়কাল হবে আঠার নাড়িকা (প্রতি নাড়িকা ২৪ মিনিট)। এই সময়কালের মধ্যেই সমবকারের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পন্ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া সমবকারের প্রতিটি অঙ্কের বিষয়বস্তু হবে স্বতন্ত্র এবং উষ্ণিক, গায়ত্রী ইত্যাদি ছন্দ ব্যতীত অন্যান্য জটিল ছন্দ কবিগণ কর্তৃক এতে প্রয়োগ হবে। এভাবে সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণেই হবে সমবকার।

ব্যায়োগ : ব্যায়োগস্তু বিধিজ্ঞৈঃ কর্তব্যঃ খ্যাতনায়কশরীরঃ।
অল্পস্ত্রীজনযুক্তস্ত্বেকাহকৃতস্তথা চৈব ॥
বহবস্তত্র চ পুরুষা ব্যাযচ্ছন্তে যথা সমবকারে।
ন চ তৎপ্রমাণযুক্তঃ তদেকাঙ্কঃ সংবিধাতব্যঃ ॥
ন চ দিব্যনায়ককৃতঃ কার্যো রাজর্ষিনায়কনিবদ্ধঃ।
যুদ্ধনিযুদ্ধাঘর্ষণসঙ্ঘর্ষশ্চাপি কর্তব্যঃ ॥
এবং বিধস্তু কার্যো ব্যায়োগো দীপ্তকাব্যরসযোনিঃ।

নাট্যশাস্ত্র, ২০/৯০-৯৩(ক)[২৫]

অর্থাৎ, ব্যায়োগের ভিত্তি হবে প্রসিদ্ধ নায়ককেন্দ্রিক। এতে স্ত্রীচরিত্রের সংখ্যা থাকবে সীমিত এবং শুধু একদিনের ঘটনাবলিই এতে বর্ণিত হবে। সমবকারের আকার থেকে স্বতন্ত্র এবং বহু পুরুষ চরিত্র বিশিষ্ট ব্যায়োগের অঙ্কসংখ্যা হবে শুধু একটিI যার নায়ক হবেন রাজর্ষি চরিত্রের অধিকারী। ব্যায়োগ হবে দীপ্তকাব্যধর্মী (বীর, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত, করুণ ও ভয়ানক—এই ছয়টি রসসমৃদ্ধ কাব্যকে দীপ্তকাব্য বলা হয় এবং উক্ত ছয়টি রসকে দীপ্তরস বলে)।

বীথী : বীথী স্যাদেকাঙ্কা দ্বিপাত্রহার্যা তথৈকহার্যা বা।
অধমোত্তমমধ্যাভির্যুক্তা স্যাৎ প্রকৃতিভিস্তিসৃভিঃ ॥
সর্বরসলক্ষণাঢ্যা হ্যঙ্গৈস্ত্রয়োদশভিঃ।

নাট্যশাস্ত্র, ২০/১১২-১১৩(ক)[২৬]

অর্থাৎ, সকল রসের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত দুই অথবা একজন পাত্র এবং অধম, মধ্যম ও উত্তম – এই তিন চরিত্র সমন্বয়ে এক অঙ্কবিশিষ্ট রূপকের নাম বীথী। এতে থাকবে তেরটি বীথ্যঙ্গ (উদ্‌ঘাতক, অবলগিত, অবস্পন্দিত, অসৎপ্রলাপ, প্রপঞ্চ, নালিকা, বাক্‌কেলি, অধিবল, ছল, ব্যাথার, মৃদব, ত্রিগত ও গণ্ড)।

প্রহসন : প্রহসনমপি বিজ্ঞেয়ং দ্বিবিধং শুদ্ধং তথৈব সঙ্কীর্ণম্।
....
ভগবত্তাপসভিক্ষুশ্রোত্রিয়বিপ্রাতিহাসসংযুক্তম্।
নীচজনসংপ্রযুক্তং পরিহাসাভাষণপ্রায়ম্ ॥
অবিকৃতভাষাচারং বিশেষহাসোপহাসরচিতপদম্।
নিয়তগতিবস্তুবিষয়ং শুদ্ধং জ্ঞেয়ং প্রহসনং তু ॥
বেশ্যাচেটনপুংসকধূর্তবিটা বন্ধকী চ যত্র স্যুঃ।
অনিভৃতবেষপরিচ্ছদচেষ্টাকরণাত্তু সঙ্কীর্ণম্ ॥

Dhaka University Institutional Repository

লোকোপচারযুক্তা যা বার্তা যশ্চ দম্ভসংযোগঃ।
তৎপ্রহসনে প্রযোজ্যং ধূর্তবিটবিবাদসম্পন্নঃ ॥
বীথ্যঙ্গৈঃ সংযুক্তং কর্তব্যং প্রহসনং যথাযোগম্।
নাট্যশাস্ত্র, ২০/১০২-১০৭(ক)[২৭]

অর্থাৎ, প্রহসন দুই প্রকার : শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। শুদ্ধ প্রহসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : ভগবৎ, তাপস, ভিক্ষু, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের হাসি, সমাজের নিচুস্তরের মানুষের পরিহাস ইত্যাদির বৃত্তান্ত। আর সংকীর্ণ প্রহসনের প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে : বেশ্যা, চেট, নপুংসক, ধূর্ত, বিট, বন্ধকী ইত্যাদির বৃত্তান্ত।

এ ছাড়াও সমাজের সাধারণ মানুষের প্রচলিত ঘটনাসহ অন্যান্য বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে এতে বীথ্যঙ্গও যুক্ত হবে।

ডিম : প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ঃ প্রখ্যাতোদাত্তনায়কোপেতঃ।
ষট্সলক্ষণযুক্তশ্চতুরঙ্কো বৈ ডিমঃ কার্যঃ ॥
শৃঙ্গারহাস্যবর্জঃ শেষৈরন্যৈঃ রসৈঃ সমাযুক্তঃ।
দীপ্তরসকাব্যযোনির্নানাভাবান্বিতশ্চৈব ॥
নাট্যশাস্ত্র, ২০/৮৪-৮৫[২৮]

অর্থাৎ, ছয়টি রস (শৃঙ্গার ও হাস্যরস ব্যতীত) ও চার অঙ্ক বিশিষ্ট ডিমের বিষয়বস্তু (দীপ্তরস ও ভাব সম্বলিত) হবে বিখ্যাত এবং নায়ক হবে প্রখ্যাত ও মহান (নায়কের সংখ্যা হবে ষোল)।

এছাড়াও ডিমের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি, যুদ্ধ, নিযুদ্ধ, মায়া, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি। এতে আরো থাকবে দেবতা চরিত্রের অধিকারী পুরুষ, অসুর, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, এবং সর্প। ডিমে বিষয়বৈচিত্র্য থাকবে।

ঈহামৃগ : দিব্যপুরুষাশ্রয়কৃতো দিব্যস্ত্রীকারণোপগতযুদ্ধঃ।
সুবিহিতবস্তুনিবন্ধো বিপ্রত্যয়কারকশ্চৈব ॥
নাট্যশাস্ত্র, ২০/৭৮[২৯]

অর্থাৎ, দিব্যপুরুষকেন্দ্রিক এবং দিব্যস্ত্রীর কারণে যুদ্ধসম্বলিত কাহিনি প্রধানই হবে ঈহামৃগ।

এছাড়া ঈহামৃগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে : বিশ্বাসী উদ্ধত বহুপুরুষ, স্ত্রীলোকের ক্রোধযুক্ত সংক্ষোভ, বিদ্রব, সংফেট, স্ত্রীজাতির ভেদাভেদ, নারীহরণ, সুসমাহত শৃঙ্গার রসাশ্রিত বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত দশটি রূপক ছাড়াও ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটিকার কথা উল্লেখ করেছেন যাকে পরবর্তীকালে চতুর্দশ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণে উপরূপক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিশ্বনাথ নাটিকাসহ মোট আঠারটি উপরূপকের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো :

নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী, সট্টকং, নাট্যরাসকম্।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা ॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পিকং চ বিলাসিকা।
দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
সাহিত্যদর্পণঃ, ৬/৪-৬[৩০]

অর্থাৎ, নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ, এবং ভাণিকা।এই আঠার প্রকার উপরূপকের কথা মনীষিগণ বলে থাকেন।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, নাটিকা আঠারটি উপরূপকের মধ্যে একটি। কিন্তু *নাট্যশাস্ত্রম্*-এ নাটিকা ব্যতীত অন্যকোনো উপরূপকের উল্লেখ আমরা দেখি না বা এর নাম যে উপরূপক তাও *নাট্যশাস্ত্রম্*-এ উল্লেখ নেই। তবে *নাট্যশাস্ত্রম্*-এ যে দশটি রূপকের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো কিন্তু পরবর্তীকালের আলংকারিকগণ এমন কি বিশ্বনাথ কবিরাজও স্বীকার করেছেন।

নিম্নে নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত নাটিকার লক্ষণ তুলে ধরা হলো :

প্রকরণনাটকভেদাদুৎপন্নং বস্তু নায়কো নৃপতিঃ।
অন্তঃপুরসঙ্গীতকবার্তামধিকৃত্য কর্তব্যা ॥
স্ত্রীপায়া চতুরঙ্কা ললিতাভিনয়াত্মিকা সুবিহিতার্থা।
বহুনৃত্তগীতপাঠ্যা রতিসম্ভোগাত্মিকা চৈব ॥
রাজোপচারযুক্তা প্রসাদনক্রোধসংযুতা চাপি।
নায়কদেবীদূতীসপরিজনা নাটিকা জ্ঞেয়া ॥
নাট্যশাস্ত্র, ২০/৬০-৬২[৩১]

অর্থাৎ, চার অঙ্ক ও বহুস্ত্রীলোক বিশিষ্ট, সংগীতকেন্দ্রিক এবং উদ্ভাবিত বিষয়বস্তুসম্পন্ন নাটিকার নায়ক হবে রাজা। নাটিকা হবে অভিনয়ের দিক থেকে সুন্দর। বহু নৃত্য, গীত, পাঠ্য, রতিসম্ভোগ, রাজসেবা, প্রসাদন, ক্রোধ, নায়ক, রানি, দূতী, পরিজন ইত্যাদি নিয়ে নাটিকা সুন্দরভাবে রচিত হবে। তাই নাটিকা প্রকরণ ও নাটক থেকে স্বতন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত উপর্যুক্ত দশ প্রকার রূপক ও নাটিকা কালের ব্যবধানে পরবর্তীকালের আলংকারিকগণের হাতে আরো পরিবর্তিত, পরিমার্জিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্দশ শতকে বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর *সাহিত্যদর্পণে* রূপক বা দৃশ্যকাব্যকে দশরূপক ও অষ্টাদশ উপরূপকে বিভক্ত করে সেগুলোকে অধিকতর পরিশীলিত রূপ প্রদান করেন।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববিশারদ ভরত কর্তৃক প্রণীত নাট্যতত্ত্বের শ্রেণিবিভাজন আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ করব যে, ভাসের নাটকগুলো (রূপক) ভরত প্রণীত সবগুলো শ্রেণিকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন, ভরত প্রণীত ডিম, ঈহামৃগ, ভাণ, প্রহসন, বীথী ভাস বিরচিত নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার ভাসকৃত *দূতবাক্যম্* ভরতকৃত দশরূপকের শ্রেণিকরণের কোনো নিয়মেই পড়ে না। তবে ভাসের অন্যান্য নাটকগুলো ভরতের উপর্যুক্ত পাঁচটি শ্রেণি ব্যতীত অবশিষ্ট কোনো না কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাওয়া যায়—যা আলোচনা করতে আমরা প্রয়াসী হব।

২.৩ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাস ভারতের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে দুটি নাটক রচনা করেন : *প্রতিমানাটকম্* এবং *অভিষেকঃ*। নিম্নে সংক্ষেপে এগুলোর বিষয়বস্তুসহ পরিচয় তুলে ধরা হলো :

***প্রতিমানাটকম্* :** সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেণিকরণে এটি একটি নাটক শ্রেণির রূপক। পণ্ডিতদের মতে, ভাসকৃত তেরটি নাট্যগ্রন্থের মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যগ্রন্থ। রামায়ণের অযোধ্যা ও অরণ্য – এই দুটি কাণ্ড অবলম্বনে নাটকটি রচিত। তবে মূল কাহিনি রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, দৃশ্যাবলির উপস্থাপন, সংলাপ প্রয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাস স্বীয় নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটিতে সাতটি অঙ্ক এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় সাতাশটি চরিত্র রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে কিছু চরিত্র উল্লিখিত হয়েছে।

অযোধ্যারাজ দশরথের নিকট রানি কৈকেয়ী পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়ে কৈকেয়ী-পুত্র ভরতকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার প্রার্থনা করলে পিতৃসত্য রক্ষার নিমিত্তে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ বনে গমন করেন। পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে দশরথ দৈহিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং অসুস্থ হয়ে পরলোকগমন করেন। এদিকে মাতুলালয়ে অবস্থানরত ভরত অযোধ্যায় গমনের উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে এক মন্দিরে (প্রতিমাগৃহে) প্রবেশ করে সংরক্ষিত ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরলোকগত রাজন্যবর্গের প্রতিমূর্তির সঙ্গে নিজ পিতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং মন্দির রক্ষকের নিকট থেকে রাম-সীতার বনবাস ও পিতার মৃত্যুসহ সমস্ত বিষয় অবগত হন। তিনি সুমন্ত্রকে নিয়ে রামচন্দ্রকে গৃহে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তাঁর সন্ধানে বনে গমন করেন। কিন্তু রামচন্দ্র গৃহে ফিরতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি রামের সেবা করার জন্য বনে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। রাম অসম্মতি জানালে নিরুপায় হয়ে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল অযোধ্যার রাজসিংহাসনে স্থাপন করে রামের নামেই প্রজা প্রতিপালন ও রাজ্যপরিচালনা করেন। পিতার মৃত্যুতে দুঃখভারাক্রান্ত রামচন্দ্রকে পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের বিষয় ভাবিয়ে তোলে। এমন সময় লঙ্কারাজ রাবণ অতিথির ছদ্মবেশে রামচন্দ্রের কুটিরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ কর্তৃক তর্পণ করলে পিতৃপুরুষের আত্মা শান্তি ও সদ্‌গতি লাভ করে বলে পরামর্শ দেন। আর রামও কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগের সন্ধানে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে গমন করতে মনস্থ করেন। কিন্তু হঠাৎ কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগকে কুটিরের সামনে দৌড়াতে দেখে তক্ষণাৎ রাম ধনুর্বাণ নিয়ে তার পশ্চাদানুসরণ করেন। তখন লক্ষণও আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। এই সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। অতঃপর ভরত সুমন্ত্রের নিকট থেকে সীতাহরণের কাহিনি শুনে সমস্ত বিষয়ের জন্য কৈকেয়ীকে দায়ী করে ভর্ৎসনা করেন। কৈকেয়ী তখন সুমন্ত্রের মাধ্যমে জানান যে, অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করায় দশরথের পুত্রশোকের অভিশাপ প্রাপ্য ছিল। রামের বনবাস বিচ্ছেদের দুঃখের মাধ্যমেই কৈকেয়ী এই পুত্রশোকের অভিশাপ থেকে দশরথকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু তিনি আবেগে বিহ্বল হয়ে চৌদ্দদিন বলতে গিয়ে চৌদ্দ বছর বলে ফেলেন। এতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিতা, মর্মাহতা ও অনুতপ্ত। আর এ সমস্তই ঘটেছে কুলগুরুদের অনুমোদনে। সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে ভরত প্রসন্ন হন এবং মায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সীতা উদ্ধারে জন্য প্রচুর সৈন্য সমাবেশের আয়োজন করেন। রামচন্দ্র সকলের সহায়তায় রাবণকে পরাজিত ও বধ করে সীতাকে নিয়ে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতির উপস্থিতিতে রামের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে রামের ইচ্ছানুসারে রাবণের পুষ্পক রথে করে সকলেই অযোধ্যায় গমন করেন।

অভিষেকঃ **:** *প্রতিমানাটকের* ন্যায় *অভিষেক*ও একটি নাটক শ্রেণির রূপক। রামায়ণের যে দুটি কাণ্ড অবলম্বনে *প্রতিমানাটক* রচিত তার পরবর্তী ঘটনাক্রমধারার তিনটি কাণ্ড, অর্থাৎ, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ড অবলম্বনে *অভিষেক* নাটকটি রচিত। তাই আমরা বলতে পারি, ভাসের *প্রতিমা* ও *অভিষেক* নাটক একটি অন্যটির সম্পূরক ও পরিপূরক। এখানেও ভাস তাঁর সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ছয় অঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকের চরিত্রসংখ্যা স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ঊনত্রিশজন। তবে স্ত্রী চরিত্র খুবই কম। এছাড়া অন্যদের সংলাপের মধ্য দিয়েও কিছু চরিত্র লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

অভিষেক নাটকের বর্ণিত বিষয়ানুসারে সীতা হরণের পর সুগ্রীবের সঙ্গে রামচন্দ্র মিত্রতা স্থাপন করে তাকে কপিরাজ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বালীকে বধ করেন। এদিকে হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় উপস্থিত হন। লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে বিভিন্নভাবে বশীভূত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ইতোমধ্যে হনুমান সীতার নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় পরিচয় প্রদান করে সীতার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে লঙ্কা ত্যাগ করেন। রামচন্দ্র রাবণের ভাই বিভীষণের সাহায্যে সাগর পাড়ি দেওয়ার প্রক্রিয়া জেনে সাগরের প্রতি দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হলে সঙ্গে সঙ্গে বরুণদেব আবির্ভূত হন এবং সাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রামচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে লঙ্কায় গমনের ব্যবস্থা করে দেন। এদিকে রাবণ লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত পুত্র ইন্দ্রজিতের সংবাদে জ্ঞান হারান এবং প্রকৃতস্থ হয়ে সমস্ত কিছুর জন্য সীতাকে দায়ী করে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু স্ত্রী হত্যা ধর্মাচার বিরুদ্ধ বিধায় সে কাজ থেকে বিরত থেকে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে রাম রাবণকে পরাজিত ও নিহত করে সীতাকে উদ্ধার করেন এবং লোকাপবাদের ভয়ে অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে সীতার শুচিতা যাচাই করে সীতাকে গ্রহণ করেন। পরিশেষে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দ্বারা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

২.৪ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ভাস ভারতের অন্যতম প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারত এবং কৃষ্ণকথা অবলম্বনে সাতটি নাটক (রূপক) রচনা করেন : *দূতবাক্যম্*, *কর্ণভারম্*, *পঞ্চরাত্রম্*, *দূতঘটোৎকচম্*, *উরুভঙ্গম্*, *মধ্যমব্যায়োগঃ* এবং *বালচরিতম্*। সংক্ষেপে এগুলোর বিষয়বস্তুসহ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

***দূতবাক্যম্* :** *দূতবাক্য* মহাভারতের উদ্‌যোগপর্ব অবলম্বনে রচিত। আমরা জানি যে, নাট্যকার ভাসের রচনায় নাট্যতত্ত্বের নিয়ম বিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আর এ কারণেই বোধ করি *দূতবাক্য*'কে নাট্যসাহিত্যের হুবহু কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়।[৩২] *দূতবাক্য* এক অঙ্কবিশিষ্ট নারীচরিত্র বিহীন একাঙ্কিকা। উক্ত একাঙ্কিকায় মাত্র ছয়জন পুরুষচরিত্র বিদ্যমান। তবে প্রত্যক্ষভাবে দূতবাক্যে কোনো নারীচরিত্র না থাকলেও দুর্যোধন ও বাসুদেবের সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্রৌপদী সম্পর্কে বক্তব্য লক্ষণীয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপনের নিমিত্তে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে দূতরূপে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে কৌরব সভায় আগমন করেন। কিন্তু দুর্যোধন তাচ্ছিল্লভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ঘোষণা করেন যে, রাজসভা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণকে যেন কোনো প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা না হয়। তদুপরি শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করার মানসে তিনি কাঞ্চুকীয় (কঞ্চুকী)কে দূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার চিত্র প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। ফলশ্রুতিতে দুর্যোধন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ, উক্তি-প্রত্যুক্তির এক পর্যায়ে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করতে উদ্যত হন। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে উপস্থিত সকলকে হতবিহ্বল করে তোলেন। এমন কি দুর্যোধনও চলৎশক্তিহীন হয়ে যান। এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে সকলে বিস্ময়াভূত হন। সকলে সর্বদিকে শুধু শ্রীকৃষ্ণকেই দেখতে পান। পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের কাতর মিনতি ও অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ শান্ত হয়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

কর্ণভারম্ **:** মহাভারতের বন ও কর্ণপর্ব অবলম্বনে রচিত কর্ণভারকে অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক শ্রেণির রূপক বলা যেতে পারে। পূর্বোক্ত দূতবাক্যের ন্যায় কর্ণভারও এক অঙ্কবিশিষ্ট নারীচরিত্র বিহীন একটি একাঙ্কিকা। তবে কর্ণভারেও কর্ণের সংলাপের মাধ্যমে কর্ণমাতা কুন্তী ও রাধার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য একাঙ্কিকায় মাত্র পাঁচজন পুরুষচরিত্র বিদ্যমান। একাধিক পুরুষচরিত্র বিশিষ্ট হলেও উক্ত রূপকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কর্ণ এবং কর্ণকে ঘিরেই এর কাহিনি আবর্তিত। এ প্রসঙ্গে S.N. Dasgupta এবং S.K. De-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : æ... it is not only a one-act play but really a one-character play.[৩৩] অর্থাৎ, এটি শুধুমাত্র এক অঙ্ক বিশিষ্ট রূপকই নয়; এটি প্রকৃতপক্ষে এক চরিত্রবিশিষ্ট রূপক।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে কৌরবপক্ষের অধিনায়ক কর্ণের যুদ্ধের প্রাক্কালে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের নিকট থেকে মহাভিক্ষা হিসেবে তাঁর দেহরক্ষাকারী কবচকুণ্ডল নিয়ে যানÑযা কর্ণ জন্মগতভাবে লাভ করেছিলেন। কর্ণের রথের সারথি শল্য পুনঃপুন নিষেধ করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণকে কবচকুণ্ডল দানের সিদ্ধান্তে কর্ণ অটল থাকেন। ইতোমধ্যে কর্ণ শল্যকে পরশুরামের নিকট থেকে অস্ত্রবিদ্যা লাভ এবং প্রবঞ্চনার কারণে গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ার কাহিনি শোনান। তিনি বলেন, এই অভিশাপের কারণেই তাঁর অস্ত্র প্রয়োজনের সময় কার্যকরী হয় না। পরবর্তীতে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী ইন্দ্র অনুতপ্ত হয়ে একজন দেবদূতের মাধ্যমে ‘বিমলা’ নামক একটি শক্তি অস্ত্র কর্ণকে পাঠানÑযার মাধ্যমে কর্ণ যেকোনো একজন পাণ্ডবকে বধ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু কর্ণ তা গ্রহণ করতে সম্মত না হলেও ব্রাহ্মণের কথা লঙ্ঘন করা উচিত নয় বিধায় তা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। দেবদূতের কথানুসারে অস্ত্রটি কর্ণ যখনই পেতে ইচ্ছা করবেনÑতখনই পাবেন। তাই কর্ণ ক্রোধান্বিত অর্জুনকে মোকাবেলা করার নিমিত্তে শল্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে রথ চালাতে আদেশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চরাত্রম্ **:** মহাভারতের বিরাটপর্ব অবলম্বনে রচিত*পঞ্চরাত্র* একটি সমবকার শ্রেণির রূপক। তিনটি অঙ্ক এবং বিশটি চরিত্র নিয়ে রূপকটি রচিত। চরিত্রগুলো সবই পুরুষ। উক্ত রূপকে কোনো নারী চরিত্র নেই। তবে অন্যদের সংলাপের মধ্য দিয়ে বেশকিছু নারীচরিত্রের উল্লেখ লক্ষ করা যায়।

কপটতার মাধ্যমে পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বছর বনবাস জীবন সমাপ্ত করে এক বছর কাল অজ্ঞাতবাস করেন। পাণ্ডবদের এই অজ্ঞাতবাসকালে দ্রোণাচার্য কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে ঐক্য ঘটানোর জন্য দুর্যোধনকে মঙ্গলার্থে যজ্ঞ করতে উপদেশ দেন। উপদেশানুযায়ী দুর্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং যজ্ঞ সমাপ্তির পর দ্রোণাচার্যকে গুরু দক্ষিণা প্রদান করতে ইচ্ছা করেন। দ্রোণাচার্য প্রথমে দক্ষিণা গ্রহণ করতে সম্মত না হলেও পরবর্তীতে ভীষ্মের অনুরোধে দক্ষিণা গ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন। তিনি পাণ্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজ্য দক্ষিণা হিসেবে দাবি করেন। এদিকে শকুনির পরামর্শানুযায়ী পাঁচরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রোণাচার্যের কাঙ্ক্ষিত অর্ধেক রাজ্য প্রদান করা হবে বলা হয়। এ সময় এক দূত এসে জানান যে, কীচকেরা শতভাই বাহুযুদ্ধে নিহত হওয়ায় বিরাটরাজা দুর্যোধনের যজ্ঞানুষ্ঠানে আসতে পারেননি। প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ভীষ্ম নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেন যে, কীচকদের নিহত হওয়ার পেছনে ভীমের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি দ্রোণাচার্যকে দক্ষিণা প্রদানের শর্ত মেনে নিতে অনুরোধ করেন এবং দুর্যোধনকে বিরাটরাজার গোধন হরণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। দুর্যোধন ভীষ্মের পরামর্শানুযায়ী বিরাটরাজার গোধন হরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিরাট-রাজপুত্র উত্তর বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে সারথি করে আক্রমণকারী কৌরববাহিনীকে মরণপণ যুদ্ধে পরাজিত করে গোধন উদ্ধার করেন। কৌরবপক্ষের অভিমন্যু বিরাটবাহিনীর নিকট ধরা পড়েন। এক পর্যায়ে বিরাট-পুত্র উত্তর বৃহন্নলারূপী অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে যুধিষ্ঠিরও তাঁদের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হওয়ায় নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করলে কুমার অভিমন্যু পিতা ও পিতৃব্যদের চিনতে পারেন। বিরাটরাজা বিজয়ে সন্তুষ্ট হয়ে রাজকুমারী উত্তরাকে অর্জুনের হাতে সমর্পণ করলে অর্জুন তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির বিয়ের শুভ সংবাদ জানিয়ে বিরাট-কুমার উত্তরকে ভীষ্মের নিকট প্রেরণ করেন। পাঁচরাত্রির পূর্বেই পাণ্ডবদের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় দুর্যোধন শর্তানুসারে অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের প্রদান করেন এবং আচার্য দ্রোণও তাঁর অভীষ্টলক্ষ্য পূরণ হওয়ায় পরমানন্দে কুরুবংশের কল্যাণ চিন্তা করেন।

দূতঘটোৎকচম্ **:** মহাভারতের দ্রোণপর্ব অবলম্বনে রচিত *দূতঘটোৎকচ* ও *কর্ণভার*-এর ন্যায় অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক শ্রেণির রূপক। এতেও একটিমাত্র অঙ্ক বিদ্যমান এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে চরিত্র সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

দশ। উক্ত রূপকের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলোIএখানে নাট্যতত্ত্বের নিয়মাবদ্ধ চিরাচরিত ভরতবাক্যের অনুপস্থিতি। উল্লেখ্য যে, দূতঘটোৎকচেও অন্যের সংলাপে উল্লিখিত চরিত্র বিদ্যমান।

চক্রব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু অন্যায়ভাবে কৌরবগণ কর্তৃক নিহত হলে শোকে আপ্লুত এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্রোধান্বিত অর্জুন পুত্রের হত্যাকারীকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। এদিকে অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং তাঁদের পুত্র-কন্যাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা চিন্তা করে দুর্যোধন প্রভৃতিকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন। এ সময় ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ কৃষ্ণের দূতরূপে কৌরব শিবিরে উপস্থিত হন। ঘটোৎকচ তিনটি বার্তা যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন ও কুরবাসীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে শতপুত্রের শোক সহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করতে বলেন। অর্জুনের শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে তিনি দুর্যোধনকে ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। এক পর্যায়ে দুর্যোধন ঘটোৎকচকে তাঁর রাক্ষসপ্রকৃতি ও দৌত্যকর্মের প্রতি কটাক্ষ করে অপমান করলে ঘটোৎকচ ভীষণ রেগে যান। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে ঘটোৎকচ ক্রোধ সংবরণ করে শান্ত হন এবং কুরুবীরদের উদ্দেশ্যে তার তৃতীয় বার্তা নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে, তারা যেন সকলের সঙ্গে ন্যায় আচরণ করেন, স্বজনদের সম্মান করেন। আর মনের সকল কামনা-বাসনা যেন মিটিয়ে নেন। কেন না, সূর্য উদয় হওয়া মাত্রই পাণ্ডবরূপী যম তাদের নিকট উপস্থিত হবে।

***উরুভঙ্গম্* :** মহাভারতের শল্যপর্ব অবলম্বনে ভাস বিরচিত *উরুভঙ্গ*'কে ব্যায়োগ শ্রেণির রূপক বলা যায়। তবে কারো কারো মতে, এটি উৎসৃষ্টিকাঙ্ক শ্রেণির রূপক।[৩৪] একটিমাত্র অঙ্ক বিদ্যমান বিধায় উক্ত রূপকটিকে একাঙ্কিকাও বলা হয়। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এখানে তেরটি চরিত্র রয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে কয়েকটি চরিত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। *উরুভঙ্গম্* সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র বিয়োগান্তক নাটক (রূপক) Í যা নাট্যকার ভাস সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের চিরাচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করে রচনা করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ প্রান্তে কৌরবপক্ষীয় বীরযোদ্ধা ও অধিপতি দুর্যোধন এবং দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের মধ্যে এক মরণপণ গদাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধকালে ব্যাস, বলদেব, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখ পূজনীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দুর্যোধন ভীমের মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলে ভীম পড়ে যান। এ সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজের উরুতে আঘাত করে ভীমকে ইঙ্গিত প্রদর্শন করায় ভীম নতুন অনুপ্রেরণায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতানুযায়ী ভীম যুদ্ধের নীতি অমান্য করে গদা দিয়ে দুর্যোধনের দুই উরুতে আঘাত করে উরুদুটি ভেঙ্গে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন পড়ে যান। আর পাণ্ডবগণ চতুর্দিক থেকে বাহুবেষ্টন করে ভীমকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। এ ঘটনায় বলদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমের বক্ষে হল নিক্ষেপের প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁকে শান্ত হতে অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন যে, এ পৃথিবীর সর্বময় কর্তার ইচ্ছাতেই তাঁর এরকম অবস্থা হয়েছে। তাই দুর্যোধন তাঁর প্রাপ্যই পেয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। পরবর্তীতে এক হৃদয় বিদারক অবস্থার মাধ্যমে পুত্র দুর্জয়, শোকাকুল পিতা ধৃতরাষ্ট্র, মাতা গান্ধারী এবং দুই রানির সঙ্গে দুর্যোধনের সাক্ষাৎ হয়। তিনি পরজন্মে পুনরায় গান্ধারীর গর্ভেই জন্মগ্রহণের প্রত্যাশা করেন এবং পুত্র দুর্জয়কে পাণ্ডবদের সেবা ও শ্রদ্ধা করতে আদেশ করেন। এদিকে অতর্কিতে অশ্বত্থামা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে উচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করলে দুর্যোধন তাঁকেও শান্ত হতে অনুরোধ করেন। কিন্তু অশ্বত্থামা দুর্যোধনের কথায় কর্ণপাত না করে নৈশযুদ্ধে পাণ্ডবদের দগ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। আর তাঁকে উৎসাহ প্রদান করেন বলদেব। অতঃপর অশ্বত্থামা কর্তৃক দুর্জয় রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ায় দুর্যোধন পরম আত্মতৃপ্তি লাভ করে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন। ফলশ্রুতিস্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র স্থির করেন তপোবনে গমনের। আর অশ্বত্থামাও তাঁর প্রতিজ্ঞানুযায়ী উক্ত দিবাগত রাতেই সৌপ্তিকবধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

***মধ্যমব্যায়োগঃ* :** *মধ্যমব্যায়োগ* একটি ব্যায়োগ শ্রেণির রূপক যা এর নামকরণ থেকে সহজেই অনুমেয়। আলোচ্য রূপকের উৎস মহাভারত। তবে মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। কিন্তু উক্ত রূপকে বর্ণিত তিনটি চরিত্র যেমন, ভীম, হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচIএরা মহাভারতীয় চরিত্র। তাই নাট্যকাহিনি সম্পূর্ণরূপে নাট্যকার ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি হলেও আলোচ্য রূপকটি মহাভারতের পাত্র-পাত্রী অবলম্বনে রচিত বিধায় এর উৎস মহাভারতই বলা হয়ে থাকে।[৩৫] একটিমাত্র অঙ্ক এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে নয়টি চরিত্র নিয়ে রূপকটি রচিত।

কেশবদাস নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর তিন পুত্র ও পত্নীসহ একদা মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের রাক্ষসী পত্নী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচের সম্মুখীন হন। এ সময় ঘটোৎকচ তাঁর মায়ের ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণের যেকোনো একজন পুত্রকে দাবি করলে ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেন। ব্রাহ্মণের মধ্যমপুত্র ঘটোৎকচের অনুমতি নিয়ে শেষ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বনের ভেতরের জলাশয়ে গিয়ে ফিরতে বিলম্ব করায় ঘটোৎকচ উচ্চরবে ‘মধ্যম’ ‘মধ্যম’ বলে ডাকতে থাকেন। এদিকে তাঁর ডাক শুনে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের আগমন ঘটে। কেন না, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকেও

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যম বলে ডাকা হয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভীমকে দেখে চিনে ফেলেন। আর তখনই ব্রাহ্মণের মধ্যমপুত্রেরও আগমন ঘটে। সুযোগ বুঝে ব্রাহ্মণ ভীমের নিকট নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে সে অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রার্থনা জানান। ভীম ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করে ব্রাহ্মণ-পুত্রকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ঘটোৎকচকে আদেশ করেন। কিন্তু ঘটোৎকচ এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালে উভয়ের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ঘটোৎকচ তাঁর পিতা-মাতার পরিচয় প্রকাশ করলে ভীম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। কারণ ভীম বুঝতে পারেন যে, ঘটোৎকচ তাঁরই ঔরসজাত সন্তান। তিনি একদিকে পুত্রের দম্ভ ও পৌরুষে যেমন আনন্দিত হন, অন্যদিকে তেমনি প্রজাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে অত্যন্ত কষ্ট পান। ঘটোৎকচ কিন্তু ভীমকে চিনতে পারেন না। তবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বীরত্বব্যঞ্জক ও উদ্দীপনামূলক কথোপকথনের মাধ্যমে ভীম স্পষ্টই অনুভব করেন যে, ভীমের প্রতি ঘটোৎকচের রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা। অবশেষে পুত্র ঘটোৎকচের মাধ্যমে ভীম ও হিড়িম্বার সাক্ষাৎ ঘটলে হিড়িম্বা পিতার সঙ্গে পুত্রের পরিচয় করিয়ে ভীমকে তাঁদের দেবতা বলে আখ্যায়িত করেন। পিতা-পুত্র উভয়ে গভীর স্নেহ ও ভালোবাসায় আবিষ্ট হয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন এবং পিতার আদেশে ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এভাবে ভীম ফিরে পান তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও সপরিবারে নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে স্বস্তিতে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেন।

***বালচরিতম্* :** মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণকাহিনি অবলম্বনে নাট্যকার ভাস-কৃত *বালচরিতম্* একটি নাটক শ্রেণির রূপক। নাটকটির অঙ্ক সংখ্যা পাঁচ। এই নাটকে ভাস বহু পাত্র-পাত্রীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বলতে গেলে ভাস রচিত নাট্যসাহিত্যের মধ্যে বালচরিতেই পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক। উক্ত নাটকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে মোট ছত্রিশটি চরিত্র বিদ্যমান। এছাড়া অন্যদের সংলাপের মধ্য দিয়েও কয়েকটি চরিত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এখানে নাট্যকার কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে চিত্রিত করে তাঁর মহিমা বর্ণনা করেছেন।

ভগবান বিষ্ণুর চারযুগের প্রশস্তির মাধ্যমে সূত্রধার নাটকটির সূচনা করেন। দেবর্ষি নারদের সংলাপের মাধ্যমে জানা যায় যে, অত্যাচারী কংসকে ধ্বংস করার নিমিত্তে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্ম নেন। দেবকীর স্বামী বসুদেব তাঁদের সন্তানকে কংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সদ্যজাত পুত্রকে নিয়ে দুর্যোগপূর্ণ রাতের ঘনঘোর অন্ধকার পেরিয়ে গোকুলে নন্দগোপের নিকট গমন করেন। সেখানে তিনি নিজের পুত্রকে রেখে নন্দগোপের নবজাতা কন্যাকে নিয়ে মথুরায় ফিরে আসেন। এদিকে কংস তাঁর চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকারের অশুভ ও অমঙ্গলজনিত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন। এছাড়া তিনি বসুদেবের নিকট থেকে দেবকীর কন্যা-সন্তান প্রসবের সংবাদ জেনে ঐ শিশুকন্যাকে হত্যা করতে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যত হন। তাকে শিলাখণ্ডে আছাড় দিতেই শিশুটির দেহ দুই অংশে বিভক্ত হয়ে এক অংশ মাটিতে পড়ে থাকে এবং অন্য অংশ শূন্যে উঠে দেবী কাত্যায়নীর রূপ ধারণ করে। ইতোমধ্যে নন্দগোপ বালক কৃষ্ণের বিভিন্ন অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করেন। গোকুলে বালক কৃষ্ণ পুতনা, শকটাসুর, যমলার্জুন, ধেনুক, কেশী ইত্যাদি রাক্ষসদের বধ করে সেখানকার অধিবাসীদের নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের পথ প্রশস্ত করেন। গোকুলে কৃষ্ণের অবস্থানের ফলে সেখানকার ধন, ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে উঠে। ফলে কৃষ্ণকে গোপালকেরা দামোদর নামে আখ্যায়িত করেন। এক সময় দামোদর কালীয়নাগকে দমন করেন এবং বৃষরূপধারী অরিষ্টর্ষভ দানবকেও বধ করেন। এদিকে মথুরার অধিপতি কংস ধনুর্মহ নামক মহোৎসবের আয়োজন করে সপরিবারে দামোদরকে আমন্ত্রণ জানালে দামোদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সঙ্কর্ষণকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় গমন করেন। সেখানে তারা চাণুর, মুষ্টিক ইত্যাদি দানবসহ স্বয়ং কংসকে বধ করেন। এ সময় বসুদেব তাঁর সন্তানদের নিকট নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন এবং কংসের বন্দি পিতা উগ্রসেনকে কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। পরিশেষে রঙ্গমঞ্চে নারদ আবির্ভূত হয়ে দামোদরকে স্বয়ং নারায়ণ বলে প্রচার করে তাঁকে সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পুনরায় স্বর্গে গমন করেন।

২.৫ ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, নাট্যকার ভাস ঐতিহাসিক ও লোককাহিনিকে অবলম্বন করে দুটি নাটক (রূপক) রচনা করেন : *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* ও *স্বপ্নবাসবদত্তম্*। নিম্নে সংক্ষেপে এগুলোর বিষয়বস্তুসহ পরিচয় তুলে ধরা হলো :

***প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* :** ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ লোককাহিনি উদয়ন–কথা অবলম্বনে রচিত *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ*'কে একটি নাটিকা শ্রেণির উপরূপক বলা যায়। নাটিকাটির আরেকটি নাম *প্রতিজ্ঞানাটিকা*। উক্ত নাটিকায় চারটি অঙ্ক এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে মোট বিশটি চরিত্র রয়েছে। এছাড়া অন্যদের সংলাপের মাধ্যমেও বেশকিছু চরিত্র উল্লিখিত হয়েছে।

একদা বৎসরাজ উদয়ন মৃগয়ায় গেলে তাঁর শত্রু উজ্জয়িনীরাজ মহাসেন প্রদ্যোত তাঁকে কৃত্রিম হস্তী শিকারের ছলনায় কৌশলে তাঁর মন্ত্রী শালঙ্কায়নের মাধ্যমে বন্দি করে উজ্জয়িনীতে নিয়ে আসেন। শালঙ্কায়ন উদয়নের ঘোষবতী নামক বীণাটি তাঁর নিকট থেকে নিয়ে মহাসেনকে প্রদান করেন এবং মহাসেন সেটি তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা বাসবদত্তাকে প্রদান করেন। উদয়নের বন্দি হওয়ার সংবাদে বৎস্যরাজ্যে অবস্থানরত তাঁর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও প্রভুভক্ত বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ উদয়নকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে দৃঢ়সংকল্প করেন। ইতোমধ্যে বাসবদত্তার জন্য যোগ্যপাত্র হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

মহাসেন ও রাজমহিষী উভয়েই বৎসরাজ উদয়নকেই মনে মনে নির্বাচন করেন। তবে বৎসরাজ্যের সঙ্গে আপাতবৈরিতার কারণে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মহাসেন তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেন না। এদিকে উদয়ন প্রথম দর্শনেই বাসবদত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং গান্ধর্বমতে বিয়ে করেন। বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের সম্পর্কের বিষয় অবগত হয়ে যৌগন্ধরায়ণ বিদূষকের প্রস্তাবানুসারে স্বীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করে উদয়ন কর্তৃক রাজকন্যা বাসবদত্তাকে হরণ করানোর প্রতিজ্ঞা করেন। এ ছাড়াও তিনি উদয়নের ঘোষবতী বীণা, নলাগিরি নামক হস্তী, উদয়নের পত্নী অবন্তিরাজকন্যা বাসবদত্তা এবং রাজা উদয়নকে একত্রে উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা করেন। পরিকল্পনামাফিক উদয়ন অবন্তিরাজকন্যা বাসবদত্তাকে নিয়ে পালানোর পর যৌগন্ধরায়ণ তাঁর ছদ্মবেশী গুপ্তচরদের সাহায্যে মহাসেনের সৈন্যদের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অবশেষে উদয়নকে মহাসেনের সৈন্যগণ ধরতে ব্যর্থ হলেও যৌগন্ধরায়ণ বন্দি হন। তবে যৌগন্ধরায়ণ মহারাজ উদয়নকে মুক্ত করার আনন্দে নিজের বন্দিদশা নিয়ে একটুও দুঃখিত হন না। পরিশেষে মহাসেন জামাতা হিসেবে উদয়নকে মেনে নিয়ে বাসবদত্তা ও উদয়নের গোপন বিয়ের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

স্বপ্নবাসবদত্তম্ : পূর্বোক্ত *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* নাটিকার পরবর্তী ঘটনা নিয়ে *স্বপ্নবাসবদত্ত* রচিত। সুতরাং, এটিও ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ লোককাহিনি উদয়ন-কথা অবলম্বনে রচিত। নাট্যসাহিত্যের শ্রেণিকরণে *স্বপ্নবাসবদত্ত* একটি নাটক শ্রেণির রূপক। উক্ত নাটকের অঙ্ক সংখ্যা ছয় এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এখানে আঠারটি চরিত্র বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্যের সংলাপের মধ্য দিয়েও কিছু চরিত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে বিশিষ্ট নাট্যশিল্প-অভিজ্ঞ খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এসেছেন। তাঁরা ভাসের রচনাসমূহের মধ্যে *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকটিকেই উৎকৃষ্ট রচনা হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করেন—যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বৎসরাজ উদয়ন শত্রু আরুণি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হলে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ দৈবজ্ঞদের ভবিষদ্বাণীকে কাজে লাগিয়ে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিয়ের মাধ্যমে উদয়নের শক্তি বর্ধিত করার পরিকল্পনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সেনাপতি রুমন্বান্ ও রানি বাসবদত্তার সঙ্গে পরামর্শ করে যৌগন্ধরায়ণ অগ্নিকাণ্ডে বাসবদত্তা ও নিজের মৃত্যু সংবাদ রটনা করে ছদ্মবেশে বাসবদত্তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর পরিব্রাজকের বেশধারী যৌগন্ধরায়ণ আবন্তিকার বেশধারিণী বাসবদত্তাকে নিজের ভগ্নী পরিচয়ে মগধরাজকুমারী পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখেন। কিছুদিনের মধ্যেই উদয়নের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পদ্মাবতীর সঙ্গে বিয়ের পরও উদয়ন বাসবদত্তাকে একটুও ভুলতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

একদিন শিরঃপীড়ায় কষ্ট পেয়ে সমুদ্রগৃহে পদ্মাবতীর অবস্থানের সংবাদ পেয়ে উদয়ন সেখানে গিয়ে পদ্মাবতীকে না দেখে তাঁর শয্যায় শুয়ে পড়েন। এদিকে বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে সঙ্গ দিতে সমুদ্রগৃহে উপস্থিত হন এবং সেখানে শয্যায় উদয়নকে পদ্মাবতী মনে করে তাঁরই পাশে শয়ন করেন। ইতোমধ্যে উদয়ন বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেন। বাসবদত্তা তখন উদয়নকে চিনতে পেরে দ্রুত উক্ত গৃহত্যাগ করেন। আর উদয়নও তাঁকে ধরতে গিয়ে জাগরিত হয়ে বাস্তবতার সম্মুখীন হন। পরিশেষে মগধরাজের সাহায্যে শত্রুকে জয় করে বৎসরাজ্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার পুনর্মিলন ঘটে এবং মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও আত্মপ্রকাশ করে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা উপস্থাপন করেন। আর এ হেন আনন্দঘন মুহূর্তে সবাই বাসবদত্তার পিতা-মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে অবন্তিদেশে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২.৬ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌরাণিক ও কল্পিত বিষয়কে অবলম্বন করে ভাস দুটি নাটক (রূপক) রচনা করেন : *অবিমারকম্* ও *চারুদত্তম্*। নিম্নে সংক্ষেপে এগুলোর বিষয়বস্তুসহ পরিচয় তুলে ধরা হলো :

***অবিমারকম্* :** গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা*, সোমদেব রচিত *কথাসরিৎসাগর*, ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* ও জাতকের 'এড়ক-মাড়ক' উপাখ্যান প্রভৃতি নাট্যকার ভাস রচিত অবিমারকের উৎস হিসেবে পরিগণিত। ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট *অবিমারক* একটি নাটক শ্রেণির রূপক। উক্ত নাটকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে তেইশটি চরিত্র বিদ্যমান। এছাড়া অন্যদের সংলাপের মধ্য দিয়েও কয়েকটি চরিত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

একদা রাজা কুন্তীভোজের কন্যা কুরঙ্গীকে অবিমারক নামে আখ্যায়িত এক যুবক মত্ত হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। এই যুবকটি প্রকৃতপক্ষে সৌবীর রাজপুত্র বিষ্ণুসেন। ব্রহ্মশাপে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। মেষরূপধারী এক অসুরকে বধ করায় তাঁকে অবিমারক বলা হয়। অবিমারক রাজকন্যা কুরঙ্গীর প্রেমে আকৃষ্ট হন। তিনি কুরঙ্গীর ধাত্রী ও পারিচারিকার সাহায্যে ছদ্মবেশে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে গোপনে প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু এক সময় এই গোপন প্রণয়কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অবিমারক তখন রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে বিভিন্নভাবে আত্মহত্যার চেষ্ট করেন। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই তিনি অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। এ সময় কোনো এক বিদ্যাধরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং বিদ্যাধর কর্তৃক প্রদত্ত একটি আংটির সাহায্যে অবিমারক পুনরায় রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কুরঙ্গীকে আত্মহনন থেকে বিরত করেন। এরপর থেকে প্রতিরাতেই অবিমারক আংটির সহায়তায় কুরঙ্গীর সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

মিলিত হন। এদিকে কুন্তীভোজ রাজকন্যা কুরঙ্গীকে কাশীরাজপুত্র জয়বর্মার (কুন্তীভোজের আরেক ভাগ্নে) সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করেন। অবশেষে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হলে সবাই জানলেন যে, অবিমারক আসলে ছদ্মবেশী রাজপুত্র বিষ্ণুসেন। ফলে নায়ক-নায়িকার মধ্যে মিলনের বাঁধা দূরীভূত হয়ে প্রকাশ্যেই অবিমারকের সঙ্গে রাজকুমারী কুরঙ্গীর বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

চারুদত্তম্ **:** নাট্যকার ভাস বিরচিত *চারুদত্ত* তাঁর তেরটি নাট্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। কেন না ভাস-পরবর্তী বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রক কৃত *মৃচ্ছকটিক* ভাসের *চারুদত্ত*'কে অবলম্বন করেই রচিত বলে অনেক গবেষকই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে একজন গবেষকের মত হলো, "... শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ভাসের চারুদত্তেরই পরিবর্ধিত এবং পরিষ্কৃত রূপ। ... কারণ 'চারুদত্ত'কে অবলম্বন করেই 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রবর্তনা।"[৩৬] নাট্যসাহিত্যের শ্রেণিকরণে *চারুদত্ত* একটি প্রকরণ শ্রেণির রূপক। চারটি অঙ্ক এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে মোট ষোলটি চরিত্র নিয়ে প্রকরণটি রচিত। উক্ত চরিত্রসমূহ ছাড়াও কিছু চরিত্র অন্যদের সংলাপের মাধ্যমে এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রকরণে অভিজাত বণিক পরিবারের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ চারুদত্ত এবং প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্না সূক্ষ্মরুচিবোধের অধিকারিণী বিলাসনিপুণা বারবণিতা বসন্তসেনার অসম্পূর্ণ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নায়ক চারুদত্ত উজ্জয়িনীর একজন খ্যাতিমান উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এক সময় তিনি ছিলেন অগাধ সম্পদের অধিকারী। কিন্তু অকাতরে দান করার কারণে তিনি দারিদ্র্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এই চারুদত্তের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হন নগরনটী বসন্তসেনা। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একবার বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখন তিনি তাঁর অলংকারগুলো চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রেখে যান। অতঃপর বসন্তসেনার প্রিয় পরিচারিকা মদনিকার প্রেমে আসক্ত সজ্জলক চারুদত্তের গৃহে সিঁধ কেটে বসন্তসেনা কর্তৃক গচ্ছিত রাখা অলংকারগুলো চুরি করে মদনিকাকে প্রদান করেন। এদিকে চারুদত্তের গৃহ থেকে বসন্তসেনার অলংকারগুলো চুরি হওয়ায় চারুদত্ত তাঁর পত্নী কর্তৃক প্রদত্ত কণ্ঠহার বসন্তসেনাকে প্রদান করেন। আর মদনিকাও বসন্তসেনার অলংকারগুলো চিনতে পারায় সজ্জলককে সেগুলো বসন্তসেনার নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করেন। মদনিকার পরামর্শ ও নির্দেশমত সজ্জলক অলংকারগুলো বসন্তসেনাকে ফেরত দিলে বসন্তসেনা সমস্ত বিষয় অবগত হন এবং মদনিকাকে সজ্জলকের হাতে সমর্পণ করেন। অবশেষে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে চারুদত্তের উদ্দেশ্যে বসন্তসেনার অভিসারে গমনের মাধ্যমে উক্ত প্রকরণের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ কাব্যলক্ষ্মীর এক অমরসৃষ্টি দুই সহস্রাধিক বছর পূর্বে আবির্ভূত মহামতি ভাস। তাঁর নাটকগুলো (রূপকগুলো) ভারতীয় তথা বিশ্ব ঐতিহ্যের সারস্বত ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত ঘটনাবলি অবলম্বনে রচিত। আমরা তাঁর নাটকগুলোকে (রূপকগুলোকে) বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছি : রামায়ণ-আশ্রিত; মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত; ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত এবং পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত। রামায়ণ-আশ্রিত নাটকের মধ্যে রয়েছে : *প্রতিমানাটকম্* ও *অভিষেকঃ*। মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটকের মধ্যে ছয়টি মহাভারত-আশ্রিত : *দূতবাক্যম্* ; *কর্ণভারম্* ; *পঞ্চরাত্রম্; দূতঘটোৎকচম্* ; *উরুভঙ্গম্* ও *মধ্যমব্যায়োগঃ* এবং একটি কৃষ্ণকথা-আশ্রিত : *বালচরিতম্*। ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত নাটকের মধ্যে রয়েছে : *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* ও *স্বপ্নবাসবদত্তম্*। পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত নাটকের মধ্যে রয়েছে : *অবিমারকম্* ও *চারুদত্তম্*।

নাটকগুলোর (রূপকগুলোর) সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, প্রতিটি নাটক (রূপক) রচনাশৈলীর দিক থেকে উৎকৃষ্ট, বিষয়বস্তুর দিক থেকে হৃদয়স্পর্শী, চরিত্র চিত্রণে সমুজ্জ্বল, আকর্ষণীয় ভাষা, ভাবাবেগে পরিপূর্ণ, শব্দ চয়নে নিখুঁত। এ বৈশিষ্ট্যগুলোই ভাস পরবর্তী কালিদাস থেকে শুরু করে সমসাময়িক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংস্কৃতসাহিত্যে একজন নাট্যকারের এত বৈচিত্র্যময় এবং বিপুল সংখ্যক দৃশ্যকাব্য বিরল। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় নাট্যকারের স্বকল্পিত না হলেও কাহিনি গ্রন্থনায় অসামান্য মৌলিক ও সৃজনশীল প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি আমাদের পরিচিত কাহিনিগুলোকে পরিমার্জন, পরিবর্তন, সংযোজন-বিয়োজন করে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু নাটকগুলোর কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি, ভারাক্রান্তও হয়নি। অধিকন্তু প্রতিটি নাটক রঙে-রসে হয়েছে সঞ্জীবিত, সুখপাঠ্য। বাহুল্য বর্জিত দীর্ঘ বর্ণনায় নাটকগুলোর গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। প্রতিটি নাটক অভিনয় উপযোগী এবং মঞ্চোপযোগী।এমন সার্থক দৃশ্যকাব্য সংস্কৃতসাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। তাই এই প্রবাদপুরুষ ভাসের কবিত্বশক্তি শাশ্বত, চিরন্তন এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এক অমূল্য সম্পদ।

এই অধ্যায়ে ভাসের নাট্যসাহিত্যের বিষয়বস্তু আলোচনায় এক দিকে যেমন ভাসের সমসাময়িক, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন কাহিনি, নারী-পুরুষ, কুশীলব তথা পাত্র-পাত্রীর কথাও উল্লিখিত হয়েছে। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে নারীচরিত্রের এক উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভাস বিরচিত নাট্যসাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাই তাঁর নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থানের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের সারস্বত ভাণ্ডার বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে ভাস পূর্ব ধ্রুপদী সংস্কৃতসাহিত্যে

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, *মনুসংহিতা*, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* এবং মহাকবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষের অমর সাহিত্যকীর্তির মুখ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রসমূহ চিত্রণে প্রয়াসী হব।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের চিরায়ত ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে পাশ্চাত্যের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সারস্বত অবদান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রেরণার উৎস। এই ভাবধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখি যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমন প্রাচ্য সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে, ঠিক তেমনি প্রাচ্য সভ্যতাও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার এই মেলবন্ধনের সাক্ষ্য হিসেবে আমরা লক্ষ করি যে, ১৭৮৯ সালে উইলিয়াম জোনস্ (William Jones) কালিদাসের *শকুন্তলা* নাটকের অনুবাদ করেন।যার দ্বারা ভারতীয় নাটক বিশ্বমানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তীতে ১৮২৬-২৭ সালে বৃটিশ নাট্যানুরাগী এইচ. এইচ. উইলসন (H.H. Wilson) *Select Specimens of the Theater of the Hindus* শিরোনামে তিন খণ্ডে গ্রন্থ রচনা করেন যা পরবর্তীকালে জার্মান ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমূলার (Maxmüller) তাঁর *Sacred Books of the East* গ্রন্থ রচনা করে প্রাচ্যের শিল্প-সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করেন। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে রয়েছে চিরকালীন মানবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা। ফলে যুগ-যুগান্তরের মানুষ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের প্রতি বারবারই আকর্ষণ বোধ করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় বিভিন্ন নাট্যকারদের বিভিন্ন নাটক পাশ্চাত্যে প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে বসন্তকালে আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Drama and Theater-এ ভাসের বিখ্যাত *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকটি *The Vision of Vāsavadattā* শিরোনামে মঞ্চস্থ হয়। এথেকে বোঝা যায় যে, চিরায়ত ভারতীয় নাট্যসাহিত্য তার রসগুণের কারণে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি :

> Rediscovery of the ancient Indian theater has a relevance not only for modern theater in India, but also for those countries in Asia which are in search of their identity and are anxious to forge links with their past. Some aspects of the rasa-oriented theater can have a universal appeal. It may be relevant for the world theater to explore this last tradition while evolving a common ethos for the world of tomorrow. After all, this tradition does embody in itself the experience of a culture in which more than one-fifth of mankind is still rooted. This, if nothing else, should be enough to motivate an international effort in this direction. It the current urge for peace leads to an era of coexistence and cooperation, it is within the realm of possibility that the young citizens of the world may get more and more interested in the rasa-oriented theater with its emphasis on synthesis and consensus. (Rachel Van M. Baumer and James R. Brandon, Edited, *Sanskrit Drama in Performance*, Vol. 11, 1st Indian Edition : Delhi, 1993, 1st published : University of Hawaii Press, 1981, p. 137)

Dhaka University Institutional Repository

২. পারিপার্শ্বিকঃ : মা তাবৎ প্রথিতযশসাং ভাসকবিপুত্রসৌমিল্লকাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ।

অর্থাৎ, না না। ভাস, কবিপুত্র, সৌমিল্ল প্রমুখ বিখ্যাত কবিগণ কর্তৃক রচিত সাহিত্যকর্মকে বাদ দিয়ে অল্পদিনের কবি কালিদাসের রচিত সাহিত্যকর্মের প্রতি পরিষদের এত আগ্রহ কেন? (কালিদাস, 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ২৫৯)

৩. ভি. বেঙ্কটাচলম্, *ভাস*, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ভারত, ১৯৯৫, পৃ. ২২

৪. Dasgupta, S.N., and S.K. De, *A History of Sanskrit Literature: Classical Period*, Vol. 1, University of Calcutta, Calcutta, 1947, p. 101

৫. ইমাং সাগরপর্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥

এই শ্লোকটি ভরতবাক্য হিসেবে *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, *বালচরিতম্* ও *দূতবাক্যম্* গ্রন্থে বিদ্যমান এবং

ভবন্ত্বরজসো গাবঃ পরচক্রং প্রশাম্যতু।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥

এই শ্লোকটি ভরতবাক্য হিসেবে *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*, *অবিমারকম্* ও *অভিষেকনাটকম্* গ্রন্থে বিদ্যমান।

(ভাস, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, পৃ. ২৭৪

ভাস, 'বালচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, পৃ. ১৯৮

ভাস, 'দূতবাক্যম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ২৮৫

ভাস, 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, পৃ. ৮১

ভাস, 'অবিমারকম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, পৃ. ১২৫

ভাস, 'অভিষেকঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪)

৬. এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে! কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে।

এই বাক্যটি *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, *পঞ্চরাত্রম্*, *মধ্যমব্যায়োগঃ*, *অভিষেকঃ*, *দূতঘটোৎকচম্*, *ঊরুভঙ্গম্*, *কর্ণভারম্*, *দূতবাক্যম্*, ও *বালচরিতম্* —এই নয়টি গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়।

(ভাস, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

ভাস, 'পঞ্চরাত্রম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

ভাস, 'মধ্যমব্যায়োগঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

ভাস, 'অভিষেকঃ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

ভাস, 'দূতঘটোৎকচম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

ভাস, 'ঊরুভঙ্গম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

ভাস, 'কর্ণভারম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ভাস, 'দূতবাক্যম্', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

ভাস, 'বালচরিতম্', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১)

৭. যত্রার্থে চিন্তিতেহন্যস্মিংস্তল্লিঙ্গোহন্যঃ প্রযুজ্যতে।

আগন্তকেন ভাবেন পতাকাস্থানকং তু তৎ ॥ সাহিত্যদর্পণঃ, ৬/৪৫

(বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৪৯)

অর্থাৎ, যেখানে কোনো একটি বিষয়ের চিন্তার সঙ্গে সেই সম্পর্কিত অন্য বিষয়ের আগমন ঘটে, সেখানে তাকে পতাকাস্থান বলে।

৮. যুদ্ধং রাজ্যভ্রংশো মরণং নগররোপধনঞ্চৈব।

(নগরোপরোধনংচৈব?)

অপ্রত্যক্ষকৃতানি প্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি ॥ *নাট্যশাস্ত্র*, ২০/২০

(ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, ৩ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃ. ২২)

অর্থাৎ, (দৃশ্যকাব্যের) অঙ্কে যুদ্ধ, রাজ্যভ্রংশ, মৃত্যু, নগরের অবরোধ ইত্যাদি প্রদর্শন করা যাবে না। এগুলো প্রবেশকের মাধ্যমে প্রদর্শিত নিয়মসিদ্ধ।

৯. বাণভট্ট, 'হর্ষচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৮ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ. ২২১

১০. উদ্ধৃত, ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৪০০

১১. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

১২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, æDramas ascribed to Bhāsa" in *A History of Sanskrit Literature: Classical Period*, প্রাগুক্ত, p. 102

১৩. ভি. বেঙ্কটাচলম্, *ভাস*, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. ভাস, *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর (সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১ সাল, পৃ. ভূমিকা-৩

১৭. বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।
ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ ॥
ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্যলক্ষণে।

নাট্যশাস্ত্র, ২০/২-৩

(ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, ৩ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২০. ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, ৩ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

২১. ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, ৩ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩০. বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

৩১. ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, ৩ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০

৩২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, ভাস, 'দূতবাক্যম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৮

৩৩. Dasgupta, S.N., and S.K. De, *A History of Sanskrit Literature*, প্রাগুক্ত, p. 112

৩৪. প্রাগুক্ত, p. 724

৩৫. ভাস, 'মধ্যমব্যায়োগঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮ এবং Biswanath Bhattacharyya, *A Critical Survey of Bhāsa's Mahābhāratān Dramas,* Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 1991, p. 31-32

৩৬. সুরেন্দ্রনাথ দেব, *চারুদত্তম্*, ভূমিকা, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী

৩.১ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভাস ও ভাস রচিত তেরটি নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, ভাস তাঁর পূর্ববর্তীকালের মহাকাব্য, ঐতিহাসিক কাহিনি, লোককাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি প্রভৃতি থেকে বিষয়বস্তু, চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-প্রতিবেশ নিয়ে তাঁর নাট্যসাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। এই ভিত্তির উপরই তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি উপস্থাপন করেছেন। বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের নাট্যকারদের এটাই প্রচলিত রীতি এবং ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের জনক মহামুনি ভরত নাট্যতত্ত্বের এই রীতির কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস ও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলি থেকে বিষয়বস্তু ও চরিত্র চয়নের সুবিধা হচ্ছে, তা সহজেই দর্শক-শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। আমরা তাই ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারীচরিত্রের অনুপুঙ্খ অবস্থা ও অবস্থান আলোচনার পূর্বে বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে ভাস-পূর্ব ধ্রুপদী সংস্কৃতসাহিত্যে উল্লিখিত মুখ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রসমূহ পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে, রাষ্ট্র, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে ভূমিকা পালন করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। আমাদের এ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার পথ সুগম করবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি প্রধান মূলধারা : বৈদিক ও লৌকিক। এই বৈদিকধারার মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। বিদ্বজ্জনের ধারণা খ্রি.পূ. দুই হাজার বছর পূর্বে যাযাবর শ্রেণির আর্য নামক এক জাতি মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই আর্য শ্রেণির ধর্মের নাম বৈদিকধর্ম এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'বেদ' শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। বিদ্+অচ্= বেদ। বেদ অর্থ জ্ঞান বা পবিত্রজ্ঞান বা পরমজ্ঞান। সাধারণত বলা হয়ে থাকে বেদ এক অলৌকিক অখণ্ড জ্ঞানের সমষ্টিIযার দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষIএই চতুর্বর্গের সন্ধানলাভ করতে সমর্থ হয়। ফলে বেদ নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ, অভ্রান্ত, অলঙ্ঘনীয়, সনাতন ও অপৌরুষেয়।

বেদ ভারতবর্ষের বিশেষ করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য এবং ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগোষ্ঠীগত ভারতীয় জাতির মন ও মননের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই সাহিত্য কোনো

একক গ্রন্থবিশেষ নয়।প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমাহার। সামগ্রিকভাবে এই শতাধিক গ্রন্থের সমাহারকে 'বৈদিকসাহিত্য' নামে অভিহিত করা হয়। বৈদিকসাহিত্য অর্থে এই বেদকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : (১) সংহিতা; (২) ব্রাহ্মণ; (৩) আরণ্যক এবং (৪) উপনিষদ।

সংহিতা হচ্ছে : গান, স্তোত্র, মন্ত্র ইত্যাদির সংকলন। ব্রাহ্মণ হচ্ছে : গদ্যে রচিত এক ধরনের যাগ-যজ্ঞের ব্যাখ্যা বিষয়ক সাহিত্য। আরণ্যক হচ্ছে : বিশ্বরহস্যের সমাধান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে অরণ্যে রচিত এক জাতীয় সাহিত্য। আর উপনিষদ হচ্ছে : দার্শনিকতত্ত্বের বিচার-সম্বলিত সাহিত্য।

সংহিতা প্রধানত চার প্রকার : (১) ঋগ্বেদ সংহিতা; (২) সামবেদ সংহিতা; (৩) যজুর্বেদ সংহিতা ও (৪) অথর্ববেদ সংহিতা। বৈদিকসাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্বপ্রাচীন। ঋগ্বেদ সংহিতায় মন্ত্রের দ্বারা দেবস্তুতি, প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান করা হয়। এখানে দেবতাদের আহ্বান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁরা যেন পার্থিব সম্পদের সহায়ক হন এবং একই সঙ্গে সন্তান-সন্তানাদি ও অন্ন-বস্ত্রের নিরাপত্তা প্রদান করেন। সামবেদ সংহিতায় মূলত গানের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বান করা হয়। যজুর্বেদ সংহিতায় যজ্ঞের মন্ত্র দ্বারা দেবতাদের আহ্বান করা হয় এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হয়। অথর্ববেদ মূলত জনগণের মঙ্গলে ব্যবহৃত রোগ নিবারণ এবং শত্রুর অনিষ্ট কামনায় উদ্দিষ্ট মন্ত্রসমূহের সমষ্টি। এই মন্ত্রগুলো ঐন্দ্রজালিক, প্রহেলিকাজাতীয়, রহস্যময় বলে এই বেদকে 'অথর্বাঙ্গিরস' নামে অভিহিত করা হয়।

বৈদিকসাহিত্য অনেক ব্যাপক। এর মধ্যে দেব-দেবতা, যাগ-যজ্ঞ ছাড়াও তৎকালীন সমাজের সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, কৃষিকথা, চিকিৎসাবিদ্যা, বিবাহপ্রথা ইত্যাদিসহ সমাজস্থ সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে আমরা তৎকালীন নারীসমাজের শিক্ষা-দীক্ষা ও তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ রূপরেখা জানতে পারি। তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যার একটি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় অথর্ববেদ সংহিতা থেকে। দেবতাদের সঙ্গে এই পৃথিবীর রক্ত-মাংসের মানুষের সম্পর্ক এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দেবস্তুতি বেদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাই বেদ শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারও একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল।

বৈদিকসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৈদিকসমাজ মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল : (ক) পশুপালন; এবং (খ) কৃষিকাজ। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকবিদগণ গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, পশুপালননির্ভর সমাজব্যবস্থা মূলত পুরুষ প্রধান এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-

Dhaka University Institutional Repository

ধারণাতেও পুরুষ প্রাধান্য বিদ্যমান। অপরদিকে, কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা প্রধানত মাতৃপ্রধান এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণাতেও মাতৃপ্রাধান্য লক্ষ করা যায়।[১] ফলে বৈদিকসমাজ ও বৈদিক চিন্তাধারা যৌথজীবন এবং যৌথশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়। বৈদিকসমাজ ও চিন্তাধারায় একদিকে লক্ষ করা যায় জীবন-ধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত আনুষঙ্গিক বিবরণ। অন্যদিকে, লক্ষ করা যায় বিশ্বরহস্য উন্মোচনের এবং বিশ্ব-রহস্য উপলব্ধির এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। বৈদিক চিন্তাধারায় বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে মানবসত্তার সম্পর্কের বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাপকভাবে এবং অতীব নিপুণতার সঙ্গে। তাই আমরা লক্ষ করি, বৈদিক চিন্তাধারায় যেমন রয়েছে বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা, অন্যদিকে রয়েছে নৈতিক নিয়মানুবর্তিতারও আলোচনা। এই উভয় নিয়মই সর্বব্যাপী এবং সর্বজনীন।[২]

বৈদিকসমাজ এবং বৈদিকসমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বৈদিকসাহিত্যে বিধৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বৈদিকসাহিত্য আর্যদের দ্বারা রচিত এবং তাদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সমাজ-কাঠামো, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ ইত্যাদি বিশাল বৈদিকসাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বৈদিকসমাজের নারীর অবস্থা ও অবস্থানকে সেই সমাজের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থান ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণয় করতে প্রয়াসী হব।

পারিবারিক অবস্থা ও অবস্থান

গঠনগত দিক থেকে বৈদিকসমাজের পারিবারিক কাঠামো ছিল পিতৃতান্ত্রিক। এই সমাজব্যবস্থায় একান্নবর্তী পরিবারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল এবং পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা গুরুত্ব দিয়েই পালিত হতো। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিকভাবেই পিতা ছিলেন পরিবারের প্রধান এবং একারণেই পুত্রসন্তান কামনা প্রাধান্য পেত। পুত্রসন্তান কামনার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বংশক্রমধারা রক্ষা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির প্রত্যাশা। এ ছাড়া কন্যাসন্তান বিবাহ-পরবর্তী সময়ে অন্য বংশে চলে যাওয়ার কারণে কন্যাকে তেমন প্রার্থনীয় বিষয় বলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে বৈদিকসাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বিদুষী কন্যার কামনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থা ও অবস্থান তেমন অনুকূল না হলেও কন্যাসন্তানের জন্ম একেবারে উপেক্ষিত ছিল না।

বৈদিকসমাজে নারীরা মূলত গৃহকাজে সীমাবদ্ধ থাকলেও শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এথেকে বোঝা যায়, বৈদিকযুগের সমাজব্যবস্থায় পরিবারে নারীর স্থান ছিল সুশোভিত ও সমুন্নত এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার অসহিষ্ণু ও অশ্রদ্ধার ভাব দেখানো হয়নি। ব্যবহারিক ও ভাবজগতে পারিবারিক পরিবেশে পুরুষের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকার কথাও জানা যায়। তাই আমরা বলতে পারি, বৈদিকযুগের পারিবারিক জীবনে নারীরা পুরুষের সঙ্গে একদিকে যেমন সম-অধিকারের অংশীদারি ছিলেন, তেমনি স্বাচ্ছন্দচারিণীও ছিলেন।

বৈদিকসমাজব্যবস্থায় পিতৃগৃহে বসবাসকারী অবিবাহিতা কন্যার কথা জানা যায়। সে সময়ে অনেক কুমারী কন্যাই সারাজীবন পিতা-মাতার সঙ্গে থেকে জীবন কাটিয়েছেন। এসব কুমারী কন্যারা শুধু পিতা-মাতার গৃহেই বসবাস করতেন না, তাদের পিতার সম্পত্তিতেও অধিকার ছিল। বৈদিকসমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সমাজব্যবস্থায় দাম্পত্য সম্পর্ককে উচ্চ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হতো। পারিবারিকভাবে স্বামী-স্ত্রীর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সুখ-শান্তিতে যৌথ জীবনযাপনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হতো। বিবাহের বিভিন্ন মন্ত্রে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবন্ধনকে অত্যন্ত গভীর এবং পবিত্র মনে করা হতো। এথেকে বোঝা যায়, বৈদিকসমাজে নারীকে পারিবারিকভাবে একটি সম্মানিত এবং উচ্চস্থানের মর্যাদা দেওয়া হতো। ঋগ্বেদে নববধূকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে :

> সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
> ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥
> *ঋগ্বেদ-সংহিতা* , ১০/৮৫/৪৬[৩]

অর্থাৎ, তুমি শ্বশুরের উপর কর্তৃত্ব কর, শাশুড়িকে বশ কর এবং ননদ ও দেবরদের নিকট সম্রাজ্ঞীর মতো হও।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য হচ্ছে, নববধূর কর্তৃত্ব কোনো অবস্থাতেই শক্তি প্রয়োগের দ্বারা নয়, স্নেহ ও সম্মানের দ্বারা তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু তাই নয়, বৈদিকযুগে বিবাহবন্ধনকে নারী-পুরুষের মানসিক অবস্থার একীভূতকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে :

> সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
> সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥
> *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, ১০/৮৫/৪৭[৪]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও দাম্পত্য বন্ধনকে সুশৃঙ্খলিতকরণের জন্য দেবতাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছেঃ

অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্মান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রুয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি॥
ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৫/২৮/৩[৫]

পারিবারিকজীবনে নববধূর দায়িত্বের কথা তথা নারীদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে ঋগ্বেদ-সংহিতায় বলা হয়েছে :

উপো অদর্শি শুংধ্যুবো ন বক্ষো নোধা ইবাবিরকৃত প্রিয়াণি।
অদ্মসন্ন সসতো বোধয়ন্তী শশ্বত্তমাগাৎ পুনরেয়ুষীণাম্ ॥
১/১২৪/৪[৬]

অর্থাৎ, "সূর্য যেমন নিজ বক্ষ আবিষ্কার করেন এবং নোধাঋষি যেমন আপনার প্রিয়বস্তু আবিষ্কার করেছিলেন সেরূপ ঊষা আপনাকে আবিষ্কার করেছেন। গৃহিণী জেগে যেমন সকলকে জাগান, ঊষাও জগতীজনকে সেরূপ জাগরিত করেন, ঊষা অভিসারিকাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকবার আসেন।"

উপর্যুক্ত মন্ত্রসমূহে পারিবারিকজীবনে নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য এবং কর্তৃত্বের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান

বৈদিকযুগের উপর্যুক্ত পারিবারিকজীবন থেকে আমরা এ কথাই বলতে পারি যে, তাদের পারিবারিকজীবন সে সময়কার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত উচ্চস্থানে পৌঁছেছিল এবং তাদের এই পারিবারিকজীবন থেকেই বৈদিকযুগের সামাজিকজীবনের চিত্র পাওয়া যায়। বৈদিকসমাজ একটি পরিণত এবং উন্নতযুগের স্বাক্ষর বহন করে। তার প্রমাণ তাদের সামাজিক কাঠামো, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা এবং জগৎ-জীবন সম্পর্কে উন্নত, বৌদ্ধিক ও যুক্তিভিত্তিক অনুধ্যানমূলক চিন্তাভাবনা। একটি উন্নতমানের সামাজিকজীবনের প্রয়োজনে বৈদিকযুগের অধিবাসীরা যেমন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তেমনি 'গ্রাম', 'বিশ', 'জনপদ' এবং 'রাষ্ট্র'ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বৈদিকসমাজে আর্যদের জীবনব্যবস্থা চতুরাশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস ও বাণপ্রস্থ্I এই চারভাগে বিভক্ত ছিল। ঋগ্বেদীয় বৈদিকসাহিত্যে জাতিভেদের উল্লেখ না থাকলেও ঋগ্বেদোত্তর বৈদিকসাহিত্যে এর উল্লেখ রয়েছে। জন্ম দ্বারা নয়, গুণ ও কর্মের মাধ্যমেই জাতিভেদের কথা স্বীকৃত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তবে জাতিরূপে না হোক, ঋগ্বেদের সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রIএই চার শ্রেণির মানুষ সমাজে বসবাস করত এবং এদের সামাজিক স্তর বিন্যাসও ছিল।

বৈদিকযুগ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরিচয়বাহী হলেও নারীজাতির স্থান অত্যন্ত উন্নত এবং মর্যাদাকর ছিল। বৈদিকযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, জীবন-জীবিকা-পেশা, শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদিতে নারীদের অবস্থান কয়েকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ ব্যতীত অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা নিম্নে বৈদিকযুগের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে নারীদের সামাজিক অবস্থানের কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

বিবাহ প্রথা

বৈদিকযুগে বিবাহ ছিল অত্যন্ত পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়। পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম, ধর্মকর্ম, সন্তান উৎপাদন এবং প্রতিপালন ইত্যাদির জন্য ঋগ্বেদে বিবাহকে অত্যাবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহ হচ্ছে একটি ঐশ্বরিক বিধান যা নর-নারীকে পবিত্র সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই বৈদিকযুগে বিবাহ কোনো চুক্তি নয়Iবিবাহ হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় বিষয়, যা স্বামী-স্ত্রীকে সম-ভিত্তির উপর স্থাপন করে এবং স্বামী-স্ত্রীকে শাশ্বত ও চিরন্তন ভালোবাসায় আবদ্ধ করে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বৈদিকযুগের বিবাহপ্রথা এবং বিবাহিতজীবনকে একটি আদর্শায়িত হিন্দু পরিবার ও সমাজে নারীজাতির সু-উচ্চ অবস্থানের কথাই প্রতিফলিত করে।

বৈদিকসমাজে নারীদের দুটি ভাগে ভাগ করা হতো :

(ক) ব্রহ্মবাদিনী এবং

(খ) সদ্যোবধূ

ব্রহ্মবাদিনী নারীদের উপনয়ন দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। এঁরা পুরুষের ন্যায় পবিত্র অগ্নিকে সাক্ষী রেখে চিরকৌমার্য ব্রত পালন করতেন। অন্যদিকে সদ্যোবধূ নারীদের পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত করে উৎসবের মাধ্যমে বিবাহ দেওয়ার প্রথা বিদ্যমান ছিল। এথেকে বোঝা যায় যে, বৈদিকযুগের নারীরা উচ্চবর্ণের পুরুষদের ন্যায় উপনয়ন লাভ করতেন এবং এই প্রথা ছিল একটি আবশ্যক বিধি। এই সদ্যোবধূ রমণীদের শিক্ষালাভের সুযোগ থাকত এবং শিক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই, অর্থাৎ, প্রাপ্তবয়স্ক হলেই (১৬-১৭ বছর) বিবাহ দেওয়ার প্রচলন ছিল। বিদায়কালে পিতা-মাতা সদ্যোবধূদের এই বলে বিদায় দিতেন যে, তুমি তোমার পতিগৃহে সম্রাজ্ঞী হও এবং সমুদ্র যেমন সকল নদীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তুমিও তেমনি সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বৈদিকযুগে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিকসমাজে পতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এ ব্যাপারে ঋগ্বেদ-সংহিতায় বলা হয়েছে :

> কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্যেণ।
> ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ ॥
> ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০/২৭/১২[৭]

> অর্থাৎ, সমাজে কিছু কিছু স্ত্রীলোক আছে, যারা অর্থের লোভে নারী সহবাসে আকাঙ্ক্ষী মানুষদের প্রতি আসক্ত হন। আবার ভদ্র, সুঠাম ও সুগঠিত দেহের অধিকারিণী নারীরা বহু পুরুষের মধ্য থেকে নিজ পছন্দানুযায়ী পতি মনোনীত করেন।

এরূপ পতি নির্বাচন শুধুমাত্র রাজকন্যাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উচ্চশ্রেণির শিক্ষিতা নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। তবে এরূপ বিবাহব্যবস্থায় কন্যাকে নানারকম বেশভূষায় সুসজ্জিত করে বিয়ে দেওয়া হতো। এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'অবাঞ্চিত জামাতা', 'শারীরিক ত্রুটিযুক্ত নারী' এবং 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা'র ক্ষেত্রে যৌতুক প্রথার কথাও জানা যায়। তবে নারীদের ক্ষেত্রে বিবাহ করা সামাজিকভাবে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য ছিল না। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, সামাজিকজীবনে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বৈদিকসমাজ পুরুষতান্ত্রিক ছিল। তাই পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন থাকা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু বৈদিকযুগেই পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও বহু বিবাহের কথা জানা যায়। ঋগ্বেদের যুগে কয়েকটি মন্ত্রে নারীদের একাধিক পতি গ্রহণের অধিকারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, সূর্যের কন্যা সূর্যা অশ্বিদয়কে স্বামীরূপে বরণ করেছিলেন।[৮] সমাজে বহুবিবাহ প্রচলন থাকার কারণে ঋগ্বেদে সপত্নীর প্রতি আচরণের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। সপত্নীর প্রতি আচরণ যেমন ভয়াবহ, তেমনি কৌতুককর। সপত্নীকে বশীভূত করার জন্য একদিকে যেমন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হতো, তেমনি তাকে নিপীড়িত করারও সবরকম প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হতো। শুধু তাই নয়, সপত্নীকে পীড়নের পর স্বামীকে বশীভূত করার জন্য নানা প্রকার তুক-তাক এবং বশীকরণ মন্ত্রও উচ্চারিত হতো। এছাড়াও বৈদিকযুগে বিধবা নারীদের বিবাহের প্রথাও প্রচলন ছিল :

> উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
> হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥
> ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০/১৮/৮[৯]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, "হে নারি! সংসারের দিকে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন, সে পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হয়েছে।"

উপর্যুক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, তিনি (বিধবা পত্নী) তাঁর মৃত স্বামীর প্রতি সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্যও সমাপ্ত হয়েছে। তাই সংসারধর্মে ফিরে এসে পুনরায় বিবাহ করতে আর কোনো সামাজিক বাধা নেই।

বৈদিকযুগে দাম্পত্যজীবনের পাশাপাশি পতিতাবৃত্তিরও প্রচলন ছিল। এছাড়াও কুমারী নারীর গর্ভজাত সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতিও দেওয়া হতো। কুমারী নারীর গর্ভজাত সন্তান নিজ শ্রম ও মেধা দ্বারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেও বৈদিকসাহিত্য থেকে জানা যায়।

বৈদিকসমাজব্যবস্থায় সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল না। বরং বিধবা নারীদের সমাজে প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ করার অধিকারের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে অথর্ববেদে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু মন্ত্রে সহমরণ প্রথার উল্লেখ লক্ষ করা যায়।[১০] অবশ্য অথর্ববেদে সহমরণ প্রথাকে বাধ্যতামূলক না বলে নানা প্রকার সামাজিক বিড়ম্বনার কারণে একেবারেই ঐচ্ছিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে বিবাহপ্রথা তথা দাম্পত্যজীবনের উপর। নর-নারীর সম-ভূমিকায় একটি সমাজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করে এবং এই আরোহণের পূর্বশর্ত হচ্ছে নর-নারী তথা স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ করে নারীজাতির মর্যাদা দান। দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত সমগ্র বৈদিকসাহিত্যে বিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, পতি নির্বাচন, উপনয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীকে সেই মর্যাদা দিয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থা

বিশাল বৈদিকসাহিত্যে তৎকালীন সমাজের অনুপুঙ্খ ও প্রাণবন্ত যে বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থারও একটি সুবিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সমগ্র বৈদিকসাহিত্যে যে উন্নত সভ্যতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিমূলে রয়েছে সে সময়কার কিছু নর-নারীর বিচিত্র চিন্তার বৈভব যা অত্যুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করেছিল। মূলত সমগ্র বৈদিকসাহিত্যকে তৎকালীন সভ্যতার ও চিন্তাধারারই ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হয় না। বৈদিকযুগের এই সুউচ্চ সভ্যতা এবং সুউচ্চ চিন্তাধারায় নারীদের অবদান একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি আকর্ষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ এই

Dhaka University Institutional Repository

কারণে যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের যেখানে অবদমিত হবার কথা, সেখানে নারীরা নিজ মনন ও মেধায় সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আকর্ষণীয় এই কারণে যে, নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নারীরা সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে যে অবদান রেখেছেন তা আজকের যুগেও অত্যন্ত কষ্টকল্পিত বিষয়। তাই বৈদিকযুগে নারীদের এই শিক্ষা তথা তাদের উন্নতচিন্তা আজও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর এ কারণেই বৈদিকযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শুধু যে পুত্রের কামনা করা হতো, তা নয়। বিদুষী কন্যার জন্যও অনেকেই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত :

> অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়তে সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥
>
> বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬/৪/১৭[১১]

অর্থাৎ, "যদি কেহ চায়Iআমার বিদুষী কন্যা জন্মলাভ করুক এবং সে পূর্ণায়ু হউকIতবে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজন তিলমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করিয়া তাহাতে ঘি মিশাইয়া খাইবে। (তাহা হইলে তাহারা ঐ রকম কন্যা) উৎপাদন করিতে পারিবে।"

বৈদিকযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-দীক্ষায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। এই বিশ্বসৃষ্টিরহস্য, এ বিশ্বসৃষ্টির পেছনে যে এক আধ্যাত্মিক পরমসত্তা বিদ্যমান এবং চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি তথা জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং পুরুষ ও নারী কর্তৃক বিভিন্ন গ্রন্থের সূত্র, টীকা ও ভাষ্য রচনা ইত্যাদি বৈদিকসাহিত্যে লক্ষ করা যায়। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে চিকিৎসা, চিকিৎসক এবং নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির উল্লেখ থাকলেও অথর্ববেদে এ বিষয়ে আরো সুবিস্তৃত আলোচনা লক্ষ করা যায়। অথর্ববেদে নানাপ্রকার রোগ-ব্যাধি, তার প্রতিকার এবং ভেষজ চিকিৎসার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এছাড়া উন্নতমানের শল্যবিজ্ঞান (surgery) এবং অস্থিবিজ্ঞানের (Osteology) ও দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

সমগ্র বৈদিকসাহিত্য পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বৈদিকযুগের নারীরা বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল, মর্যাদার দিক থেকে সমুন্নত এবং শিক্ষাদীক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এসব নারীদের যেমন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি তারা পুরুষদের সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করছেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থাই নারীদের এই অবস্থা ও অবস্থানে উপনীত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বৈদিকসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের দু-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া নারীজাতির প্রতি অবমাননাকর কোনো কিছু লক্ষ করা যায় না। সে সময়ে আর্য পণ্ডিতগণ তাঁদের অনুধ্যানমূলক চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মানুষের ব্যবহারিক ও বাস্তবজীবনেই নয়—ভাবজগতের জীবনেও নারী-পুরুষ সম-অধিকারসম্পন্ন। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, তৎকালীন সমাজে উল্লেখযোগ্য নারী-মন্ত্রদ্রষ্টাদের মধ্যে রয়েছেন : রোমশা (লোমশা) (১/১২৬), লোপামুদ্রা (১/১৭৯), বিশ্ববারা (৫/২৮), অপালা (৮/৯১), ঘোষা (১০/৩৯-৪০), সূর্যা (১০/৮৫), বাক্ (১০/১২৫), ইন্দ্রাণী (১০/১৪৫), শ্রদ্ধা (১০/১৫১), ইন্দ্রমাতা (১০/১৫১), যমী (১০/১৫৪), বসুক্রজায়া (১০/২৭-২৮), উর্বশী (১০/৯৫), সরমা (১০/১০৮) প্রমুখ। এছাড়া গোর্বা, উপনিষৎ, নিষৎ, ছহুনাম্নী, ব্রহ্মজায়া, শাশ্বতী, লক্ষণা, সর্পরাজী, মের্ধা, দক্ষিণা, সাবিত্রী, অদিতি প্রমুখ ঋষি-নারীর নামও পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত নারী-ঋষিদের মধ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নারী-ঋষির কথা উল্লেখ করব যাঁদের চিন্তা-চেতনায় জগৎ-জীবন সম্পর্কিত আলোচনা, পুরুষদের সমান যাগ-যজ্ঞের অধিকার, পুরুষদের মতো মন্ত্র রচনা বা সংকলন ইত্যাদির অধিকার ছিল। এমন একজন নারী-ঋষি হচ্ছেন ঋষি অত্রি-কন্যা বিশ্ববারা। ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তে উপর্যুক্ত কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।[১২]

ঋগ্বেদের কোনো কোনো মন্ত্রে নারী-ঋষিরা স্বয়ং নিজেদের বিশ্বসংসারের সর্বনির্মাণকারিণী ও সর্বনিয়ন্ত্রক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের এই মন্ত্র থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, কোনো কোনো নারী-ঋষি পরমেশ্বরের সঙ্গে তুলনীয়া বা তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে সেকথাই প্রতিফলিত হয়েছে।[১৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, বৈদিকসাহিত্যে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু নানা অনুমান-প্রমাণে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি জানা যায়। শ্রেণিবিভক্ত, জাতিবিভক্ত ও বর্ণবিভক্ত সমাজে শুধু উচ্চবর্ণের নারীদেরই শিক্ষা তথা বেদ অধ্যয়নের সুযোগ ও অধিকার ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁরা অধ্যাপনার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। বৈদিকসাহিত্যে এরকম বিশিষ্ট কয়েকজন নারী অধ্যাপকের নাম পাওয়া যায় যাঁদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ও গার্গী উল্লেখযোগ্য।

মৈত্রেয় হচ্ছেন বৈদিকযুগের ত্রিগুণের অধিকারিণী একজন ঋষি, দার্শনিক এবং অধ্যাপিকা। তিনি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রজ্ঞামণ্ডিত অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিত্ব ও অধ্যাত্মচিন্তার উৎকর্ষসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রীর মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন হিন্দুশাস্ত্রের বিশাল জ্ঞানের অধিকারিণী একজন জ্ঞানতাপসী এবং আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। ফলে তাঁকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হতো। আর অন্য স্ত্রী কাত্যায়নী ছিলেন অতি সাধারণ এবং সাংসারিক কাজকর্মে নিবেদিতা প্রাণ একজন স্ত্রীপ্রজ্ঞা রমণী। সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণ অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে পার্থিব সম্পদ বন্টন

Dhaka University Institutional Repository

করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁদের অভিমত জানতে চান। এর উত্তরে মৈত্রেয়ী বলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ কি তাঁকে অমর করে রাখবে? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, সম্পদ শুধু কোনো মানুষকে বিত্তবান ব্যতীত আর কিছুই করতে পারে না। তাই মৈত্রেয়ী তখন তাঁকে 'অমরত্বের সম্পদ' প্রদানের অনুরোধ করেন। একথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য খুশি হয়ে অমরত্বের জ্ঞানলাভের জন্য আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় বিষয়গুলো অবহিত করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের ১ থেকে ১৪টি মন্ত্রে উপর্যুক্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আমরা নিম্নে ২ ও ৩ নং মন্ত্র উদ্ধৃত করছি যার মাধ্যমে মৈত্রেয়ীর অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে :

> সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি ॥২॥
>
> সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং? যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥৩॥
>
> বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২/৪/২-৩[১৪]

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ এবং ৮ম ব্রাহ্মণে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে গার্গী নামে একজন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ও দার্শনিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গার্গী ছিলেন বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী বাচক্নবীর অবিবাহিতা কন্যা এবং গার্গী-গোত্র-বংশীয় প্রধানা। তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রের স্রষ্টা এবং এসব মন্ত্রের মাধ্যমে তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি উপাদান এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বিদেহী রাজ্যের রাজা জনক কর্তৃক আহুত বিশ্বের প্রথম দার্শনিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন। এই সম্মেলনটি ছিল উন্মুক্ত। জানা যায়, তিনি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে 'আত্মা' সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন সূর্যদেবতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্রহ্মর্ষি। গুরুকুল আশ্রমে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সত্যপথে চলার শিক্ষালাভ করেন। রাজা জনক থেকে শুরু করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ তাঁর ছাত্রত্ববরণ করে চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হন। তিনি তাঁর সময়কার সকল পণ্ডিতদের তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বৌদ্ধিক জ্ঞান দ্বারা বিতর্কে পরাজিত করে 'সর্বজ্ঞান' উপাধিতে ভূষিতা হন এবং শিক্ষার সর্বোচ্চ আসন অলংকৃত করেন। এরকম একজন মনীষীর সঙ্গে গার্গী তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে সীমাহীন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন। গার্গী এতে পরাজয় স্বীকার করে যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানের উদাত্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। যাজ্ঞবল্ক্য রাজা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ১,০০০ (এক হাজার) গাভী এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) স্বর্ণমুদ্রার পুরস্কার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাখ্যান করে স্ত্রী মৈত্রেয়ীসহ স্বেচ্ছায় বনবাস জীবন গ্রহণ করেন। নিম্নে আমরা গার্গী কর্তৃক উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরছি :

> ... হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমপ্স্বোতং চ প্রোতং চ কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু গন্ধর্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাতিপ্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম ॥১॥
>
> বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩/৬/১[১৫]
>
> অর্থাৎ, গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, এই জগৎ-সংসারে সবকিছুর মূলেই যদি জল হয়, তাহলে জলের মূলে কি?
>
> উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, বায়ু।
>
> এরপর গার্গী প্রশ্ন করেন, বায়ুর মূলে কি?
>
> উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, অন্তরীক্ষলোক।
>
> গার্গী প্রশ্ন করেন, অন্তরীক্ষলোকের মূলে কি?
>
> যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করলেন, গন্ধর্বলোক।
>
> গার্গী প্রশ্ন করলেন, গন্ধর্বলোকের মূলে কি?
>
> যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আদিত্যলোক।
>
> গার্গী প্রশ্ন করলেন, আদিত্যলোকের মূলে কি?
>
> যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, চন্দ্রলোক।
>
> গার্গী প্রশ্ন করলেন, চন্দ্রলোকের মূলে কি?

Dhaka University Institutional Repository

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, নক্ষত্রলোক।

গার্গী প্রশ্ন করলেন, নক্ষত্রলোকের মূলে কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, দেবলোক।

গার্গী প্রশ্ন করলেন, দেবলোকের মূলে কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ইন্দ্রলোক।

গার্গী প্রশ্ন করলেন, ইন্দ্রলোকের মূলে কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, প্রজাপতিলোক।

গার্গী প্রশ্ন করলেন, প্রজাপতিলোকের মূলে কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ব্রহ্মলোক।

গার্গী প্রশ্ন করলেন, ব্রহ্মলোকের মূলে কি?

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মলোক সম্পর্কে প্রশ্ন করার মতো ধৃষ্টতা দেখাতে নিষেধ করে গার্গীকে এরকম সীমাহীন, অনর্থক ও অবান্তর প্রশ্ন করতে বারণ করলে তিনি প্রশ্ন করা থেকে বিরত হলেন।

গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্যের উপর্যুক্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে দার্শনিকতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে, তাকে আমরা অধিবিদ্যক প্রশ্ন হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। অধিবিদ্যা হচ্ছে দর্শনের অন্যতম একটি প্রধান শাখা Í যেখানে জগতের আদিসত্তা (Ultimate Reality) বিষয়ক আলোচনা করা হয়। এই আদিসত্তা সম্পর্কে প্রশ্নের চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না এবং একটির পর একটি প্রশ্ন করতে থাকলে অনবস্থা দোষের (Infinite regress) সৃষ্টি হয়। সে কারণেই যাজ্ঞবল্ক্য একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে গার্গীকে আর প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩য় অধ্যায়ের ৮ম ব্রাহ্মণে পুনরায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরমব্রহ্ম তথা আদিসত্তা সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর দুটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, এই জগৎ সংসারের সবকিছুর অন্তরালেই রয়েছে এ অনাদি অক্ষর-পরব্রহ্ম Í যিনি ছায়াহীন, কর্মহীন, চক্ষুহীন, জিহ্বাহীন, মনহীন, পরিমাণহীন, অন্তহীন, শাশ্বত, ইন্দ্রিয় জগতের উর্ধ্বে ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট। নিম্নে আমরা ‘গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ (২) Í আকাশ ও আকাশের আধার অক্ষর’ সংলাপটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

Dhaka University Institutional Repository

> "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥১১॥

অর্থাৎ, হে গার্গি, এই অক্ষরকে দেখা যায় না কিন্তু তিনি দেখেন, তাঁহাকে শোনা যায় না কিন্তু তিনি শোনেন, তাঁহাকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি মনন করেন, তাঁহাকে জানা যায় না কিন্তু তিনি জানেন। ইনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে।

> সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহু মন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি ততো হ বাচক্নব্যুপররাম ॥১২॥

অর্থাৎ, গার্গী বললেন – 'শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, যদি ইঁহাকে নমস্কার করিয়াই ইঁহা হইতে নিষ্কৃতি পান তবে যথেষ্ট মনে করিবেন। ব্রহ্মবিচারে আপনারা কেহই ইঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।' তারপর বাচক্নবী (গার্গী) বিরত হইলেন।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩/৮/১১-১২[১৬]

উপর্যুক্ত দুটি সংলাপে আমরা লক্ষ করি যে, এ বিতর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বা গার্গী কেউই জয়ী বা পরাজিত হননি। দার্শনিকতত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা দুজনই সম-অভিজ্ঞ এবং সম-পারদর্শী।

মৈত্রেয়ী এবং গার্গী ছাড়াও অন্য একজন বর্ণগোত্র পরিচয়হীন 'কুমারী' নামে এক বিদুষী নারীর কথা জানা যায়। 'অগ্নিহোত্র' নামে প্রাত্যহিক একটি যজ্ঞ দুদিন কিংবা একদিনে সম্পাদন করা হবে? Í বিদ্বান পণ্ডিতদের মধ্যে এরূপ মতভেদ দেখা দিলে উক্ত কুমারী যজ্ঞটি দুদিনে সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন এবং এভাবেই তাঁদের বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।[১৭] এছাড়া বৈদিকযুগের ব্রহ্মচর্য পালনরত বহু নারীর কথা উল্লেখ রয়েছে।

একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকার নিশ্চিত করা একদিকে যেমন উন্নত সভ্যতার লক্ষণ, তেমনি সামাজিক সংহতি ও সামাজিক উন্নয়নে অপরিহার্য সত্য। প্রাচীন বৈদিকযুগে বৈদিকসাহিত্য রচয়িতাগণ এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করে সমাজে নারীর সুদৃঢ় অবস্থানের কথা গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং নারীদের যথাযথ স্থানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, বিশাল বৈদিকসাহিত্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক অধিকারের একটি ভারসাম্য অবস্থা বিরাজমান ছিল যা বৈদিকসমাজকে একটি উন্নতর সভ্যতায় উপনীত করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থা ও অবস্থান

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বৈদিকযুগ ছিল একটি পরিপূর্ণ উন্নত সভ্যতার যুগ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেই উন্নত সভ্যতার ভিত্তি ছিল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি ছিল কৃষি এবং গো-পালন। আর ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল অন্যতম বৃত্তি। বৈদিকযুগের জনগণ রথ, পথ, পোত, গৃহ, দুর্গ, ইত্যাদি নির্মাণ, স্বর্ণ, চর্ম, রজ্জু, লৌহ, সূচি, বয়ন শিল্প ও অস্ত্র শিল্প তৈরিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শুক্লযজুর্বেদের ত্রিশ অধ্যায়ে বৈদিকযুগের জনগণের প্রায় সত্তরটি পেশার উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই সত্তরটি পেশার মধ্যে নিম্নলিখিত পেশাগুলোতে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল: বস্ত্র ধৌতকরণ, ঝুড়ি নির্মাণ, সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি, কাজল প্রস্তুত, তরবারির কোষ নির্মাণ, পুতুল তৈরি, বস্ত্রাদি রঙিনকরণ, অলংকরণ ইত্যাদি।[১৮] বৈদিকযুগে ধন বণ্টনের সমতার কথা ঋগ্বেদের অন্তত একটি মন্ত্রে লক্ষ করা যায়। সেই মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করে বলা হয়েছে :

> যো অর্যো মর্তভোজনং পরাদদাতি দাশুষে।
> ইন্দ্রো অস্মভ্যং শিক্ষতু বি ভজা ভূরি তে বসু ভক্ষীয় তব রাধসঃ ॥
> ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১/৮১/৬[১৯]

অর্থাৎ, "যে পালনকারী ইন্দ্র যজমানকে মানুষের অন্ন প্রদান করেন তিনি আমাদের সেরূপ অন্ন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আমাদের ধন বিভাগ করে দাও কারণ তোমার অসংখ্য ধন, যাতে আমি তার একাংশ প্রাপ্ত হতে পারি।"

এই মন্ত্রে অন্তত একটি তাৎপর্য এই হতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদ সমভাবে বণ্টিত হবে এবং রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার থাকবে। তাই আমরা বৈদিকসাহিত্যে লক্ষ করি যে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত ছিল। নারীদের এই সম্পত্তির অধিকারকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

১। স্বামীর সম্পদের অধিকার;

২। স্ত্রীধন; এবং

৩। সম্পদের উত্তরাধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

ঋগ্বেদের বিবাহের মন্ত্রে পরিবারের সম্পত্তিতে স্বামীর মালিকানার পাশাপাশি স্ত্রীকেও সম্পত্তির সহ-মালিকানা (Co-woner) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিবাহের সময় স্বামী ঈশ্বরের নামে এরূপ শপথ করেন যে, অর্থনৈতিক বিষয়ে স্ত্রীর সকল অধিকার ও স্বার্থ বজায় রাখা হবে। কিন্তু বৈদিকযুগেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পদের যৌথ মালিকানার বিষয়টি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়—যার প্রমাণ আমরা পাই পাশাখেলাসহ বিভিন্ন ক্রীড়ার উদাহরণের মাধ্যমে।

প্রকৃতপক্ষে 'স্ত্রীধন' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। সাধারণ অর্থে স্ত্রীধন শব্দটি দ্বারা এমন সম্পদকে নির্দেশ করে যার উপর নারীদের একক অধিকার রয়েছে। তাই স্ত্রীধন বলতে সাধারণত অলংকার ও গহনা, রত্নমণি, হীরা-জহরত, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বোঝায়। এসব সম্পত্তি একান্তই নারীদের নিজস্ব সম্পদ বলে গণ্য হতো বিধায় এগুলোকে স্ত্রীধন বলা হয়। বৈদিকসাহিত্যে এসব অস্থায়ী সম্পদকে স্ত্রীর নিজস্ব বলেই ঘোষণা করা হয়েছে। এসব সম্পদ নারীরা বিবাহের সময় উপঢৌকন হিসেবে পিত্রালয় এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে পেতেন :

> সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
> অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে ॥
>
> ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০/৮৫/১৩[২০]

অর্থাৎ, "পতিগৃহে গমনকালে সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তা অগ্রে অগ্রে চলল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সে উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্জুনী, অর্থাৎ ফাল্গুণী নামক দু নক্ষত্রের উদয়কালে সে উপঢৌকন বয়ে নিয়ে যায়।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে একমাত্র বিবাহিতা নারীরাই স্ত্রীধনের মালিক। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। বৈদিকযুগে বিবাহিতা নারী এবং বিধবা নারী ব্যতীত একমাত্র অবিবাহিতা কন্যারাই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হতেন। ঋগ্বেদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে সে কথাই উল্লিখিত হয়েছে :

> অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানদা মদসস্তামিয়ে ভগমৎ।
> কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভর দদ্ধি ভাগং তন্বোযেন মামহঃ ॥
>
> ঋগ্বেদ-সংহিতা, ২/১৭/৭[২১]

অর্থাৎ, হে ইন্দ্র! পিতামাতার সঙ্গে আজীবন বসবাসকারী কুমারী কন্যাগণ যেরূপ পিতার সম্পত্তিতে অংশ পায়, আমিও তেমনি তোমার নিকট ধন প্রার্থনা করি। তুমি সকলের নিকট সেই ধন ও ধনের পরিমাণ প্রকাশ কর এবং তা সম্পাদন কর। তুমি আমার শরীরে ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর এবং তুমি সেই ধন দ্বারা স্তোতাগণকে সম্মানিত কর।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিকযুগের উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক আলোচনা থেকে সে সময়কার নারীদের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক অবস্থানের কথা জানা যায়। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবাধ ও স্বাধীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো একটি ঘটনা। স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার, স্ত্রীধন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং সর্বোপরি জীবিকা নির্বাহে বিভিন্ন পেশায় নারীর অংশগ্রহণ সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতারই পরিচয়জ্ঞাপক।

রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থান

বৈদিকযুগে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রচলন ছিল। রাজাই ছিল রাজ্যের কর্ণধার এবং সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার I যে কারণে বৈদিকযুগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথা জানা যায়। রাজার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং তিনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার প্রথা তথা বংশানুক্রমপ্রথা বিদ্যমান ছিল।

বৈদিকযুগের শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে 'মহিষী', 'বাবাতা', 'পরিবৃক্তা', 'পালাগলী' প্রভৃতি রানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব গ্রন্থে রানিদের পারিবারিক পদমর্যাদার কথা জানা যায়। 'মহিষী' পদমর্যাদায় ভূষিতা হতেন প্রধান রানি। 'বাবাতা' ছিলেন প্রিয়তমা রানি। সন্তানহীনা রানি 'পরিবৃক্তা' এবং নিম্নবর্ণের রানিকে 'পালাগলী' নামে অভিহিত করা হতো। এথেকে বোঝা যায় যে, রাজন্যবর্গের মধ্যেও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল এবং এই চার শ্রেণির রানিদের মধ্যে শুধুমাত্র 'মহিষীরাই' সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করতেন।[২২]

বৈদিকযুগ এবং বৈদিকযুগের শেষ পর্যায়ে রাজাদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজাকে ঐশ্বরিক প্রতিনিধি (Divine representative) হিসেবে গণ্য করা হতো। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও সামরিক শিক্ষাদানের প্রচলন ছিল। নারীরা যে শুধু সাধারণ সৈন্য ছিলেন তা নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা অপূর্ব রণকৌশল এবং বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করতেন। এছাড়াও যুদ্ধাহত সৈন্যদের সেবা এবং যুদ্ধাহত সৈন্যদের চিকিৎসায় তারা অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন। আমরা নিম্নে এরূপ দুই একটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করছি। ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখা যায় যে, বিখ্যাত রাজ-রাজাদের স্ত্রীরাও সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, রাজা খেলের রানি বিশ্পলার সাহসীপূর্ণ যুদ্ধ নারীসমাজের এক অত্যুজ্জ্বল স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে আজও গর্বভরে উল্লেখ করা হয় :

> চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্।
> সদ্যো জংঘামায়সীং বিশ্পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্ ॥
>
> ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১/১১৬/১৫[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, "খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলার একটি পা, পক্ষীর একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হয়েছিল, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রি যোগে সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং শত্রু ন্যস্ত ধন লাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলে।"

অপর এক নারী মুদ্‌গলের স্ত্রী মুদ্‌গলানী নির্ভীক চিত্তে এবং ভীতা না হয়ে রণকৌশলের এক অপূর্ব ও অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন :

উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্‌।
রথীরভূন্মুদ্গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা॥
ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০/১০২/২[২৪]

অর্থাৎ, "মুদ্গালের পত্নী যখন রথারূঢ়া হয়ে সহস্রজয়িনী হলেন তখন বায়ু তাঁর বস্ত্র সঞ্চালিত করল, গাভীজয়ের সময় মুদ্গালপত্নী রথী হলেন। ইন্দ্রসেনা নাম্নী সে মুদ্গালানী যুদ্ধের সময় গাভীগণকে শত্রু সৈন্য হতে বার করে আনলেন।"

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, বৈদিকযুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল। আমরা লক্ষ করেছি যে, বৈদিকযুগে নারীরা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন স্বাধীনতা ভোগ করতেন তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ভোগ করতেন। নারীদের সাংবিধানিক অধিকার পাওয়ার বিষয়টি নানা দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন দেশে ও কালে এ নিয়ে নারীদের প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে। নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাহত সৈন্যদের চিকিৎসা সে যুগের নারীদের বিশেষ শিক্ষার অধিকারের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আমরা বলতে পারি, বৈদিকযুগে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান উন্নত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা ও অবস্থান

বৈদিকধর্ম একেশ্বরবাদী, জীবনঘনিষ্ঠ ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী। বৈদিক ধর্মবেত্তাগণ জীবন ও দর্শনের মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই তাঁদের ধর্মচিন্তায় বারবার ব্যবহারিক জীবনের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই ব্যবহারিক জীবনকে ফলপ্রসূ করার জন্য তাঁরা একটি পরম সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা প্রকৃতির প্রতিটি বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্যের পেছনে একটি করে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিলেও চূড়ান্ত পরিণামে সবকিছুই যে সেই এক এবং অদ্বিতীয় শক্তির ফলপ্রকাশ তার প্রমাণ ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিকধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেই যুগে গৃহপালিত পশু, ঐশ্বর্য, বীরপুত্র, দীর্ঘজীবন, শষ্যাদি ইত্যাকার বিষয়গুলোর জন্য বিভিন্ন ঋষি মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতার নিকট প্রার্থনা করতেন। তাঁরা দেবতার স্তুতি করে যজ্ঞে আহুতি দিতেন এবং তার পরিবর্তে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সম্পদরূপে দেবতাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। এরূপ প্রার্থনায় কোনো কোনো সময় নারী ও পুরুষ একই সঙ্গে যজ্ঞকার্য সম্পাদন করতেন। তাই আমরা লক্ষ করি, বৈদিকযুগে নারীরা গৃহকার্যের পাশাপাশি অপার্থিব বিষয় তথা ধর্মীয় কাজেও অংশগ্রহণ করতেন। নারী ও পুরুষের একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের কথা ঋগ্বেদ-সংহিতার নিম্ন মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে :

অর্চদ্বৃষা বৃষভিঃ স্বেদুহব্যৈর্মৃগো নাশ্নো অতি যজ্জুগুর্যাৎ।
প্র মন্দযুর্মনাং গূর্ত হোতা ভরতে মর্যো মিথুনা যজত্রঃ ॥
ঋগ্বেদ-সংহিতা ১/১৭৩/২[২৫]

অর্থাৎ, ''হব্যপ্রদায়ী যজমান হব্যপ্রদায়ী অধ্বর্যু প্রভৃতির সাথে ইন্দ্রকে স্বপ্রদত্ত হব্যদ্বারা অর্চনা করেন, ইন্দ্র তৃষিত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবেন। হে উগ্র ইন্দ্র! মর্ত্য হোতা, স্তোত্রাভিলাষী দেবতাগণকে স্তব করে স্ত্রীপুরুষে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করছেন।"

আরো লক্ষণীয় যে, প্রতিটি প্রধান যজ্ঞে 'পত্নীসংবাদ' নামে একটি যাগ সম্পাদন করা হতো। এই যজ্ঞে একদিকে আমরা যেমন যজমান-পত্নীর অংশগ্রহণের কথা জানতে পারি, তেমনি তার স্ত্রী কর্তৃক বেদের কিছু মন্ত্রাংশ পাঠের কথাও জানতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার **১**ম মণ্ডলের **১৩১**নং সূক্তের ৩ নং মন্ত্রাংশ উল্লেখ করতে পারি :

"বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিসৃজঃ।[২৬]

অর্থাৎ, ''হে ইন্দ্র! তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণে হব্যদান করতঃ তোমার উদ্দেশে বহুসংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করছে।"

শুধু স্বামী-স্ত্রীর যৌথভাবে যাগ-যজ্ঞে অংশগ্রহণই নয়, সেই যুগে নারীরা এককভাবেও যাগ-যজ্ঞ করার অধিকারিণী ছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতা থেকে জানা যায় যে, পুরুকুৎস বন্দি হলে তাঁর স্ত্রী যজ্ঞ কর্ম সম্পাদন করেন :

অস্মাকমত্র পিতরস্ত আসন্তসপ্ত ঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানে।
ত আয়জন্ত ত্রসদস্যুমস্যা ইন্দ্রনং ন বৃত্রতুরমর্ধদেবম্ ॥

Dhaka University Institutional Repository

পুরুকুৎসানী হি বামদাশদ্ধব্যেভিরিন্দ্রাবরুণা নমোভিঃ।
অথা রাজানং ত্রসদস্যুমস্যা বৃত্রহণং দদথুরর্ধদেবম্ ॥
ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৪/৪২/৮-৯[২৭]

অর্থাৎ, "দুর্গহের পুত্র বন্দী হলে পর সপ্ত ঋষিগণ এ দেশে পিতা হয়েছিলেন। তাঁরা এ পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে যজ্ঞ করে লাভ করেছিলেন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিনাশক এবং অর্ধদেব। হে ইন্দ্র ও বরুণ! পুরুকুৎসপত্নী তোমাদের হব্য ও স্তুতি দ্বারা প্রীত করেছিলেন। অনন্তর তোমরা তাঁকে শত্রুনাশক অর্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করেছিলেন।"

এছাড়া ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে, শতপথ ব্রাহ্মণে সুস্পষ্টভাবে নারীর যজ্ঞের অধিকারের কথা বিধৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বৈদিকযুগে নারীরা নিজেদেরকে দেবী হিসেবেও কল্পনা করেছেন। যেমন, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৫১ নং সূক্তে জনৈক শ্রদ্ধা নামক ঋষি নিজেকে দেবী হিসেবে কল্পনা করেছেন।[২৮]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, বৈদিকযুগের নারীরা পুরুষের মতোই সকল প্রকার ধর্মীয় অধিকার ভোগ করতেন। বৈদিক শিক্ষা, মন্ত্র রচনা, মন্ত্র পাঠ, যাগযজ্ঞ এবং সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পূর্ণ অধিকার ছিল।

সে সময় নারীরা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিলেন না; উপরন্তু ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি এবং সহযোগিতা ছিল অপরিহার্য। এ বিষয়টি নারীদের ধর্মীয় অবস্থানের ক্ষেত্রে অবশ্যই মর্যাদা বৃদ্ধির একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ কখনোই আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ নয়। শুধু তাই নয়, বৈদিকসাহিত্যে একথাও উল্লেখ আছে যে, অবিবাহিতদের যাগ-যজ্ঞ দেবতারা গ্রহণ করেন না এবং স্বামী একাকী স্বর্গলাভও করতে পারেন না। তাই দেখা যায়, আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের জন্য পুত্র ছিল অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। নারীদের উপর্যুক্ত অবস্থা ও অবস্থান তাঁদের সু-উচ্চ ধর্মীয় মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধান করে।

সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অবস্থান

মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি উন্নত সভ্যতায় মানবজীবনে সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই সংস্কৃতিই তার কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় এবং বাহক। সংস্কৃতি বলতে আমরা এখানে বিভিন্ন প্রকার সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, অভিনয়, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ

ইত্যাদি বিষয় বুঝব। বৈদিকযুগে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে আরো বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র যেমন, বীণা, বাণ, ককরি, দুন্দুভি, বংশী, শততন্ত্রী ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। এছাড়া খেলাধুলার মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন, অশ্বদৌড় প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, রথচালনা প্রতিযোগিতা, পাশাখেলা ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

বৈদিকযুগের নারীরা এসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। বৈদিকসাহিত্যে বহুস্থানে এবং বহুভাবে বলা হয়েছে 'নৃত্যং গীতং স্ত্রীণাং কর্ম', অর্থাৎ, নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন নারীদেরই কাজ।

অভিনয় প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে পুরুরবা ও উর্বশীর কথোপকথন সম্বলিত সংবাদ সূক্তটিকে সকলেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসাযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা উদাহরণ হিসেবে নিম্নে দু-একটি মন্ত্রের উল্লেখ করছি :

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্‌পরতরে চনাহন্‌ ॥
কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং প্রাক্রমিষমুষসামগ্রিয়ের।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি ॥
ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০/৯৫/১-২[২৯]

অর্থাৎ, "[পুরূরবার উক্তি] হে পত্নি! তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলে যেও না, আমাদের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হচ্ছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করে না বলা হয়, ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হবে না। [উর্বশীর উক্তি] তোমার সাথে বাক্যালাপ করে আমার কি হবে? আমি প্রথম ঊষার ন্যায় চলে এসেছি। হে পুরূরবা, আপন গৃহে ফিরে যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করতে পারবে না।"

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সংস্কৃতি হচ্ছে উন্নত সমাজ ও সভ্যতার ধারক এবং বাহক। বৈদিকযুগে সংস্কৃতির লালন-পালন এবং পরিচর্যায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী ও পুরুষের সমন্বয়েই উন্নত সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। বৈদিকযুগ নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বহন করে। তাই আমরা বলতে পারি, বৈদিকযুগে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান বেশ উন্নত পর্যায়েই ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিশ্বসংসার নর এবং নারীIএ দুয়ের সম্মিলনে গঠিত। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে এই ধারা অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। নর-নারীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বৈদিকসাহিত্যে বলা হয়েছে যে, আদিতে পরমপুরুষ 'এক' ছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট বিশ্বমণ্ডলে নিজ ইচ্ছা ও মহিমা প্রতিফলনের জন্য নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে পুরুষ এবং নারীর সৃষ্টি করলেন। এই পুরুষ-প্রকৃতিই আদি পতি ও পত্নী। তাই বলা যায় পুরুষ ও নারী একই পরমসত্তার দুইরূপIএকে অন্যের সম্পূরক ও পরিপূরক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এ বিষয়টি সুউচ্চ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥
>
> ১/৪/৩[৩০]

অর্থাৎ, "(কিন্তু) তিনি আনন্দ পাইলেন না; সেইজন্য কেহ একা থাকিয়া আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় (সঙ্গী লাভ করিতে) চাহিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ আলিঙ্গিত হইলে যে পরিমাণ হয়, তিনি ততখানিই ছিলেন। তিনি নিজের দেহকে দুইভাগে ভাগ করিলেন। এইভাবে পতি ও পত্নী হইল। এই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন – 'প্রত্যেকে নিজে অর্ধ বিদলের মত'; এইজন্য এই শূন্য স্থান স্ত্রী দ্বারা পূর্ণ হয়। তিনি সেই পত্নীতে মিথুনভাবে উপগত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে মানুষের উৎপত্তি হইল।"

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ কথাই বলতে পারি যে, বৈদিকযুগের নারীরা পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিকসহ জীবন ও জীবনাচরণের নানাস্তরে পুরুষদের প্রায় সম-অধিকার ভোগ করতেন। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বৈদিকসাত্যিের বিভিন্ন স্থানে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে নানারকম বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একটি অনিবার্য বাস্তবচিত্র। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই সেগুলো আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি। শুধু বৈদিকযুগে কেন, বৈদিক পরবর্তীযুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমাজে নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে বলে বিদ্বৎজনও মনে করেন না।

বৈদিকযুগের নিম্নবর্গের অনেক নারীদের এরূপ বুদ্ধিমত্তার প্রশস্তি অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও করেছেন—যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মরিস ভিন্টারনিৎস (Maurice Winternitz)। তিনি তাঁর

বিখ্যাত *A History of Indian Literature* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বৈদিকসাহিত্যের উপনিষদে উল্লিখিত এরূপ নিম্নবর্গের নারীদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন :

> In the Upanisads, however, we find not only kings but also women and even people of low birth who take active part in the philosophical efforts and are often in possession of the highest knowledge.[৩১]

বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন তাঁর *প্রাচীন ভারতে নারী* গ্রন্থে বৈদিকযুগে সমাজে নারীদের সম্মান ও গৌরবজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে 'নারীদের স্থান' শিরোনামে বৈদিকযুগের নারীদের সম্পর্কে বলেছেন :

> ঋগ্বেদ প্রভৃতির সময়ে, অর্থাৎ প্রাচীনতর বৈদিকযুগে, আর্যদের মধ্যে নারীদের বেশ একটি গৌরব ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সামাজিক হিসাবে নারী স্বামীর দ্বারা চালিত হইলেও পরিবারের মধ্যে, যাগযজ্ঞে, উৎসবাদিতে নারীর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল।[৩২]

বৈদিকযুগে নারীর অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বৈদিকসাহিত্য থেকে যে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি, তা থেকে এ বিষয়টি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, বৈদিকসমাজব্যবস্থায় নারী শুধু স্ত্রী, জননী, কন্যাই নয়, সমাজের বিভিন্নস্তরে যেমন, শিক্ষা, ললিতকলা, সামরিক কলাকৌশল, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। আমরা অবশ্য প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, তৎকালীন সমাজে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করে যে-সমস্ত ঘটনা বা কাহিনি রয়েছে তা সযত্নে পরিহার করেছি। বৈদিকসমাজের প্রথম যুগে নারীদের অবস্থান উচ্চাসনেই ছিল। আর্যজাতি কালক্রমে বিভিন্ন দেশ জয় করার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যত অগ্রসর হয়েছে, সমাজে নারীসহ সকলের বিশেষ করে নারীদের মান-মর্যাদা অধোগতি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায় :

> বৈদিকযুগের শেষ দিকে অনেক বৈদেশিক আক্রমণ হয় তার ফলে নারীহরণের ও বর্ণসংকরের আশঙ্কায় নারীকে অন্তঃপুরে ঠেলে দেওয়া হয় ও তখন থেকে নারী অনেক বেশি অসূর্যস্পশ্যা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে যখন যেখানে কোনো বিপত্তি দেখা দিয়েছে তার দামটা দিতে হয়েছে শূদ্র ও নারীকে।[৩৩]

৩.২ বিশাল বৈদিকসাহিত্যের পারমার্থিক চেতনার স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান কঠোর যাগ-যজ্ঞীয় বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই যজ্ঞীয় পারমার্থিক চেতনা এবং উপনিষদের পরম অধ্যাত্মচেতনার বাহ্যিক মানবীয় বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ও লোকায়ত ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ-প্রধান কাহিনিকে কেন্দ্র করে যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস—তারই সার্থক পরিণতি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

Dhaka University Institutional Repository

মহাকাব্য রামায়ণ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস বিরচিত মহাকাব্য মহাভারত। বৈদিক যাগ-যজ্ঞীয়ধারা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সাহিত্য কর্মধারায় এই দুটি মহাকাব্য ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। রচনাশৈলী, কাহিনি বিন্যাস, ভাব ও ভাষা, অলংকার, উপমা, রূপকের এক অপূর্ব সমন্বয়ে সৃষ্টি এই দুটি মহাকাব্য—যা ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আনুমানিক খ্রি.পূ. ৩য় শতক থেকে শুরু করে খ্রিষ্টীয় ২য়–৩য় শতক পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনি বর্তমান রূপ ধারণ করে।

এ সময় ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বৈদিকযুগ থেকে আরো একটু উন্নতরূপ ধারণ করেছে। সুদৃশ্য নগর ও শহরের পত্তন হয়েছে (যেমন, পাটলিপুত্র নগর), শিক্ষাদীক্ষা, লিপি ও গণিতশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে তন্ত্র-মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। লিপি আবিষ্কারের ফলে বংশ পরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে চলে আসা গাথা, কবিতা, পুরাণ লেখ্যরূপে আর্বিভূত হয়—যার প্রমাণ রামায়ণ ও মহাভারত।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে রামায়ণ ‘আদি মহাকাব্য’ হিসেবে সুপরিচিত। রামায়ণকে শুধু ভারতবর্ষের মহাকাব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। পৃথিবীর ‘আদি মহাকাব্য’ হিসেবেও গণ্য করা হয়। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে রামায়ণ শব্দের অর্থ ‘রাম-অয়ন’ অর্থাৎ রামচরিত তথা রাম সম্পর্কিত কাহিনি। প্রাচীন ভারতের সূর্যবংশের রাজন্যবর্গের কাহিনি অবলম্বন করে মহর্ষি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় এই কালজয়ী ভুবন বিখ্যাত মহাকাব্য রচনা করেন। এই মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য পুরুষচরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে : দশরথ, রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র, বালী, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ প্রমুখ এবং উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে : কৌসল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, সীতা, মন্থরা, তারা, নিকষা, মন্দোদরী, সরমা, শূর্পণখা, ত্রিজটা, অহল্যা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি চরিত্র একেকটি অনন্য চরিত্র। এই মহাকাব্যে একদিকে যেমন পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, তেমনি পাওয়া যায় পিতৃসত্য পালনে সন্তানের একনিষ্ঠতা ও সততা, প্রজাপালনে রাজার ঐকান্তিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে নিরপেক্ষতা, পতিপরায়ণতার বিরল ও অনুপম দৃষ্টান্ত, ভ্রাতৃভক্তির উজ্জ্বলতম উদাহরণ এবং সর্বোপরি স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এসব কারণে রামায়ণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃত। আর রামায়ণের চরিত্রগুলো অপরূপ সৌন্দর্যমাধুর্যে শাশ্বত ও চিরন্তন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাজজীবনে রামায়ণের প্রভাব তাই চিরকালীন।

Dhaka University Institutional Repository

অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের জীবন কাহিনি রামায়ণের প্রধান উপজীব্য বিষয়। এতে আছে সাতটি কাণ্ড : আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড। প্রতিটি কাণ্ড আবার কয়েকটি সর্গে বিভক্ত। চব্বিশ হাজার শ্লোকসমৃদ্ধ গ্রন্থটি অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত।

রামায়ণের আদিকাণ্ডে আছে রামের জন্ম, বাল্যজীবন কাহিনি ও বিবাহ। অযোধ্যাকাণ্ডে রয়েছে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন এবং পিতৃসত্য পালনে রামের বনবাস গমন। অরণ্যকাণ্ডে রয়েছে রাম-লক্ষণ-সীতার বনবাস জীবনযাপন এবং লঙ্কারাজ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে রয়েছে বানর অধিপতি সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বন্ধুত্বতা এবং সুগ্রীব-ভ্রাতা বালিকে বধের মাধ্যমে সুগ্রীবের সিংহাসনে আরোহণ। সুন্দরকাণ্ডে রামের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত বানর সেনাপতি হনুমানের লঙ্কা গমন এবং সীতার অবস্থান নিশ্চিতকরণ। যুদ্ধকাণ্ডে রয়েছে রাম-রাবণের যুদ্ধ, যুদ্ধে রাবণের পরাজয় ও সবংশে মৃত্যুবরণ, রামের সীতা উদ্ধার, বিভীষণের সিংহাসন আরোহণ এবং রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন। উত্তরকাণ্ডে রয়েছে প্রজা মনোরঞ্জনে রাম কর্তৃক সীতাকে বনবাসে প্রেরণ, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশের জন্ম, রাম-সীতার পুনর্মিলন, সীতার পাতাল প্রবেশ এবং রামচন্দ্রের বিষ্ণুরূপে স্বর্গে গমন।[৩৪]

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতও ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও অনুমান-প্রমাণে বলা চলে যে, এই মহাকাব্যটি খ্রি.পূ. ২য় থেকে খ্রিষ্টীয় ২য় শতকের মধ্যে রচিত হয়। পরবর্তীকালে নানা সংযোজন-বিয়োজনের ফলে এর শ্লোক সংখ্যা হয় প্রায় ১ লক্ষ। ভারতবর্ষীয় প্রায় সব ভাষায় মহাকাব্যটি অনূদিত হলেও বাংলাভাষায় রচয়িতাগণ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, রচনাশৈলী এবং জীবনবোধ থেকে মহাকাব্যটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্‌যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব, আশ্বমেধিকপর্ব, আশ্রমবাসিকপর্ব, মৌসলপর্ব, মহাপ্রস্থানিকপর্ব ও স্বর্গারোহণপর্বIএই আঠারটি পর্ব নিয়ে রচিত মহাভারত। প্রতিটি পর্ব আবার একাধিক অধ্যায়ে বিভক্ত। আদিপর্বে রয়েছে কৌরব ও পাণ্ডব বংশের বিবরণ, তাদের শিক্ষা এবং পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ; সভাপর্বে রয়েছে হস্তিনাপুরের রাজসভায় যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়া ও সেই ক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়বরণ ও বনবাস; বনপর্বে রয়েছে পাণ্ডবদের বনবাস জীবনের ঘটনাবলি; বিরাটপর্বে রয়েছে বিরাট রাজার রাজপুরীতে ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস; উদ্‌যোগপর্বে রয়েছে কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ প্রস্তুতি; ভীষ্মপর্বের প্রারম্ভে গীতা এবং পরবর্তীতে দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও সৌপ্তিক পর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত কৌরব এবং পাণ্ডবদের যুদ্ধের বিবরণ ও তাদের জয়-পরাজয়; স্ত্রীপর্বে যুদ্ধে নিহত স্বামীদের জন্য বিলাপ; শান্তিপর্ব এবং অনুশাসনপর্বে রাজধর্ম; আশ্বমেধিকপর্বে রয়েছে যুধিষ্ঠির কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান; আশ্রমবাসিকপর্বে রয়েছে ধৃতরাষ্ট্রসহ অন্যান্যদের আশ্রমবাস; মৌসলপর্বে রয়েছে যদুবংশের পরস্পরের মধ্যে হানাহানি এবং ধ্বংস, মহাপ্রস্থানিকপর্বে রয়েছে পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থান এবং স্বর্গারোহণপর্বে রয়েছে যুধিষ্ঠিরের সর্গে গমন, মৃত ভ্রাতাদের সন্ধানে নরকে গমন ও পরলোকগত অর্জুনসহ অন্যান্য আত্মীয়গণের সঙ্গে মিলন।

মহাভারতের উপর্যুক্ত আঠারটি পর্বে মহাকাব্যের কবি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব দর্শনের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ফলে মহাভারত মহাকাব্য, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে ভারতবর্ষে এক বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডাররূপে আর্বিভূত হয়েছে। তৎকালীন সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চিত্র যেমন এই মহাকাব্যে বিধৃত হয়েছে, তেমনি গার্হস্থ্যবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদির চিত্রও ফুটে উঠেছে। তাই পণ্ডিতগণ এটিকে 'পঞ্চমবেদ' বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ মহাভারত হচ্ছে সর্ববিধ আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-চেতনা এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আকরগ্রন্থ। মহাভারতের মূলবক্তব্য হচ্ছে 'ধর্ম যেখানে, জয় সেখানে'। অধোপথগামী মানুষ আপাতদৃষ্টিতে জয়লাভ করলেও পরিণতিতে ধর্মেরই জয় হয়ে থাকেIএই মহান সত্যকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্‌যোগপর্বসহ বিভিন্ন পর্বে তাই বার বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে : '... যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' (মহাভারতম্, উদ্‌যোগপর্ব্ব, ৩৯/৯)[৩৫]

মহাভারতের উল্লেখযোগ্য পুরুষচরিত্রগুলো হলো : শান্তনু, দেবব্রত (ভীষ্ম), শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাসদেব), চিত্রাঙ্গদ, বিচিত্রবীর্য, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, কর্ণ (বসুষেণ), যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, পরীক্ষিত, জনমেজয়, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, শকুনি, জয়দ্রথ, শল্য, যজ্ঞসেন (দ্রুপদরাজা), ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি (যুযুধান), কৃতবর্মা ইত্যাদি এবং উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রগুলো হলো : গঙ্গা, সত্যবতী, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, গান্ধারী, পৃথা (কুন্তী), মাদ্রী, দেবিকা, কৃষ্ণা (দ্রৌপদী), সুভদ্রা, উত্তরা, সুদেষ্ণা, উলূপী, সত্যভামা, শর্মিষ্ঠা, হিড়িম্বা, উর্বশী, মেনকা, শকুন্তলা, রম্ভা ইত্যাদি।

মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পার্থিব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি ধর্ম-অধর্ম ও পাপ-পুণ্য এবং দার্শনিকতত্ত্বও ব্যক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের এক অপূর্ব সৃষ্টি। যুগে যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুধীমণ্ডলী এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।[৩৬]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য এবং এই দুটি মহাকাব্যেই একদিকে যেমন রাজধর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রায় সকল দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি এই দুটি গ্রন্থের নির্দেশিত শিক্ষা অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার উপদেশও দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে নারীবাদী লেখিকা পূরবী বসু তাঁর *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*[৩৭] গ্রন্থে রামায়ণের নারীচরিত্রকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন :

রামায়ণের বহুল-আলোচিত নারী (মানবী)

সীতা
কৌশল্যা
কৈকেয়ী
সুমিত্রা
মন্থরা
অনুসূয়া
অহল্যা

রামায়ণের স্বল্প-আলোচিত নারী (মানবী)

মাণ্ডবী
শ্রুতকীর্তি
শবরী
ঊর্মিলা
স্বয়ম্প্রভা
শৈব্যা
ইন্দুমতী

রামায়ণের নারীচরিত্র (বানর)

তারা (২) বালীর স্ত্রী; আবার সুগ্রীবেরও স্ত্রী
রুমা

রামায়ণের গুরুত্বপূর্ণ রাক্ষসী নারী

মন্দোদরী

Dhaka University Institutional Repository

শূর্পণখা
ত্রিজাতা
সরমা
হিড়িম্বা
নিকষা
প্রমীলা (১) লঙ্কার রাজা রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদের বীরযোদ্ধা স্ত্রী প্রমীলা।

রামায়ণের স্বল্প-আলোচিত রাক্ষসী নারী

বজ্রজ্বালা
ধান্যমালিনী
কুম্ভিনসী
অয়োমুখী
তাড়কা
জরা
সিংহিকা

আমাদের অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আমরা শুধু রামায়ণের বহুল আলোচিত কয়েকটি মুখ্য নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

রামায়ণের নারীচরিত্রের উপর্যুক্ত শ্রেণি বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা রামায়ণের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্রগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানবী চরিত্র ছাড়াও আমরা কতিপয় রাক্ষস ও বানর নারীচরিত্রের আলোচনা করব।

কৌসল্যা (কৌশল্যা) : মহাকাব্য রামায়ণের মানবী চরিত্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্র কৌসল্যা। তিনি কোশলের রাজকন্যা, অযোধ্যারাজ দশরথের স্ত্রী এবং শ্রীরামচন্দ্রের মাতা। দশরথের তিনজন স্ত্রীর মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধানা। তিনি সারাজীবন উদ্বিগ্নতা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা, তিনি রামের মতো সর্বগুণে গুণান্বিত এক আদর্শ পুত্রের গর্ভধারিণী। তিনি পতিব্রতা রমণী। ধর্মে তাঁর অচলা ভক্তি, তিনি অনন্যা সাধারণ এবং উদারতায় সমুজ্জ্বল। বাল্মীকি তাঁর চরিত্র রূপায়ণ করেছেন এভাবে :

সানুক্রোশাং বদান্যাঞ্চ ধর্মজ্ঞাঞ্চ যশস্বিনীম্।
কৌসল্যাং শরণং যামঃ সা হি নোঽস্তি ধ্রুবা গতিঃ॥
অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৮/১৫[৩৮]

অর্থাৎ, আমরা এখন দয়াবতী, যশস্বিনী, বদান্যা, ধর্মমতী কৌসল্যার আশ্রয় গ্রহণ করব। কেননা তিনিই হলেন আমাদের নিশ্চিত আশ্রয়স্থল।

Dhaka University Institutional Repository

যাগ-যজ্ঞ পালনের ক্ষেত্রে আমরা কৌসল্যাকে ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখি। যেমন, আদিকাণ্ডের ১৪ সর্গে রাজা দশরথ কর্তৃক আয়োজিত 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের সর্বোত্তম অশ্বটিকে কৌসল্যা তিনবার প্রহার করে ছেদন করেন। তাঁর এই যজ্ঞে পশু হত্যায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নারীর যজ্ঞে অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

প্রধানা মহিষী হিসেবে কৌসল্যা রাজার প্রিয়পাত্রী; কিন্তু তরুণী স্ত্রী কৈকেয়ীর কারণে তিনি তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান ও সমাদর করতে পারেননি। এ কারণে রাজার যেমন দুঃখ ছিল, তেমনি কৌসল্যারও দুঃখ ছিল। একজন আদর্শ গৃহিণী হিসেবে, পতির সেবাযত্নে, পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল কামনায় তিনি ছিলেন অনন্যা। রাজা দশরথ কৌসল্যার এসব গুণের প্রশংসা করে বলেন :

> ... যদা যদা চ কৌসল্যা দাসীব চ সখীব চ ॥
> ভার্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
> সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা ॥
> অযোধ্যাকাণ্ড, ১২/৬৮-৬৯[৩৯]

অর্থাৎ, প্রয়োজন অনুসারেই কৌসল্যা দাসী, সখী, পত্নী, ভগ্নী এবং মায়ের মতো আচরণ করত। শুধু তাই নয়, সে সর্বদা আমার মঙ্গল কামনা করে। সে আমার প্রিয় পুত্রের মাতা এবং প্রিয়ভাষিণী।

সমাজ-সংসারে কৌসল্যা নানান দিক থেকে বঞ্চিতা। তিনি প্রধানা মহিষী; কিন্তু রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যেমন, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় রাজা দশরথ তাঁর সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ করারই প্রয়োজনবোধ করেননি। শুধু তাই নয়, রাজা তাঁকে পুত্রস্নেহ থেকেও বঞ্চিত করেছেন। তাই আমরা কৌসল্যার মুখে শুনি যে, 'স্ত্রীলোকের পতি হচ্ছে প্রথম গতি, পুত্র দ্বিতীয় গতি এবং জ্ঞাতিগণ তৃতীয় গতি। তাদের কোনো চতুর্থ গতি নেই।' তাই কৌসল্যা দুঃখে স্বামীকে বলছেন যে, 'কৈকেয়ীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হওয়ার কারণে তিনি তাঁর স্নেহ-প্রেম থেকে বঞ্চিতা, রামকে বনবাসে পাঠানোর কারণে তিনি স্বামীকে ফেলে রামের সঙ্গে বনবাসেও যেতে পারবেন না। এ পরিস্থিতিতে তিনি সব দিক থেকেই ব্যর্থ :

> গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
> তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥
> তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বনমাহিতঃ।
> ন বনং গন্তুমিচ্ছামি সর্বথা হা হতা ত্বয়া ॥
> অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১/২৪-২৫[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

কৈকেয়ী-পুত্র ভরতের মুখ থেকে জানা যায় যে, তাঁর মাতা কৌসল্যার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেও কৌসল্যা কখনো তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার বা আচরণ প্রদর্শন করেননি। বরং তিনি সকল দুঃখ গোপন রেখে কৈকেয়ীকে স্নেহই করতেন এবং আপন ভগ্নীর মতোই আচরণ করতেন। এথেকে আমরা কৌসল্যার মহৎ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই।

কৌসল্যার জীবনাচরণ সম্পর্কে সুখময় ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি :

> দেবীর ন্যায় সৌম্যমূর্তি ধর্মাচরণরতা কৌসল্যা জীবনে বেশী দিন শান্তি পান নাই। তিনি শুধু রামের মত গুণবান্ পুত্রের জননী হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা। তিনি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির হইলেও অসহ্য দুঃখে তাঁহার নিজ মুখেই জীবনের অশান্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন।[৪১]

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা শুধু রাজা দশরথের প্রধান মহিষী কৌসল্যার প্রাসঙ্গিক কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। এথেকেই আমরা তাঁর চরিত্রের উদারতা, মহানুভবতা ও স্নেহবাৎসল্যের কথা জানতে পারি। কিন্তু একটি রাজ্যের প্রধান মহিষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজকার্যের সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিতা। শুধু তাই নয়, রাজা কখনো তাঁর সঙ্গে সামান্যতম পরামর্শ গ্রহণেরও প্রয়োজনবোধ করেননি। এথেকেই বোঝা যায় যে, রামায়ণের শাসনব্যবস্থায় রাজ-মহিষীদের তথা নারীদের কোনো ভূমিকা ছিল না বিধায় প্রজাদের সঙ্গে রাজ-মহিষীর কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগও ছিল না। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রজাদের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে রাজ-মহিষীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হতো। রাজকার্যে রাজ-মহিষীর কোনো ভূমিকা না থাকলেও পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে রাজ-মহিষীদের মর্যাদা ছিল। পারিবারিকভাবে স্ত্রীদের মর্যাদার ক্রমবিন্যাস স্তর ছিল। রাজা দশরথও এর ব্যতিক্রম করেননি। যেমন, সুন্দরী যুবতী হওয়ার কারণে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। আবার কৌসল্যার আচার-আচরণে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেনl যে কারণে আমরা রাজাকে বলতে শুনি 'তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ও যোগ্যা পত্নী'। আর সুমিত্রা একজন সাধারণ নারীর মতোই জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে পারিবারিকভাবে শুধু সাধারণ অধিকারই ভোগ করতেন। এরই পাশাপাশি আমরা লক্ষ করি যে, কৌসল্যা একজন আদর্শ মাতা, নির্ভরযোগ্যা স্ত্রী ও রাজমহিষী। পরিবারের যেকোনো সদস্যের সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মাতার মতো নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। তৎকালীন সমাজে নারীর এই অবস্থান আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কৈকেয়ী : রামায়ণের নারীচরিত্রের মধ্যে কৈকেয়ী আরেকটি উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র। তিনি কেকয় দেশের রাজকন্যা, অযোধ্যারাজ দশরথের দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং ভরত-জননী। রামায়ণে তাঁকে অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

নেতিবাচক চরিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। যৌবনোদ্ভিন্না এবং সুন্দরী হওয়ার কারণে কৈকেয়ী রাজা দশরথের সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী। তিনি সৌভাগ্যমদে গর্বিতা, নিজ বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আস্থাবতী, পার্থিব সম্পদের প্রতি প্রলুব্ধা, নিষ্ঠুরা প্রকৃতির, নিজ বিশ্বাসে কঠোর, নিজ সংকল্পে অটল, নির্লজ্জ, ধৃষ্ট, ক্রুর, স্পর্দ্ধিতা ইত্যাদি নেতিবাচক গুণের এক মূর্তিমান নারী।

রাজা দশরথের সঙ্গে কৈকেয়ীর শর্তসাপেক্ষে বিয়ে হয়। কৈকেয়ীকে বিয়ে করার সময় রাজা দশরথ তাঁর পিতার নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন যে, কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকেই তিনি রাজ্য প্রদান করবেন। এছাড়া আরো জানা যায় যে, দেবাসুরের যুদ্ধে আহত স্বামীকে আন্তরিকভাবে সেবা-যত্ন করার ফলে স্বামী তাঁকে দুটি বর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং কৈকেয়ী ভবিষ্যতে এ বর দুটি চেয়ে নেবেন বলে জানিয়েছিলেন। রাজা দশরথের অপরিসীম আশ্রয়-প্রশ্রয়ের ফলে কৈকেয়ী একদিকে যেমন ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন, তেমনি কৌসল্যাকে নির্যাতন ও অপমান করতেন। রামের রাজ্যাভিষেকের সময় দাসী মন্থরার মন্ত্রণায় কৈকেয়ী নিজপুত্র ভরতকে রামের স্থলাভিষিক্ত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। রামের রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত হলে কৈকেয়ীর চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়। সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে দশরথকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন এবং রামকে বনবাসের কথা জ্ঞাত করেন। রামের বনবাস যাত্রাকালে সমস্ত অযোধ্যা নগরী দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে রামকে বিদায় দিলেও কৈকেয়ী ছিলেন স্থির এবং আনন্দোদ্বেলিত। শুধু তাই নয়, স্বামীর মৃত্যু সংবাদে তাঁর বৈধব্য-লোকনিন্দায় তিনি মোটেও অনুতপ্তা ছিলেন না—ছিলেন পুত্রের নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ স্বপ্নে বিভোর। মাতা কৈকেয়ীর এরূপ আচরণে ভরত তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। ভরত তাঁকে নানা প্রকার কটু কথা দ্বারা তিরস্কার করেন।[৪২] স্নেহাধিক পুত্রের এরূপ কঠোর তিরস্কারে কৈকেয়ীর চৈতন্যের উদয় হয় এবং তিনি তাঁর নিজ বুদ্ধিভ্রম উপলব্ধি করেন। রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময় অবশ্য তিনি সকলের সঙ্গে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হন এবং এতে তাঁর এই দীর্ঘদিনের দুঃখ ও লজ্জার অবসান ঘটে।

রামায়ণের একজন উল্লেখযোগ্য নারী হিসেবে পারিবারিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কৈকেয়ীর অবস্থান অত্যন্ত ব্যতিক্রম। আমরা সাধারণভাবে একজন রাজ-মহিষীর নিকট থেকে যে উদার আচরণ প্রত্যাশা করি কৈকেয়ীর মধ্যে তা বিন্দুমাত্র ছিল না। ঐক্যবদ্ধ পরিবারের রাজ-মহিষীদের যে সমদৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশিত, তা কৈকেয়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিজ ভেদ-বুদ্ধি এবং বৈমাত্রেয় আচরণ তাঁকে সমাজে একজন নিম্নস্তরের নারী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সকল রাজ-মহিষীর মতো শাসন ও রাজকার্যে এবং প্রজাপালনে তাঁরও কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে রামায়ণের সর্বাপেক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য ঘটনা রামের বনবাস এবং এই ঘটনাকে আবর্তিত করেই অন্যান্য ঘটনার সূত্রপাত। সেদিক থেকে বিচার করলে রামের বনবাসে কৈকেয়ীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সুমিত্রা : সুমিত্রা বাল্মীকি রচিত রামায়ণের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি নারীচরিত্র। তিনি অযোধ্যাপতি দশরথের তৃতীয়া স্ত্রী এবং দশরথের যমজ-পুত্র লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের গর্ভধারিণী মাতা। তিনি সত্যনিষ্ঠা, ধর্মনিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণা, শুভৈষিণী ইত্যাদি মহৎ ও সদ্‌গুণে বিভূষিতা এক অপূর্ব নারীচরিত্র। সর্বোপরি তিনি রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী কৌসল্যার ছায়া সঙ্গিনী—কৌসল্যার সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থার সঙ্গিনী। দশরথের এই দুইজন স্ত্রী এক প্রাণ, এক আত্মা; পরস্পর অভিন্ন এবং অচিন্তনীয়। তিনি কৌসল্যার দুঃখে যেমন দুঃখিত-চিত্তে নিজ কর্তব্য দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করেছেন, তেমনি রামের বনবাস যাত্রায় অত্যন্ত ধীর ও অবিচলিত-চিত্তে নিষ্কামভাবে জননীর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

রামের বনবাস যাত্রাকালে মাতা সুমিত্রা পুত্র লক্ষণকে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেন যে, সকলের প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রামের সঙ্গে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে এই প্রত্যাশায় যে, জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য একান্ত ধর্মসম্মত। তাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে সার্বিক সহযোগিতা করাই হবে একদিকে তাঁর প্রধান কাজ, অন্যদিকে মহৎ বংশের উপযুক্ত পরিচায়ক:

সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি ॥
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ ॥
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কলস্যাস্য সনাতনম্...॥
অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০/৫-৭[৪৩]

শুধু তাই নয়, দৃঢ়চরিত্র এবং দৃঢ় সংকল্পের অধিকারিণী সুমিত্রা লক্ষণকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তুমি রামকে অবশ্যই দশরথের মতো, সীতাকে তোমার মাতার মতো এবং অরণ্যকে তোমার প্রিয় বাসভূমির মতো মনে করবে:

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥
অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০/৯[৪৪]

এছাড়া সুমিত্রা তাঁর অতি প্রিয় ভগ্নীতুল্য সপত্নী উদ্বিগ্না হৃদয় কৌসল্যাকে সর্বপ্রকার সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে শান্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুমিত্রা চরিত্রের উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, রাজ্যশাসন বা রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে সুমিত্রারও কোনো ভূমিকা নেই। অত্যন্ত শান্ত, স্বল্পভাষিণী ও মধুর স্বভাবের অধিকারিণী সুমিত্রাদেবী অযোধ্যাবাসীর প্রিয়পাত্রী ছিলেন। একদিকে যেমন দশরথ ও কৈকেয়ীসহ কারো প্রতি তাঁর কোনো অনুযোগ-অভিযোগ ছিল না, তেমনি পারিবারিক দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধেও কারো অনুযোগ-অভিযোগ ছিল না। সপত্নী কৌসল্যার মধ্যে আত্মবিলীন হয়ে তিনি সকল প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে থেকে নিঃস্বার্থভাবে পরার্থে জীবন কাটিয়েছেন।

সুমিত্রার চরিত্র বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, সুমিত্রা ভারতবর্ষীয় নারীর এক অপরূপা ও উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। একজন মহিষী হিসেবে, মাতা হিসেবে, বধূ হিসেবে পরিবার ও সমাজে একজন আদর্শ নারীর যে অবস্থানের কথা আমাদের চিত্রপটে ভেসে উঠে, সুমিত্রা তারই অনন্যা দৃষ্টান্ত। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি সুস্থিত ও সুশৃঙ্খল জীবন আনয়নে তাঁর যথাযথ ভূমিকা অবশ্যই লক্ষ করার মতো।

সীতা : রামায়ণের মানবী চরিত্রের মধ্যে মিথিলা-রাজ জনকের পালিতা কন্যা সীতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সীতার অপর নাম জানকী, বৈদেহী ও মৈথিলী। সীতা রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং রাম-সীতাকে আবর্তিত করেই রামায়ণ রচিত। সীতা পতিব্রতা নারী। সহিষ্ণুতা-ক্ষমা-স্নেহ-প্রেম-বিরহ-মিলনের এক ব্যতিক্রমধর্মী নারী সমস্ত পার্থিব স্বার্থের ঊর্ধ্বে এবং পরার্থে আত্মত্যাগে মহিয়সী, চারিত্রিক দৃঢ়তায় ও নিজ ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না, প্রিয়ভাষিণী এবং সর্বোপরি রূপমাধুর্যে অনন্যা। এই মহিয়সী নারী অযোধ্যারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের সহধর্মিণী। রামচন্দ্র জনকরাজার শর্তানুযায়ী হরধনু ভেঙে সীতাকে বরমাল্য প্রদান করেন। অনুপম রূপবতী সীতা নিজ প্রজ্ঞা ও গুণে পিতৃগৃহের ন্যায় পতিগৃহেও সকলের হৃদয় জয় করেন। পতিগতপ্রাণাসাধ্বী সীতা স্বামী রামচন্দ্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে বনবাসে সহযাত্রিণী হন। কারণ সীতা মনে করেন, শাস্ত্রানুযায়ী এই পার্থিব সংসারে একমাত্র স্ত্রীই স্বামীর কর্মফল ভোগ করে থাকেন, অন্য কেউ নন। শুধু তাই নয়, ইহজগতে ও পরজগতে স্বামীই নারীদের একমাত্র অবলম্বন। তাই রামচন্দ্রের বনবাসের আদেশ পরোক্ষভাবে সীতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং, বনবাসে না যাওয়ার জন্য রামচন্দ্রের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সীতা রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে সে কথাই বলেন :

> ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
> অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥
> ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ৷৷
অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭/৫-৬[৪৫]

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই বনবাস জীবনেই পঞ্চবটী বন থেকে তিনি লঙ্কারাজ রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হন। রাবণ ছলে-বলে-কৌশলে সীতার মন জয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পতিব্রতা ও দৃঢ়ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী সীতা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে রাবণকে তীব্র ভাষায় অপমান করেন। শোকক্লিষ্টা সীতার নিকট রাবণ প্রণয় ভিক্ষা করলে সীতা তাঁর ও রাবণের মাঝখানে একটি তৃণ রেখে রাবণকে বলেন যে, পুণ্যাত্মা দশরথের পুত্র রাঘব শ্রেষ্ঠ রাম তাঁর স্বামী। ভাই লক্ষণকে সঙ্গে করে তিনি তাঁকে হত্যা করবেন এবং তাঁর পাপের ফলেই লঙ্কা ভস্মীভূত হবে। তিনি তাঁর এই অচেতন দেহকে বন্ধন করতে পারলেও তাঁর পতিপ্রেম-ধর্মকে কিছুতেই বিনাশ করতে পারবেন না।[৪৬]

লঙ্কাপুরী থেকে সীতাকে উদ্ধারের পর রামচন্দ্রের সম্মুখে তাঁকে উপস্থিত করা হলে রামচন্দ্র জনসমক্ষে কঠোর ভাষায় তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্না সীতা স্বামীর বাক্যবাণে একদিকে যেমন লজ্জিতা হন, অন্যদিকে ক্রোধান্বিতাও হন। সত্যভাষণে বিরত না থেকে তিনি প্রাণপ্রিয় স্বামীকে কঠোর ভাষায় অশ্রুসজল নয়নে ও দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে, তাঁর বাক্য অত্যন্ত নিম্নমানের এবং তিনি কোনো অবস্থাতেই চরিত্রহীনা নন। তিনি সর্বদাই একাগ্রচিত্তে স্বামীকেই স্মরণ করেছেন। তাই তাঁকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই :

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ৷৷
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে ৷৷
যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬/৫-৬[৪৭]

সীতা শুধু ব্যক্তিত্বসম্পন্না, এবং দৃঢ়চরিত্রের অধিকারিণীই নন, সত্য উন্মোচনে তিনি অনন্যা এবং দৃঢ়সংকল্পের অধিকারিণী। তাই তিনি স্বেচ্ছায় অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করেন। এখানে স্বামীকে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তা যেকোনো সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্বামীকে বলেন যে, তাঁর মন কখনো পথভ্রষ্ট হয়নি। তাঁর চরিত্র যথার্থ বিশুদ্ধ এবং দিবারাত্রি তিনি শুধু স্বামীরই চিন্তা করেছেন। তাই অগ্নিদেব অবশ্যই তাঁকে রক্ষা করবেন। এখানেই তাঁর চরিত্রের আপোষহীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় :

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসপতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ৷৷
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং মানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ৷৷
কর্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্।

Dhaka University Institutional Repository

রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ॥
যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬/২৫-২৭[৪৮]

সীতার পতিভক্তি, সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমার পরিচয় রামায়ণের বহু স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। রামায়ণের কাহিনি পড়লে মনে হয়, সীতা এক দুর্ভাগ্য নিয়ে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই অগ্নিপরীক্ষার পরও গর্ভবতী সীতার অপবাদের কথা সুহৃদবর্গের নিকট শুনে রাম সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে স্বামীর ইচ্ছাপূরণে সীতা অবিচল থাকেন এবং বাল্মীকির আশ্রমে গমন করেন। বাল্মীকির আশ্রমে বনবাসজীবন শেষে রাম প্রজা-মনোরঞ্জনের জন্য সীতাকে পুনরায় সতীত্বের পরীক্ষার নিমিত্তে শপথ করতে বললে তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাতালে প্রবেশ করেন।

সীতার উপর্যুক্ত জীবন-কথা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা তৎকালীন সমাজে সীতার অবস্থান তুলে ধরতে প্রয়াসী হব।

সীতা কন্যা, তবে পালিতা কন্যা এবং রামায়ণে বর্ণিত তিনি অযোনিসম্ভবা। তা সত্ত্বেও সমাজের আর দশটি কন্যার মতোই তিনি একান্ত কন্যারূপেই প্রতিপালিত হয়েছেন এবং কন্যার সকল প্রকার অধিকারই ভোগ করেছেন। সীতার বিবাহ হয় মাত্র ছয় বছর বয়সে যাকে আমরা বাল্যবিবাহ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। শুধু তাই নয়, এই বাল্যবিবাহেই পিতার এক অনাকাঙ্ক্ষিত শর্ত, অর্থাৎ, সমাজের যেকোনো শ্রেণি পেশার পুরুষ সেই শর্ত পূরণে সমর্থ হলে তাঁকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে সীতা বাধ্য ছিলেন। অর্থাৎ, স্বামী নির্বাচনে কন্যার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যই ছিল না। সীতার বিবাহিতজীবন অদৃষ্ট বা ভাগ্যের কোনো বিড়ম্বনা নয়। স্বামী-সংসার সম্পর্কে ঐ নাবালিকার অজ্ঞতার সুযোগই ছিল প্রধান কারণ।

রামের সঙ্গে সীতার বিবাহিতা জীবন নানা জটিল ঘটনায় আবর্তিত। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, পুনঃপুন সতীত্ব পরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো একজন নারীর স্বাভাবিক জীবনে কি কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অথচ এরূপ বিরূপ অবস্থার মধ্য দিয়েও সীতা-চরিত্রের কোমলতা, নিঃস্বার্থ পতিপ্রেম, সহিষ্ণু মনোভাব, স্বামী-সংসার এবং সমাজের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আস্থা ইত্যাদি একজন নারীর বিভূষিত অলংকার হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু এর পাশাপাশি একজন রাজকন্যা, রাজবধূ সর্বোপরি রাজ্যের সর্বময় কর্তা রামচন্দ্রের সহধর্মিণী তথা রাজমহিষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রকৃত অর্থেই রাজকার্যে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিতা, প্রজাদের সুখ-দুঃখ দূরীকরণে নিষ্ক্রিয়। সাংসারিক জীবনে একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ঐকান্তিক সান্নিধ্যলাভ এবং সন্তানদের লালন-পালনে মায়ের যথাযথ ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

থেকেও বঞ্চিতা। সমাজব্যবস্থা থেকে এরূপ বঞ্চিতা একজন নারী শুধু সহনশীলতা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি ইত্যাদি গুণের কারণে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সুতরাং, রামায়ণে সীতার অবস্থান সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, সীতাদেবী তৎকালীন সমাজব্যবস্থার এক নির্মম শিকার। সংসার, স্বামী এবং সমাজের প্রতি ঐকান্তিক আস্থা ও নিবেদিত প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা তাঁকে বার বার নিগৃহীত ও বিব্রত করেছে। রাজকন্যা ও রাজমহিষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বিত জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং একটি সুখী-সুন্দর জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

মন্থরা : মন্থরা ছিলেন রাজা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়তমা স্ত্রী কৈকেয়ীর একান্ত অনুগতা দাসী। দশরথের সঙ্গে বিয়ের সময় কৈকেয়ীর সঙ্গে তিনি অযোধ্যায় আসেন। স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কুটিলা প্রকৃতির এবং অত্যন্ত হিংসাপরায়ণা। রামের রাজ্যাভিষেকের প্রথম দিকে কৈকেয়ী সানন্দচিত্তে রামকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি পুত্র হিসেবে রাম ও ভরতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে চান না। তাই তিনি রামের রাজ্যাভিষেককে সানন্দে ও হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দাসী মন্থরার মন্ত্রণায় তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্বামী দশরথের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত দুটি বর: রামের বনবাস এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। কুটিলস্বভাবা মন্থরা কৈকেয়ীকে বুদ্ধিহীনা ও তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে কৌসল্যার সেবা-দাসী এবং নানা প্রকার ভাবী বিপদের চিত্র তুলে ধরে তাঁর মনকে বিষাক্ত করে তোলেন। শুধু তাই নয়, মন্থরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র ভরতের অনুপস্থিতিতে এই রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হচ্ছে এবং সৌভাগ্যগর্বে গর্বিতা কৈকেয়ী কর্তৃক দীর্ঘদিনের নির্যাতিতা কৌসল্যা প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়চিত্ত হবেন। মন্থরার এ দুটি কথায় কৈকেয়ী তাঁর সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ, রামের বনবাস ও নিজপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেকের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কৈকেয়ীর প্রতি মন্থরার নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেই তার কুটিলস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়:

হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে।
শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে ॥
মনসা প্রসহামি ত্বাং দেবি দুঃখার্দিতা সতী।
যচ্ছোচিতব্যে হৃষ্টাসি প্রাপ্য ত্বং ব্যসনং মহৎ ॥
শোচামি দুর্মতি ত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ।
অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্ ॥
....
দর্পান্নিরাকৃতা পূর্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া।

Dhaka University Institutional Repository

রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ ॥
অযোধ্যাকাণ্ড, ৮/২-৪, ৩৭[৪৯]

অর্থাৎ, তুমি মুর্খের ন্যায় অসময়ে আনন্দ করছ কেন? তুমি দেখছি শোকের সাগরে থেকেও তা অনুধাবন করতে পারছ না। তোমার দুঃখে আমি ভীষণভাবে দুঃখিতা। তারপরেও মনে মনে আমার হাসি পাচ্ছে। কেননা, দারুণ বিপদের মধ্যে থেকেও শোকের পরিবর্তে তুমি আনন্দবোধ করছ। তোমার মতিভ্রম দেখে আমিই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। অরে! সপত্নীপুত্র আর মৃত্যুর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তাই তাঁর (সপত্নীপুত্র) উন্নতিতে কোনো বুদ্ধিমতী নারী আনন্দ পেতে পারে না। পূর্বে তুমি নিজের সৌভাগ্যমদে গর্বিতা হয়ে রাম-জননী কৌসল্যাকে অবজ্ঞা করেছ। তাই এখন তোমার সেই সতীন শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করবে না কেন?

তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নতুন বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত দাসী পাঠাবার রীতি ছিল। রানি কৈকেয়ীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মন্থরা ছিলেন রানি কৈকেয়ীর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত এবং সুখ-দুঃখের সমব্যথিনী। বিবাহিতজীবনে দশরথের প্রধানা মহিষী কৌসল্যা কর্তৃক নির্যাতিতা ও উপেক্ষিতা হতেন বলে তিনি মনে করতেন। তারপরেও একজন মাতা হিসেবে তিনি সপত্নীপুত্র এবং নিজ পুত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে চাননি। কিন্তু বিশ্বস্ত দাসী মন্থরার মন্ত্রণায় তাঁর সর্বজনীন মাতৃহৃদয়ের পুত্রের প্রতি স্নেহভাব বিসর্জিত হয়। নানা জটিল প্রকৃতির চরিত্রের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও একজন দাসী কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে তাই রাজ-অন্তঃপুরে নানা ঘটনাবহুল উত্থান-পতনে দাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তাদের অবস্থানের কথা উল্লেখ করার মতো।

একজন নারী হিসেবে সমাজে মন্থরার অবস্থান অত্যন্ত জটিল, কুটস্বভাবের এবং হীনমানের। একজন দাসী হয়েও মন্থরা অযাচিতভাবে রাজ-মহিষীকে প্রভাবিত করতে পারার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যতিক্রম। মন্থরার কারণেই রাজা দশরথের সামগ্রিক পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় নানা উত্থান-পতনের সৃষ্টি হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে রামায়ণের কাহিনিতে একজন সাধারণ নারী এবং দাসী হিসেবে মন্থরার অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় ও প্রভাবশালী।

তারা : রামায়ণের বানর নারীচরিত্রের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তারা। তিনি বানর-বৈদ্য সুষেণের কন্যা এবং কিষ্কিন্ধার রাজা বালির পত্নী, আবার বালির ভ্রাতা সুগ্রীবেরও পত্নী। বালির

Dhaka University Institutional Repository

ঔরসজাত তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম অঙ্গদ। পরমাসুন্দরী এই রমণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বক্তা এবং নিজ সিদ্ধান্তে অটল।

অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে এক বছরেরও অধিক সময় কপিরাজ বালি আত্মরক্ষার্থে গর্তে লুকিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ফিরে না আসায় ভ্রাতাকে মৃত মনে করে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় ফিরে এসে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ভ্রাতৃ-পত্নীকে বিবাহ করেন। তারা এতে কোনো আপত্তি করেননি। বেশ কিছুদিন পর অসুরকে বধ করে নিজ রাজ্যে ফিরে এসে বালি ভ্রাতার এরূপ কার্যে ক্রোধান্বিত হন এবং ভ্রাতা সুগ্রীবকে নির্বাসনে পাঠান। তারা পুনরায় বালিকেই স্বামীরূপে গ্রহণ করেন। এদিকে রামের সঙ্গে সুগ্রীবের এক চুক্তির ফলে সুগ্রীব তাঁর ভাইকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। ভবিষ্যদ্দ্রষ্ট্রী তারা বিষয়টি উপলব্ধি করে স্বামীকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে বালি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং রামের হাতে শরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদে তারা ব্যথিতা হন এবং প্রাণত্যাগ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁকে শাস্ত্রবাক্য শুনিয়ে সান্ত্বনা দেন। ফলে তিনি প্রাণত্যাগ করা থেকে বিরত থাকেন। রামচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তারা আবার সুগ্রীবকে স্বামীরূপে বরণ করেন। কারণ রামচন্দ্র তারার এই মনোভাবের কথা পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন।

রামায়ণে তারার চরিত্রের দুটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। তিনি কাজের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে যেমন সক্ষম, কার্যকারণ নির্ণয়ে যেমন দক্ষ, ভবিষ্যদ্বাণী করতে যেমন বিচক্ষণ, ঠিক তেমনি কামোন্মত্তা, নির্লজ্জা এবং এক অর্থে ব্যভিচারে লিপ্ত। মানবসমাজের ন্যায় বানরসমাজেও এই ব্যভিচার প্রথা নিন্দনীয় ছিল। ক্রোধান্বিত লক্ষণের প্রতি তারার উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, স্বামী বালিকে হারিয়ে তিনি অনুতপ্তা নন, রামের প্রতি তাঁর কোনো বিদ্বেষ মনোভাব নেই; বরং সুগ্রীবের প্রতি তাঁর প্রবল কামাসক্তি রয়েছে—যে কারণে তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী এবং শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শিনী হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়সংযমের অভাবে এভাবে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন :

নৈবাকৃতজ্ঞঃ সুগ্রীবো ন শঠো নাপি দারুণঃ।
নৈবানৃতকথো বীর ন জিহ্মশ্চ কপীশ্বরঃ॥
উপকারং কৃতং বীরো নাপ্যয়ং বিস্মৃতঃ কপিঃ।
রামেণ বীর সুগ্রীবো যদন্যৈর্দুষ্করং রণে ॥
রামপ্রসাদাৎ কীর্তিঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাং মাঞ্চ পরন্তপ॥
সদুঃখশায়িতঃ পূর্বং প্রাপ্যেদং সুখমুত্তমম্।
প্রাপ্তকালং ন জানীতে বিশ্বামিত্রো যথা মুনিঃ ॥

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৩৫/৩-৬[৫০]

অর্থাৎ, হে বীর, কপিরাজ সুগ্রীব কোনো সময়ই অকৃতজ্ঞ, প্রবঞ্চক, নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী অথবা কুটিল প্রকৃতির নন। শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধের সময় অসাধ্যকে সাধন করে সুগ্রীবের যে উপকার করেছিলেন তা তিনি কখনোই ভুলতে পারেন না। হে পরন্তপ, রামচন্দ্রের অনুগ্রহেই সুগ্রীব সুনাম, যশ, কপিরাজ্য এবং রুমা ও আমাকে লাভ করেছেন। পূর্বে তিনি অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। তাই তো এতসব সুখভোগে আত্মহারা হয়ে তিনি বিশ্বামিত্র মুনির ন্যায় নিজের কর্তব্যকর্মকে ভুলে গেছেন।

তবে ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে যে পাঁচজন পঞ্চসতীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে—তার মধ্যে তারার নামও স্থান পেয়েছে। কারণ স্বামী বালির মৃত্যুর পর শোকাভিভূতা তারা রামের নিকট থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রীয় তত্ত্বকথা শুনেছিলেন। এই সৌভাগ্যের কারণেই তিনি চির প্রাতঃস্মরণীয়া হয়ে আছেন বলে অনেকে মনে করেন। সামাজিকভাবে তারা এক দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। সমাজে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং ভবিষদ্‌দ্রষ্টা হিসেবে সুপরিচিত। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, তিনি সর্বদাই নিজ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত এবং সামাজিক ভয়ে ভীতা নন। অনেক অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিনি নিজ লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছেন এবং স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখেই জীবনযাপন করেছেন।

মন্দোদরী : রামায়ণের রাক্ষস-নারীচরিত্রের মধ্যে মন্দোদরী একজন অসাধারণ ও উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র। অসুররাজ ময়দানবের ঔরসে হেমা নামে এক অপ্সরার গর্ভে মন্দোদরীর জন্ম। দেবতাদের কার্য সফল করার জন্য মন্দোদরীর মা হেমা দীর্ঘ চৌদ্দ বছর স্বর্গে অবস্থান করলে মনঃকষ্টে ময়দানব কন্যা মন্দোদরীকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্য ভ্রমণে বের হন। এ সময় লঙ্কারাজ রাবণের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। মন্দোদরীর অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে রাবণ মন্দোদরীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ময়দানব সন্তুষ্ট হয়ে জামাতাকে এক অমোঘশক্তি দান করেন। মন্দোদরী তিনপুত্র সন্তানের জননী : মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ), অভিকায় ও অক্ষয় কুমার। রামায়ণে যেমন তাঁকে অপূর্ব সুন্দরী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, তেমনি তাঁকে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা, সত্যনিষ্ঠা এবং নীতিপরায়ণা হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। রাবণের প্রতি মন্দোদরীর ভালোবাসা এবং আনুগত্য অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে মন্দোদরী রাবণের সীতাহরণকে কখনো সমর্থন করেননি বরং তাঁকে তিরস্কার করেছেন, সত্যপথে চলার উপদেশ দিয়েছেন এবং সীতাকে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও বারবার

Dhaka University Institutional Repository

অনুরোধ করেছেন। কিন্তু রাবণ তার কথায় কর্ণপাত করেননি। উল্লেখ্য যে, সীতার সঙ্গে মন্দোদরীর অত্যন্ত সু-সম্পর্ক ছিল। সীতা উদ্ধারে রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের হাতে রাবণ নিহত হন। এই যুদ্ধে পতিব্রতা ও যোদ্ধা মন্দোদরী রাবণের পাশে থেকে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যদিও তিনি জানতেন, রাম স্বয়ং বিষ্ণুরূপধারী, মহাশক্তিশালী, মহাযোগী, সনাতন পরমাত্মা এবং জগতের কল্যাণ কামনায় মানবরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও রাবণের পক্ষে রামকে পরাজিত করা একেবারেই অসম্ভব:

মহাবলং মহাবীর্যং দেবশত্রুং মহৌজসম্ ।
ব্যক্তমেষ মহাযোগী পরমাত্মা সনাতনঃ ॥
অনাদিমধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্ ।
তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥
শ্রীবৎসবক্ষা নিত্যশ্রীরজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
মানুষং রূপমাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥
যুদ্ধকাণ্ড, ১১১/১১-১৩[৫১]

তারপরেও রাবণের মৃত্যুতে পতিপরায়ণা মন্দোদরী যারপর নেই দুঃখিতা হন এবং বিলাপ করতে থাকেন। এই বিলাপকালে তাঁর মুখ থেকে অনেক ধর্মসংগত কথা জানা যায়। তিনি বলেন যে, সীতাকে হরণ করার ফলেই এই যুদ্ধের সূত্রপাত, স্বজনবিনাশ এবং ঐশ্বর্য-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। সতীসাধ্বী সীতার তপস্যার কারণেই রাবণ দগ্ধ হয়েছেন। তাঁর দুষ্কর্মের কারণেই আজকে মন্দোদরীর এই বৈধব্য:

ঐশ্বর্যস্য বিনাশায় দেহস্য স্বজনস্য চ।
অরুন্ধত্যা বিশিষ্টাং তাং রোহিণ্যাশ্চাপি দুর্মতে ॥
সীতাং ধর্ষয়তা মান্যাং ত্বয়া হ্যসদৃশং কৃতম্ ।
বসুধায়া হি বসুধাং শ্রিয়াঃ শ্রীং ভর্তৃবৎসলাম্ ॥
সীতাং সর্বানবদ্যাঙ্গীমরণ্যে বিজনে শুভাম্।
আনয়িত্বা তু তাং দীনাং ছদ্মনাত্মস্বদূষণম্ ॥
অপ্রাপ্য তং চৈব কামং মৈথিলীসঙ্গমে কৃতম্ ।
পতিব্রতায়াস্তপসা নূনং দগ্ধোঽসি মে প্রভো ॥

যুদ্ধকাণ্ড, ১১১/২০-২৩[৫২]

রামায়ণের নারীচরিত্রের মধ্যে মন্দোদরীর চরিত্র অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী এবং স্মরণীয়। তিনি স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল অবস্থাকে দমন করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন এবং স্বামীভক্তির প্রবল পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার এক অপূর্ব দৃষ্টান্তের অধিকারিণী রাক্ষস-নারীচরিত্র মন্দোদরী।

Dhaka University Institutional Repository

মন্দোদরী ভারতবর্ষীয় নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের এক উজ্জ্বল প্রতিভূ। পারিবারিক অবস্থানের দিক থেকে তিনি পতিপ্রাণাগতা, বিশ্বস্ত, স্বামীর আস্থাভাজন এবং একই সঙ্গে একজন আদর্শ মাতা। রূঢ় বাস্তবসত্যকে জেনে তিনি স্বামীকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হয়ে স্বামীর সহযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজন্যবর্গের সামরিক অভিযানে রাক্ষস নারীরাও অংশগ্রহণ করতেন। মন্দোদরী বাস্তবসত্য মেনে নেওয়ার একটি উদার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা সামগ্রিকভাবে প্রশংসার যোগ্য।

শূর্পণখা : রামায়ণের উল্লেখযোগ্য আরেকটি রাক্ষসচরিত্র হচ্ছে বিশ্রবার ঔরসে ও কৈকসীর গর্ভজাত কন্যা শূর্পণখা। তিনি ছিলেন বিদ্যুদ্‌জিহ্ব নামক এক দানবের স্ত্রী এবং লঙ্কারাজ রাবণের ভগ্নী। দিগ্বিজয়ে গমন করে রাক্ষসদের সঙ্গে এক যুদ্ধে রাবণের হাতে শূর্পণখার স্বামী নিহত হন। এরপর থেকেই শূর্পণখার প্রতি রাবণ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। পঞ্চবটীতে ভ্রমণকালে শূর্পণখা সেখানে সুদর্শন রামকে দেখে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হন এবং বিফল মনোরথ হয়ে সীতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হন। এ সময় রামের নির্দেশে লক্ষণ তার নাক ও কান কেটে দেন। ভগ্নীর এই বিরূপ অবস্থা দেখে খর ও দূষণ (মাসতুতো ভাই) চৌদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে রাম-লক্ষণকে আক্রমণ করে সকলেই প্রাণ বিসর্জন দেন। এমতাবস্থায় শূর্পণখা লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে সবিস্তারে এই ঘটনা বর্ণনা করে সীতাকে অপহরণে উত্তেজিত এবং প্ররোচিত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রাবণকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করতে তিনি কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভগ্নীর কথায় রাবণ তাড়কার পুত্র মারীচের আশ্রমে গিয়ে সীতা হরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রামচন্দ্রের অসীম শক্তি ও শৌর্যবীর্যের কথা উল্লেখ করে মারীচ তাঁকে এরূপ কার্য থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করলে রাবণ লঙ্কায় ফিরে যান। কিন্তু ভগ্নীর আর্তচিৎকার, ভর্ৎসনা, প্রলোভন ও উত্তেজনাপূর্ণবাক্যে রাবণ মারীচের কথা অগ্রাহ্য করে সীতাকে হরণে উদ্যত হন। রাবণকে উত্তেজিত করার জন্য শূর্পণখা তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেন :

> প্রমত্তঃ কামভোগেষু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কুশঃ।
> সমুৎপন্নং ভয়ং ঘোরং বোদ্ধব্যং নাববুধ্যসে ॥
> সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্ ।
> লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ ॥
>
> অরণ্যকাণ্ড, ৩৩/২-৩[৫৩]

অর্থাৎ, স্বৈরবৃত্ত বিধায় তুমি কেবলমাত্র কামভোগেই লিপ্ত। তাই তো আসন্ন মহাবিপদ দেখেও তুমি তা অনুধাবন করতে পারছ না। নগণ্য সুখে আকৃষ্ট, কামাসক্ত, লোভী রাজা প্রজাদের নিকট শ্মশানাগ্নির ন্যায়। এ ধরনের রাজা প্রজাদের নিকট কাঙ্ক্ষিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তিনি সীতার প্রতি রাবণকে আকৃষ্ট করার জন্য সীতার রূপ লাবণ্যের বর্ণনা করেন।[৫৪]

রামায়ণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত 'সীতাহরণ'। শূর্পণখার চরিত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি লঙ্কারাজ রাবণের ভগ্নী হওয়ার কারণে শ্রীহীনা হওয়া সত্ত্বেও রামের মতো সংযমী পুরুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ও কামাসক্তা। বিধবা ভগ্নীর প্রতি সমব্যথী হওয়ার কারণে রাবণ মারীচের উপদেশ অগ্রাহ্য করে ভগ্নীর প্ররোচনায় আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সবংশে নিধন হন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে রামায়ণে শূর্পণখার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন ভগ্নীর অনুরোধ, প্ররোচনা ও প্রলোভনে কীভাবে একটি দেশ ও জাতি ধ্বংস হতে পারে তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ রামায়ণের রাবণ-ভগ্নী শূর্পণখা।

ভারতবর্ষীয় সমাজে ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে যে পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসার কথা জানা যায়, রাবণ-শূর্পণখা তাদের মধ্যে অন্যতম। স্বামীহারা স্নেহময়ী ভগ্নীর প্ররোচনায় রাবণ রামের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং একটি রাজ্য ও একটি বংশের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। এটি সম্ভব হয়েছিল পারিবারিকভাবে শূর্পণখার দৃঢ় অবস্থানের কারণে। তার এই অবস্থান পরোক্ষভাবে রাজকার্যে সক্রিয় ভূমিকার কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

সরমা : গন্ধর্ব দেশের রাজা মহাত্মা শৈলূষের কন্যা, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের স্ত্রী এবং কলা নামক কন্যার মাতা রাক্ষস-নারী সরমা। সরমা দৃঢ়ব্রতা, দয়াবতী, সান্ত্বনাদাত্রী এবং একই সঙ্গে ভয়হীনা দৃঢ়চিত্তের অধিকারিণী। রাবণের নির্দেশে তিনি সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হন এবং লঙ্কায় সীতার জীবনের নানা রকম উত্থান-পতনের মধ্যে তিনিই সীতাকে সখীস্নেহে দেখেন। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের সখ্যতা গড়ে উঠে। তিনি সীতাকে রাবণের চক্রান্ত এবং রামের সীতা উদ্ধারের বিভিন্ন পরিকল্পনা বিভিন্নভাবে ও কৌশলে জ্ঞাত করেন। যেমন, রামের 'মায়ামুণ্ডু' দেখে সীতার ব্যাকুল ক্রন্দন ও বিলাপ বন্ধের জন্য সত্যকথা বলতে সরমা ভীতা হননি। লঙ্কায় সীতার দুঃখময় জীবনে সরমা সর্বদা সীতার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং ততোধিক সুমধুর ভাষা প্রয়োগে সীতার দুঃখ-কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন। এতে করে সীতার শোকাতুর হৃদয় ক্ষণকালের জন্য হলেও শান্ত হতো। যেমন, একদা সরমা সীতাকে বলেন :

উৎসহেয়মহং গত্বা ত্বদ্বাক্যমসিতেক্ষণে।
নিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্তিতুম্॥
নহি মে ক্রমমাণায়া নিরালম্বে বিহায়সি।
সমর্থো গতিমন্বেতুং পবনো গরুড়োঽপি বা ॥

যুদ্ধকাণ্ড, ৩৪/৩-৪[৫৫]

> অর্থাৎ, আমি অত্যন্ত অদৃশ্যভাবে রামের নিকট গিয়ে তোমার কুশলবার্তা জানিয়ে আবার অদৃশ্যভাবেই তোমার কাছে ফিরে আসব। রামের নিকট আমার এই যাত্রার বিষয়টি পবন বা গরুড় কেউই জানতে পারবে না।

লঙ্কায় বাসকালে এরূপভাবে সরমা সীতাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং মনোবল অটুট রাখার জন্য সর্বতোভাবে সহায়তা করতেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, সরমা পারিবারিকভাবে রাবণের একান্ত ঘনিষ্ঠজন। তথাপি তিনি একজন নারীহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, স্বামী-সন্তান, এবং পরিবারের প্রতি স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার কথা মনে করেই সীতাকে অটুট মনোবলে রাখার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন। এদিক থেকে একাধারে তিনি সীতার কন্যা-মাতা-ভগ্নীর পদে সমাসীনা হয়েছেন। এথেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে বিবেকোচিত কাজটিই করেছেন যা তাকে সমাজে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ভারতবর্ষের শাশ্বত সংস্কৃতির মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং সে যুগের সমাজজীবন চিত্রায়ণে এক তথ্যসমৃদ্ধ শাস্ত্রকথা। এই শাস্ত্রকথায় তৎকালীন সমাজজীবনের সর্ববিধ দিক উন্মোচিত হয়েছে। আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানবীচরিত্র, বানর-নারীচরিত্র ও রাক্ষস-নারীচরিত্র আলোচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। কারণ রামায়ণের ঘটনার অগ্রগতিতে প্রত্যেকটি নারীচরিত্রই স্বমহিমায় উজ্জ্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রামায়ণে একদিকে যেমন পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়, অন্যদিকে বহুবিবাহ বিশেষ করে উচ্চশ্রেণির অভিজাত মহলে বহুবিবাহ প্রথার চিত্রও পাওয়া যায়। রাজা দশরথের তিন রানির মধ্যে কৌসল্যা সমাজ-সংসারের প্রতি দায়িত্ববতী, পতিপ্রেমে নিবেদিতা, ধর্মপরায়ণা এবং সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণা। সহজ-সরল জীবনযাপনকারিণী এই মহীয়সীর মধ্যে নেই কোনো জটিলতা এবং রাজ ষড়যন্ত্র। তাই নিজপুত্র রামের বনবাসের সংবাদে প্রথম দিকে তিনি মর্মাহতা হলেও পরিবার এবং রাজ্যের কল্যাণ ও শুভ কামনায় তিনি স্বামী দশরথের সিদ্ধান্ত মেনে নেন কিংবা আমরা বলতে পারি মেনে নিতে বাধ্য হন। দশরথের আরেক রানি কৈকেয়ীর চরিত্র কৌসল্যার বিপরীত। পতিপরায়ণা হলেও তিনি নিজ স্বার্থে অটল এবং দশরথের অন্য রানি সুমিত্রার চরিত্রটি নানাদিক থেকে সমুজ্জ্বল। তিনি পতিপরায়ণা,

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্যপরায়ণা এবং শান্তিকামী। এই তিনজন নারীরই সমাজে কোনো ভূমিকা নেই, নেই অন্তঃপুরে তেমন কোনো ভূমিকা। পতির আদেশ-নির্দেশ পালন করে জীবন অতিবাহিত করাই যেন তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সীতার জন্ম কাহিনি, বাল্যকালে (ছয় বছর পর্যন্ত) পিত্রালয়ে লালন-পালন, অত্যন্ত ব্যতিক্রমভাবে রামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ, রামের সঙ্গে বনবাস গমন, রাবণ কর্তৃক হরণ, বারংবার নিজ চরিত্রের শুদ্ধতার পরীক্ষার জন্য অগ্নিপরীক্ষা এবং পাতাল প্রবেশের মাধ্যমে ইহধাম ত্যাগ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়েই সীতার চরিত্রটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সীতার জন্য আমাদের দুঃখ হয় এবং একজন অবলা নারীর মতো সমাজ-সংসারের দুর্দান্ত প্রতাপকে নির্বিচারে মেনে নেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি আমাদের ক্রোধেরও সঞ্চার হয়। কিন্তু সীতার করণীয় কিছু ছিল না। তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী পতিই বিবাহিতা নারীর একমাত্র দেবতা, পতিই নারীর একমাত্র গতি, পতিই নারীর একমাত্র মুক্তির বাহক। তাই পত্নীর অধিকার নেই স্বামীকে সত্য-মিথ্যা জিজ্ঞাসা করার। এটা শুধু পারিবারিকভাবেই নয়; সামাজিকভাবেও এই মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই সীতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি, এবং তাঁকে একের পর এক নিজের শুচিতা পরীক্ষার জন্য সমাজ-সংসারের কাছে বারবার প্রস্তুত থাকতে হয়েছে। রামায়ণে নারীর এই অবস্থা ও অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁর স্বাধীনতা এবং স্বাধীন আচরণ তাই প্রশ্নবিদ্ধ।

মহাকাব্য রামায়ণ তৎকালীন সমাজজীবনের এক প্রতিফলন। বাল্মীকি রামায়ণ রচনাকালে অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তৎকালীন সমাজ এবং পারিবারিক জীবন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই তিনি নববধূর সঙ্গে একজন দাসী পাঠাবার বিষয়টি অনুল্লেখ রাখেননি। দশরথের রাজ পরিবারের ঘটনা পরম্পরায় এই দাসী মন্থরা এক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বলা যায়, তারই প্ররোচনায় কৈকেয়ীর একটি সিদ্ধান্তে ঘটনা ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয় এবং রামায়ণ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে দাস-দাসীদের এরূপ ভূমিকা কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়।

বাল্মীকি রামায়ণকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়ার প্রয়াসে একদিকে যেমন মানব-মানবী চরিত্রের অবতারণা করেছেন, তেমনি বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়, বিস্তৃত ও বহুমুখী করার জন্য নিজ কল্পনায় বানর-বানরী এবং রাক্ষস-রাক্ষসী চরিত্রের অবতারণা করেছেন। তাই আমরা বানরী ও রাক্ষসীচরিত্র আলোচনাকালে তাদের সঙ্গে মানব আশা-আকাঙ্ক্ষার যেমন মিল দেখতে পাই, তেমনি রাজকার্য পরিচালনায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও দেখতে পাই। যেমন, বানরীচরিত্রে তারার ভূমিকা কিংবা রাক্ষসীচরিত্রে

Dhaka University Institutional Repository

মন্দোদরী, শূর্পণখা এবং সরমার ভূমিকা মানব চরিত্রেরই অনুরূপ এবং তাদের চরিত্রের মধ্য দিয়েই মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

রামায়ণ তাই শুধু কবিকল্পিত কাহিনি নয়, তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বহুমুখী দিকের একটি সফল প্রতিফলন। আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তু আলোচনার দিকে লক্ষ রেখে রামায়ণের নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অবদমন, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের নিগ্রহের জন্য পুরুষের আধিপত্য, অসমশক্তি এবং ক্ষমতা তাদের জীবনকে যে সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে—তারই একটি দিক উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছি।

আমরা ইতোপূর্বে ভারতবর্ষের বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের মূল নির্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। মহাভারতের মুখ্যচরিত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এতে যেমন আছে মানবীচরিত্র, দেবী চরিত্র, অপ্সরাচরিত্র, রাক্ষসীচরিত্র, নাগকন্যা চরিত্র, তেমনি আছে অযোনিসম্ভূতা নারীচরিত্র। এইসব চরিত্রের সমাহার মহাভারতের নারীচরিত্র। নারী গবেষক পূরবী বসু তাঁর *প্রাচ্যে পুরাতন নারী* [৫৬] গবেষণা গ্রন্থে মহাভারতের নারীচরিত্রগুলোকে 'বহুল-আলোচিত নারী', 'স্বল্প- আলোচিত নারী' এবং অপ্সরাIএই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। মহাভারতের বহুল-আলোচিত নারীদের মধ্যে তিনি নিম্ন নারীদের নাম উল্লেখ করেছেন :

সত্যবতী
কুন্তী
দ্রৌপদী
গান্ধারী
দেবযানী
অরুন্ধতী
দময়ন্তী
অম্বিকা
অম্বালিকা
অম্বা
মাদ্রী
উলূপী
সত্যভামা
শর্মিষ্ঠা
সুদেষ্ণা

Dhaka University Institutional Repository

সুভদ্রা
হিড়িম্বা
উত্তরা
শকুন্তলা
শিখণ্ডি
উর্বশী
তিলোত্তমা
গঙ্গা
মাধবী
জনা
মৃত্যু
রম্ভা
মেনকা

স্বল্প-আলোচিত নারীদের মধ্যে তিনি নিম্ন নারীদের নাম উল্লেখ করেছেন :

রাধা (২) কর্ণকে যিনি মাতা হিসেবে পালন করেন।
দুঃশলা
দেবিকা
দেবাহুতি
ভানুমতী
সুপ্রভা
পুলোমা
সুকুমারী
সুদর্শনা
সুশোভনা
বিনতা
গিরিকা
রুচি
সুর্বচলা
সুকন্যা
শ্রুবাবতী
পিঙ্গলা (২) ভাগবতে আছে এক পিঙ্গলা যার হাতের চুড়ি সর্বদা ঝংকার তুলত।
দেবসেনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রমীলা (২) মহাভারতের অর্জুনপত্নী প্রমীলা, তার সৈন্যবাহিনীসহ পুরুষ থেকে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হন।

পিঙ্গলা

লপিতা

চান্দ্রেয়ী

তপতী

প্রমদ্বরা

ভাস্বতী

অস্তিকা

সুলভা

গুণকেশী

গৌতমা

পদ্মাবতী (২) কর্ণের স্ত্রী। মহাবীর ও দাতা বলে খ্যাত কর্ণ অবিবাহিতা কুন্তী ও সূর্যের পুত্র।

লক্ষ্মণা (১) দুর্যোধনের কন্যা; কৃষ্ণপুত্র শাল্ম তাকে অপহরণ করে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে গিয়ে অবশেষে বিয়ে করেন।

লক্ষ্মণা (২) রাজা দুষ্মন্তের স্ত্রীদের একজন; পুত্রের নাম জন্মেজয়

লক্ষ্মণা (৩) শ্রীকৃষ্ণের পাঁচজন প্রধানা স্ত্রীর মধ্যে একজন

গিরিকা

অপ্সরাদের মধ্যে তিনি নিম্ন নারীদের নাম উল্লেখ করেছেন :

মেনকা

রম্ভা

উর্বশী

হেমা

তিলোত্তমা

ঘৃতাচী

সুকেশী

সুপ্রিয়া

অদ্রিকা

জানপদী

এখানে উল্লেখ্য যে, অপ্সরাচরিত্রের মধ্যে মেনকা, রম্ভা, উর্বশী ও তিলোত্তমা।এই চারটি চরিত্রের নাম বহুল আলোচিত নারীচরিত্রের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারতের উপর্যুক্ত নারীচরিত্র থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক নারীচরিত্র নিয়ে আলোচনা করব।

সত্যবতী : সত্যবতী মহাভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এক অর্থে কেন্দ্রীয় চরিত্র। সত্যবতীর বংশধারা থেকেই মহাভারতের মঞ্চের প্রস্তুতি। সত্যবতী তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে নানা নামে ভূষিতাঃ মৎস্যগন্ধা, গন্ধকালী, গন্ধবতী, যোজনগন্ধা ইত্যাদি। তিনি উপরিচর বসুর কন্যা এবং ধীবররাজের কাছে পালিতা, হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর স্ত্রী তথা মহিষী এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের মাতা। তাঁর জন্ম, বিবাহ, সন্তানলাভ ইত্যাদি যেমন নানা বিচিত্রমুখীধারায় প্রবাহিত, তেমনি রাজ্যশাসনে তাঁর ভূমিকা নানা ঘটনার উৎথান-পতনের মধ্য দিয়ে আবর্তিত।

সত্যবতীর জীবনকাহিনি থেকে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতী, অধিকার সচেতন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শিনী এবং সর্বোপরি রাজকার্য পরিচালনায় সুদক্ষ। তিনি তাঁর প্রায় একক সিদ্ধান্তে মৃত্যু-পূর্ব পর্যন্ত নির্দ্বিধায় রাজকার্য পরিচালনা করেন।

সত্যবতীর বুদ্ধিমত্তা এবং নিজস্বার্থ উদ্ধারের কৌশল তাঁর যৌবনেই লক্ষ করা যায়। কামার্ত পরাশর মুনির কাছ থেকে অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁর গাত্রগন্ধ দূরীকরণ, দৈহিক মিলনের পরও কুমারীত্ব ফিরিয়ে আনা এবং নিজগর্ভে জন্মগ্রহণকারী পুত্রকে পরিত্যাগ ইত্যাদি ঘটনায় আমরা তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারি না। এরপর আমরা লক্ষ করি যে, হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর বিবাহ-প্রস্তাবে ধীবররাজের শর্তারোপ, অর্থাৎ, নিজপুত্রের ভবিষ্যৎ রাজা হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও তিনি ধীবর রাজার বিরুদ্ধাচারণ না করে হৃষ্টচিত্তে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বিবাহে রাজি হন। মাতা হিসেবে তাঁর ভূমিকাও সফল। সপত্নী-পুত্র ভীষ্মকে আপন পুত্রের মতোই স্নেহ করতেন, রাজকার্য পরিচালনায় তাঁর মতামতকে প্রাধান্য দিতেন এবং নিজপুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অপরিসীম। নিজবংশ রক্ষায় তিনি 'ক্ষেত্রজসন্তান' উৎপাদনেও পিছপা হননি। তাই তিনি সবকিছু বিবেচনা করেই ভীষ্মকে ভাতৃবধূদের গর্ভে 'ক্ষেত্রজসন্তান' উৎপাদনের প্রস্তাব করেন এজন্য যে, এতে তাঁদের বংশরক্ষা হবে, ধর্মরক্ষা হবে এবং সর্বোপরি পিতৃপুরুষগণ নরকপ্রাপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। সত্যবতীর ভাষায় :

> তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সন্তানায় কুলস্য নঃ।
> মন্নিয়োগান্মহাবাহো! ধর্ম্মং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥
> . . . মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্ ॥
> আদিপর্ব্ব, ৯৭/১১-১২[৫৭]

এছাড়া দাসীর সঙ্গে নিজপুত্রের দৈহিক মিলনেও বাঁধা দেননি। এসব কিছুই সত্যবতীর একক প্রচেষ্টার ফসল।

রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও সত্যবতী সফল। স্বামী হস্তিনারাজ শান্তনুর অকাল মৃত্যুতে পুত্র চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজ আদেশ-নির্দেশ অনুসারে সপত্নী-পুত্র ভীষ্মকে দিয়ে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন। কুরুক্ষেত্রের এক যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ প্রাণ হারালে তিনি ভীষ্মের পরামর্শে বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে পরোক্ষভাবে নিজেই রাজ্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি কুরুবংশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় ঘর-সংসার, রাজ্য পরিত্যাগে ভীষ্মের অনুমোদন সাপেক্ষে পুত্রবধূদের নিয়ে বনবাসে দিন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করে অভিলষিত জীবন প্রাপ্ত হন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সত্যবতী বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত, হৃদয়াবেগ দ্বারা নয়। তিনি বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়চিত্ত এবং একজন কৌশলী সুচতুরা নারী। মহাভারতে সত্যবতীর ঘটনাবহুলজীবন অত্যন্ত ব্যতিক্রম। সেই যুগে একজন নারী কতখানি সফল এবং স্বাধীনভাবে ঘর-সংসার এবং রাজকার্য পরিচালনা করেছেন তা সত্যবতীর জীবন থেকেই বোঝা যায়। নারীর এই স্বাধীন ভূমিকা মহাভারতের যুগে নারী-স্বাধীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা : মহাভারতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকা।এরা সম্পর্কে একে অপরের ভগ্নী এবং কাশীরাজ দ্রুপদের কন্যা। অম্বা কাশীরাজের প্রথমা ও অবিবাহিতা কন্যা যিনি পরজন্মে দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডি নামে জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকা কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীর্য-পত্নী এবং ধৃতরাষ্ট্র-জননী। অম্বালিকা কাশীরাজের তৃতীয়া কন্যা। তিনিও বিচিত্রবীর্য পত্নী, অর্থাৎ বোন অম্বিকার সপত্নী এবং পাণ্ডু-জননী।

মহারাজ ভীষ্ম স্বয়ংবর সভা থেকে বৈমাত্রেয় ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই তিন কন্যাকে জোরপূর্বক হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন। কিন্তু অম্বা নিঃসংকোচে ভীষ্মকে জানান যে, তিনি ইতোপূর্বে সৌভপতি শাল্বকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছেন। তাই ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বরাজের নিকট সসম্ভ্রমে পাঠিয়ে দেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের সাত বছরের মধ্যে বিচিত্রবীর্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পুত্রশোকে শোকগ্রস্তা মাতা সত্যবতী এই দুই যৌবনা পুত্রকামা বিধবা পুত্রবধূকে দেখে অত্যন্ত ব্যথিতা হন এবং কুরুবংশকে রক্ষার নিমিত্তে পুত্র ভীষ্মকে 'ক্ষেত্রজসন্তান' উৎপাদনে অনুরোধ করেন। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব প্রতিজ্ঞা এবং সত্যভঙ্গ না করার মানসে ভীষ্ম এই কার্য থেকে বিরত থাকেন। এরূপ অবস্থায় সত্যবতী তাঁর কুমারীকালের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের দ্বারা অম্বিকার গর্ভে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে শীর্ণকায় পাণ্ডু নামে দুইজন 'ক্ষেত্রজপুত্র' উৎপাদন করান। সত্যবতী দ্বিতীয়বার বেদব্যাসের দ্বারা 'ক্ষেত্রজসন্তান' উৎপাদনের নিমিত্তে অম্বিকাকে নিয়োগ করলে অম্বিকা সত্যবতীর আদেশ পালন না করে তার সবচেয়ে সুন্দরী দাসীটিকে গোপনে প্রতারণা করে বেদব্যাসের নিকট পাঠান। বেদব্যাসের ঔরসে দাসীর এই গর্ভজাত সন্তানের নাম বিদুর যিনি পরবর্তীকালে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা বলে পরিচিতি লাভ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এই তিন কন্যার মধ্যে অম্বাই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি দৃঢ়চিত্তে এবং নির্ভয়ে মনের বাসনা ভীষ্মকে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অম্বিকা ও অম্বালিকা তৎকালে প্রচলিত সামাজিকব্যবস্থায় নিজেদের সমর্পণ করেছেন। তাঁরা উভয়েই প্রতিবাদহীন এবং আর দশটি নারীর মতো স্বামী, শাশুড়িসহ সকলকে নিয়ে সাধারণভাবেই সংসারজীবন অতিবাহিত করেছেন। বিনা দ্বিধায় এবং প্রতিবাদহীনভাবে শুধু পুত্রসন্তানলাভের স্বার্থে ক্ষেত্রজসন্তান উৎপাদনেও তাঁরা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। এক্ষেত্রে সমাজ-সংসার এবং নীতি-নৈতিকতার ধার ধারেননি। অম্বিকা ও অম্বালিকার শুধু স্বাধীনতা ছিল নিজ ইচ্ছানুসারে বর নির্বাচনের। কিন্তু ভীষ্ম কর্তৃক অপহৃতা হওয়ায় সেই পথও বন্ধ হয়ে যায়। এখানে তাঁদের প্রতিবাদিনী ভূমিকা দেখা যায় না। রাজমহিষী হিসেবে শুধু সন্তান উৎপাদন কার্যে তাঁরা নিয়োজিত। সমাজ এবং রাজকার্যে তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই।

এক্ষেত্রে একেবারে ব্যতিক্রম অম্বা। অম্বা প্রতিবাদিনী, সাহসিনী, দৃঢ়চিত্তের অধিকারিণী এবং নিজ ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। স্বয়ংবর সভা থেকে ভীষ্ম কর্তৃক অপহৃতা হওয়ায় তাঁর পতি হিসেবে কাঙ্ক্ষিত শাল্বরাজ তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে তাঁর স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। তিনি এর প্রতিশোধ নিতে ভীষ্মকে হত্যা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং এজন্য যা যা করণীয় তা করতেও মনস্থির করেন। তাই দেখা যায়, তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে কখনো দুর্গমপথে অগ্রসর হচ্ছেন; কখনো নিজের জীবনকে বিপন্ন করে কঠিন পথে অগ্রসর হচ্ছেন; আবার কখনো মানুষ-অসাধ্য তপস্যায় নিমগ্না হয়ে কাঙ্ক্ষিত ফললাভের আশায় দেবতাদের বর ও আশীষ কামনা করছেন। ভাগ্যবিড়ম্বিতা অম্বা পরবর্তী জীবনে দেবতার আশীর্বাদে শিখণ্ডি নামে জন্মগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁর পরমশত্রু ভীষ্মকে বধ করতে সমর্থ হন।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারতের নারীচরিত্রের মধ্যে অম্বার চরিত্র বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ভীষ্ম কর্তৃক অম্বাকে সসম্মানে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করার বিষয়টি তৎকালীন সমাজে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাছাড়া একজন নারী হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, সাহসীভূমিকা পালন এবং দুর্দান্ত প্রতাপে যুদ্ধ করে ভীষ্মকে বধ কৌরবদের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে। এক্ষেত্রে একজন নারী হিসেবে অম্বার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গান্ধারী : মহাভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে গান্ধার রাজ্যের রাজা সুবল-কন্যা গান্ধারী। গান্ধারী সুবলাত্মজা নামেও পরিচিত। জন্মভূমি এবং জনকের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তাঁর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। গান্ধারী হস্তিনাপুরের অধিপতি বিচিত্রবীর্য ও অম্বিকার 'ক্ষেত্রজপুত্র' ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী এবং দুর্যোধনসহ শতপুত্র ও এক কন্যার জননী। তাঁর আরেকটি পরিচয় হচ্ছে, তিনি অধার্মিক শকুনির ভগ্নী।

গান্ধারী মহাভারতের এক ব্যতিক্রম নারীচরিত্র। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে সততা, ধর্মনিষ্ঠা, পতিভক্তি এবং সর্বোপরি পরিবেশ, পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার যে সাহস, ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতার অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা বলা হয়েছে, গান্ধারী চরিত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম ঘটনা ব্যতীত তা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলো পূর্বাপর ঘটনারই অনুক্রমণ।

কুমারী অবস্থায় মহাদেবের আরাধনা করে তিনি শতপুত্রের বরলাভ করেছিলেন। বংশ মর্যাদা, খ্যাতি, আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হয়ে পিতার অভিপ্রায়ে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি বিবাহে সম্মতি দান করেছিলেন। আজীবন পতিব্রতা থাকার উদ্দেশ্যে তিনি পট্টবস্ত্র দ্বারা তাঁর নয়নযুগল বেঁধে রেখেছিলেন। গান্ধারী তাঁর স্বভাবসুলভ সুন্দর ব্যবহার, আচার-আচরণ ও বিভিন্ন কার্যের দ্বারা কুরুবংশীয় জনগণের হৃদয় জয় করেছিলেন এবং আজীবন স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে জীবন-যাপন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি পুত্রদের দীর্ঘজীবন এবং ন্যায়ধর্ম পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। যদিও পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীর সঙ্গে শক্তি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল কৌরবদের এবং গান্ধারীরও। কিন্তু গান্ধারী কখনো এই শক্তি প্রদর্শনে যুক্তি, ন্যায়পরতা এবং সর্বোপরি ধর্ম থেকে বিচ্যুতা হননি।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, কুন্তীর পুত্রলাভে গান্ধারীর মনে ঈর্ষাভাবের জন্ম হয়েছিল। এই ঈর্ষাজনিত পাপের কারণে গান্ধারীকে প্রায় সারাজীবনই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধারীর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের জীবিতাবস্থায়ই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দুর্যোধন ছিলেন পরশ্রীকাতর। তাই জ্ঞাতি পাণ্ডবদের ধন-ঐশ্বর্য হস্তগত করার উদ্দেশ্যে মাতুল শকুনির চক্রান্তে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেন। শকুনির কপটতায় যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় ধীরে ধীরে সর্বস্বান্ত হন এবং সর্বশেষে পত্নী দ্রৌপদীকেও পণ রেখে হেরে যান। এই দ্যূতক্রীড়ায় ধৃতরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন থাকলেও গান্ধারীর মোটেই সমর্থন ছিল না। বরং তিনি এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে দুর্যোগ আশঙ্কা করে পুত্রস্নেহে অভিভূত স্বামীকে বলেন :

> ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রা মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষুঃ।
> তস্মাদয়ং মদ্বচনাত্ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ ॥
> তথা তে ন কৃতং রাজন্! পুত্রস্নেহান্নৃহামতে!
> তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধিঃ কুলান্তকরণায় হ ॥
> শমেন ধর্ম্মেণ নয়েন যুক্তা যা তে বুদ্ধিঃ সাঽস্তু তে মা প্রমাদীঃ।
> প্রধ্বংসিনী ক্রূরসমাহিতা শ্রীর্মৃদুপ্রৌঢ়া গচ্ছতি পুত্রপৌত্রান্ ॥
>
> সভাপর্ব্ব, ৭২/৮-১০[৫৮]

অর্থাৎ, আপনার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার পুত্রগণ আপনার প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করুক। তারা যেন কোনো অবস্থাতেই বিপক্ষের প্রভাবে আপনাকে পরিত্যাগ না করে; তাই আপনার নিকট আমার বিশেষ নিবেদন, অন্ধপুত্রস্নেহের বশবর্তী না হয়ে কুলকলঙ্ক দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। দুর্যোধনকে ত্যাগ না করার কারণে আপনার বংশ ধ্বংসের সমীপে উপস্থিত। তাই এ সময়ে আপনার শান্তি, ধর্ম এবং নীতিযুক্ত যে বুদ্ধি তাই জাগ্রত হোক।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় সভাকক্ষে সকলে নিশ্চুপ থাকলেও গান্ধারী এই ঘটনাকে অধর্ম বলে পরিত্যাজ্য মনে করেন এবং এই গর্হিত কর্মের জন্য পুত্রকে ত্যাগ করতেও স্বামীকে অনুরোধ করেন। গান্ধারী ছিলেন ধর্মানুরাগিণী। তিনি শত বিপদসংকুল অবস্থায়ও অধর্মের পথ অনুসরণ করেননি এবং সততার সঙ্গে আপোষ করেননি। তাই আমরা লক্ষ করি, কুন্তীর সঙ্গে এক ধরনের নীরব শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও সদ্ভাব বজায় রাখতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়লে তিনি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েছিলেন যে, পুত্র দুর্যোধন অন্যায় পথে লিপ্ত; পক্ষান্তরে পাণ্ডবেরা ধর্মপথে থেকেই যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তাই প্রতিদিন দুর্যোধন জননীর নিকট থেকে জয়লাভের প্রার্থনা করলে তিনি প্রতিবারই বলেন, 'সর্বক্ষেত্রে ধর্মেরই জয় হবে'।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শতপুত্রের মৃত্যু গান্ধারীকে অবশ্যই শোকগ্রস্ত করে তোলে। তারপরও তিনি স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেন যে, এই লোকক্ষয়ের জন্য পুত্র দুর্যোধন ও দুঃশাসন, ভাই শকুনি এবং

Dhaka University Institutional Repository

কুন্তী-পুত্র কর্ণই দায়ী। যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণ দায়ী নন। তাই কুন্তীর মতো তিনিও পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শোকবিহ্বল গান্ধারী ভীমের নিকট তাঁর একটি পুত্রকেও জীবিত না রেখে সকল পুত্রহত্যার কারণ জানতে চান। এ প্রসঙ্গে ভীম মাতৃতুল্যা গান্ধারীকে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসন ও দুর্যোধনের অমানবিক ও মানবেতর আচরণে ক্ষুদ্ধ ও ব্যথিত হয়ে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, দুঃশাসনের রক্তপান এবং দুর্যোধনকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবেন। তিনি শুধু সেই প্রতিজ্ঞাই রক্ষা করেছিলেন। তা না হলে সেটি অধর্ম হতো। এর উত্তরে গান্ধারী ভীমকে বলেন :

> বৃদ্ধস্যাস্য শতং পুত্রান্ নিঘ্নংস্ত্বমপরাজিতঃ।
> কস্মান্নাশেষয়ঃ কঞ্চিদ্‌যেনাল্পমপরাধিতম্ ॥
> সন্তানমাবয়োস্তাত! বৃদ্ধয়োর্হৃতরাজ্যয়োঃ।
> নাশেষয়ঃ কথং যষ্টিমেকাং বৃদ্ধযুগস্য বৈ ॥
> শেষে হ্যবস্থিতে তাত! পুত্রাণামন্তকে ত্বয়ি।
> ন মে দুঃখং ভবেদেতৎ যদি ত্বং ধর্ম্মমাচরেঃ ॥
>
> স্ত্রীপর্ব্ব, ১৪/২১-২৩[৫৯]

> অর্থাৎ, "ভীম! তুমি অপরাজিত থাকিয়া এই বৃদ্ধের একশত পুত্রই বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, একটী মাত্রকেও অবশিষ্ট রাখিলে না কেন? যাহাতে তোমার অপেক্ষাকৃত অল্প অপরাধ হইত।
>
> বৎস! আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়া লইয়াছ, এই অবস্থায় আমাদের বৃদ্ধযুগলের যষ্ঠিস্বরূপ একটী সন্তানকেও অবশিষ্ট রাখিলে না কেন?
>
> বৎস! একটী পুত্রও যদি অবশিষ্ট থাকিত এবং তুমি যদি ধর্ম্মাচরণ করিতে, তবে তুমি পুত্রহন্তা হইলেও তোমার উপরে আমাদের এরূপ আক্ষেপ হইত না।"

গান্ধারীর এ বক্তব্যে পাণ্ডবদের প্রতি নেই কোনো প্রতিশোধ স্পৃহা, প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব; বরং তাঁর নিরবতায় তাঁর মনের ঔদার্যই ফুটে উঠেছে। অতঃপর গান্ধারী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দেখার ইচ্ছাপোষণ করলে যুধিষ্ঠির তাঁর অপরাধ স্বীকার করে মাতৃতুল্যা গান্ধারীর আশীর্বাদ কামনায় পদধূলি নিতে গেলে গান্ধারীর দৃষ্টি পট্টবস্ত্রের ফাঁক দিয়ে তাঁর ডান পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগে পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নখগুলো কুৎসিতরূপ ধারণ করে। এই দৃশ্য দেখে সকলেই সেই স্থান ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় ধর্মমতী গান্ধারীর চরিত্রের ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবই প্রকাশিত হয়।

এসব পূর্বাপর ঘটনার মধ্য দিয়ে গান্ধারীর জীবনে একটি পর্যায়ের সমাপ্তি হয়। এরপরও তিনি আঠার বছর জীবিত ছিলেন এবং স্বামীর সঙ্গে যোগাসনে বসে হুতাসনে এ পার্থিব দেহের অবসান ঘটান।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারতে গান্ধারীর বহু বর্ণিলজীবন। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হলেও বিবাহিতজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া স্বামীর প্রতি নিরাসক্ত আচরণ করেছেন। এই ব্যতিক্রমগুলোও পুত্রদের জন্য এবং পুত্রদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়। আজীবন ধর্মপথে থেকে তিনি ধর্মেরই জয়গান গেয়েছেন এবং ধর্মকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। ধর্মের কাছে সবকিছুই তুচ্ছ। তাই বারবার তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছে ধর্মের জয়গান।

গান্ধারীর জীবনইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি অন্য রাজকুমারীদের মতোই পিতৃগৃহে পিতা-মাতার আদর-যত্নে বেড়ে উঠেন। তবে অন্যান্য রাজকুমারীর ন্যায় তাঁর বিবাহের জন্য স্বয়ংবর প্রথার আয়োজন করা হয়নি। তাই স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়নি। স্বামীর বংশের বংশ মর্যাদা, খ্যাতি, আচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে তাঁর পিতা-মাতা একজন জন্মান্ধ রাজার নিকট তাঁকে সম্প্রদান করেন। আর দশজন ভারতীয় নারীর মতোই তিনি এর প্রতিবাদ না করে জন্মান্ধ স্বামীকে হৃষ্টচিত্তে বরণ করেন। শুধু তাই নয়, পট্টবস্ত্র দ্বারা নিজ চক্ষুদ্বয় আবদ্ধ রেখে স্বামীর প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সমাজ-সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তিনি নিজে আজীবন ধর্মের প্রতি অবিচল বিশ্বাসী হলেও স্বামী এবং পুত্রদের ধর্মপথে পরিচালিত করতে পারেননি। পুত্রের দুর্বৃত্ততায় তিনি রুষ্টা ও ক্রোধান্বিতা। স্বামীর পুত্র-স্নেহের দুর্বলতায় তিনি শঙ্কিতা। মাঝে মধ্যে স্বামীকে ভর্ৎসনাও করেছেন। কিন্তু এরপরও প্রতিকার করতে পারেননি। এখানেই রাজমহিষী হিসেবে তাঁর জীবনের বড় ব্যর্থতা। মাতা হিসেবে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর পুত্রদের বিশেষ করে দুর্যোধনকে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারেননি। দুর্যোধন ছিলেন দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, দুরাচারী এবং কুরুবংশের ধ্বংসকারী। এই পুত্রের জন্মের সময়েই বিদুর তাকে ত্যাগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু স্বামী ধৃতরাষ্ট্র তা সমর্থন করেননি বলে গান্ধারীও স্বামীর কথাই মেনে নেন।

ধর্মপথের অনুসারী গান্ধারী কুন্তীর পুত্র আগে জন্মগ্রহণ করাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ তো করেনই নি; উপরন্তু পাথরের আঘাতে গর্ভপাত করান। কারণ তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর পুত্র রাজ্যের অধিপতি হোক। একজন ধর্মমতী নারীর এরূপ মনোভাব অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এদিক থেকে কুন্তী ছিলেন ব্যতিক্রম। তপোবনে বাসের সময় কুন্তী স্বেচ্ছায় তাঁর ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবার জন্য বনবাসী হন। অথচ এই কুন্তীর প্রতিই তিনি ঈর্ষান্বিতা ছিলেন। এখানেই রাজমহিষী হিসেবে কুন্তীর মনের ঔদার্য এবং গান্ধারীর সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তাঁর প্রতিবাদ ছিল ধর্মাশ্রিত। কিন্তু একজন রাজমহিষী হিসেবে এবং নারী হিসেবেও দ্রৌপদীর অপমান বন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করতে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর কারণ প্রথম দর্শনে দ্রৌপদীকে তিনি তাঁর পুত্রদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে মনে করেন। একজন রাজমহিষী হিসেবে তিনি এসব ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। ফলে পরিবার এবং সমাজজীবনে তাঁর যথাযথ ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ।

গান্ধারীর উপর্যুক্ত দোষ-ত্রুটির কারণে মুনি-ঋষিরা তাঁকে পঞ্চকন্যার অন্তর্ভুক্ত করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

কুন্তী : কুন্তী যদুবংশীয় সূরের কন্যা এবং বসুদেবের ভগ্নী। তাঁর প্রকৃত নাম পৃথা। নৃপতি কুন্তিভোজের নিকট তিনি দত্তক কন্যা হিসেবে লালিত-পালিত হওয়ায় পৃথা কুন্তী নামে পরিচয় লাভ করেন। তিনি পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী এবং কর্ণ-যুধিষ্ঠির–ভীম-অর্জুন জননী। কুন্তী ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী, লজ্জাবতী, সর্বগুণে গুণান্বিতা, ধর্মপরায়ণা, ব্রতচারিণী, কোমলস্বভাবা এবং সর্বোপরি তেজস্বিনী।

কুন্তী তাঁর পালক পিতার অতি অনুগতা ছিলেন। পিতার আদেশ অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণ এবং অতিথিদের পরিচর্যা করতেন। কুমারী অবস্থায় কুন্তী উগ্র স্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ও প্রশস্তচিত্ত দুর্বাসা নামক মুনিকে সর্বপ্রযত্নে সন্তুষ্ট করলে মুনি তাঁকে একটি 'অভিকর্ষণমন্ত্র' দান করেন। এই 'অভিকর্ষণমন্ত্র' দ্বারা তিনি যে যে দেবতাকে আহ্বান করবেন; তাঁদের অনুগ্রহেই তিনি পুত্রলাভ করবেন। উল্লেখ্য যে, দুর্বাসা মুনি ধ্যানযোগে জানতে পেরেছিলেন যে, কুন্তীর পক্ষে মানব-ঔরসে সন্তান জন্মদান সম্ভব নয়। একদা কৌতূহল বশে কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করেন। তার ফলেই তিনি গর্ভধারণ করে যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। কন্যাত্ব দূষিত না হওয়ার বর লাভ করার পরেও লোকলজ্জার ভয়ে তিনি ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে অতি সংগোপনে পুত্রটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেন। এই পুত্রই পরবর্তীকালে কর্ণনামে পরিচিতি লাভ করেন। মহাভারতের আর দশজন রাজকন্যার মতো তিনিও স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত থেকে স্বামী নির্বাচন করেন। তাঁর স্বামী ভরত বংশীয় প্রদীপ রাজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু। কিছুদিন পর পাণ্ডু শল্যরাজের ভগ্নী মাদ্রীকেও বিবাহ করেন। এতে কুন্তী কোনো আপত্তি না করেই পতিসেবা করে সপত্নীসহ সুখে দিন অতিবাহিত করেন।

মাসাধিকাল অতিবাহিত হওয়ার পর পাণ্ডু দিগ্‌বিজয়ে বের হন এবং বিভিন্ন রাজ্য জয় করে আপন রাজ্যে ফিরে আসেন। এর কিছুকাল পর তিনি পত্নীদ্বয়সহ অরণ্যে যাত্রা করেন এবং অরণ্যের বিভিন্ন স্থান বিচরণ করে মৃগয়া করেন। একদা পাণ্ডু মৈথুনরত হরিণরূপী তেজস্বী ঋষিকে তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা বিদ্ধ করে বধ করেন। ফলে মৃগরূপী ঋষিকুমার তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন যে, রমণে প্রবৃত্ত হলে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

(পাণ্ডু) মৃত্যু অনিবার্য হবে। কিন্তু পুত্রমুখ দর্শনে ব্যাকুল পাণ্ডু 'ক্ষেত্রজপুত্র' লাভের জন্য কুন্তীর নিকট তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। কুন্তী স্বামীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে 'ক্ষেত্রজসন্তান' জন্মদানে রাজি হন এবং কুমারী অবস্থায় প্রাপ্ত মন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মের দ্বারা যুধিষ্ঠির, পবনের দ্বারা ভীমসেন ও ইন্দ্রের দ্বারা অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। পাণ্ডুর অনুরোধে তিনি সপত্নী মাদ্রীকেও উক্ত মন্ত্রটি শিখিয়ে দেন। ফলে মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দ্বারা নকুল ও সহদেব নামে যমজ সন্তান লাভ করেন। এরপরও স্বামী পাণ্ডু আরো সন্তানের অনুরোধ করলে কুন্তী তা প্রত্যাখ্যান করেন। মুনির অভিসম্পাতকে উপেক্ষা করে প্রবল কামাকাঙ্ক্ষী পাণ্ডু স্ত্রী মাদ্রীর সঙ্গে রমণে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং মাদ্রীও স্বামীর সঙ্গে সহমরণে প্রাণত্যাগ করেন। এখানে উল্লেখ্য, জ্যেষ্ঠা পত্নী এবং ধর্মানুসারে কুন্তী সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মাদ্রী তাঁকে এ থেকে বিরত রাখেন।

স্বামী ও সপত্নীর শ্রাদ্ধশান্তি যথাবিধি পালন করে কুন্তী পঞ্চপুত্রসহ হস্তিনায় ফিরে আসেন এবং ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পুত্রদের বিদ্যা ও অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শী করে তোলেন। পাঁচপুত্রের প্রতিই কুন্তীর ভালোবাসা ছিল অপার ও অকৃত্রিম। কিন্তু রাজ্যের নানা উত্থান-পতনে কুন্তীকে কখনো কখনো কৌশলীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছে।

হস্তিনায় ফিরে আসার পর কুন্তীর মনে এই প্রত্যাশাই জাগ্রত হয়েছিল যে, ন্যায়ত ও ধর্মত এই রাজ্য তাঁর স্বামীর এবং রাজধর্মানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরই হবে হস্তিনার ভবিষ্যৎ রাজা। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা না হয়ে তাঁর পুত্রদের হত্যার এক রাজচক্রান্ত হয়। শুধু তাই নয়, তাদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়, কুরু জঙ্গলপ্রান্তে খাণ্ডববনে অনুর্বর ও রুক্ষস্থানে রাজ্য স্থাপন করে বসবাস করতে পাঠানো হয় এবং পরবর্তীতে সেই রাজ্যও কেড়ে নেওয়া হয়। অতঃপর কপটতা করে তাদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে যেতে বাধ্য করা হয়। শত চেষ্টা এবং সবরকম শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও তারা নিজ রাজ্য ফিরে পেলেন না। ফলে আত্মীয়-জ্ঞাতীদের সঙ্গে তাঁর পুত্ররা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে জয়লাভ করেন এবং পিতৃরাজ্যের অধিকার ফিরে পান। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন এবং রাজমাতা হিসেবে কুন্তী স্বীকৃতিলাভ করেন।

কুন্তীর জীবন নানা বিচিত্র ঘটনায় আবর্তিত। আপন পিতা-মাতা থাকা সত্ত্বেও তিনি পালিতা কন্যা হিসেবে বেড়ে উঠেন—এজন্য তাঁর মনে এবং স্বভাব-আচরণে কোনো রকম অনুশোচনা ছিল না; বরং পালক পিতার একান্ত স্নেহে এবং আদেশ-উপদেশ শিরোধার্য করে যৌবনে পদার্পণ করেন। কুন্তীর

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত থেকে স্বামী নির্বাচনের অধিকার পেয়েছেন। কিন্তু সন্তান জন্মদানে স্বামী অক্ষম হওয়ার কারণে তিনি 'ক্ষেত্রজসন্তান' লাভ করেন।

সমাজ-সংসারে কুন্তীর এই অবস্থা পাঠকের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। কুন্তী আজন্ম প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন করেছেন। কুন্তীর এমনই দুর্ভাগ্য যে, আপন মায়ের স্নেহবঞ্চিত হয়ে তিনি দত্তক কন্যা হিসেবে লালিত-পালিত হন এবং জন্মদাতা পিতা সূরের সঙ্গে আর দশটি কন্যার মতো পিতা-পুত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে বঞ্চিতা হন। একজন নারীর জন্য এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে? কিন্তু পরবর্তী জীবনে কুন্তী অত্যন্ত দৃঢ়চরিত্র, তেজস্বিনী নারীর ভূমিকা পালন করেন। দুর্বাসার অলৌকিক বরদানে কুন্তী কুমারীজীবনের এক সংকটময়কালে কানীনপুত্র সদ্যজাত কর্ণকে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দেওয়ার মতো সাহসী ভূমিকা পালন করেন। বিবাহিতজীবনে কুন্তী স্বামীসোহাগ থেকে বঞ্চিতা হলেও স্বামীর পিতৃঋণ শোধ করার মানসে স্বামীর অনুরোধেই 'ক্ষেত্রজসন্তান' লাভ করেন। ঘটনার এখানেই শেষ নয়, সপত্নীকেও 'ক্ষেত্রজসন্তান' লাভে সাহায্য করেন। এ বিষয়টিও কুন্তীর জীবনে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। স্বামী এবং সপত্নীর মৃত্যুর পর কুন্তী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে তিনি নিজ পুত্র এবং সপত্নীর পুত্রের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য না করে একান্ত বাৎসল্য স্নেহ দ্বারা সংসারজীবন পরিপূর্ণ করে সেই নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষমতা এবং শক্তির খেলায় কুন্তী অত্যন্ত কূটকৌশলের ভূমিকা পালন করেন। তিনি যখনই মনে করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্ররা নিরুদ্যম হয়ে পড়ছে. তখনই তাঁদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। যেমন, উদ্‌যোগ পর্বে পুত্র যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে কুন্তীকে বলতে শোনা যায়:

> ... ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্ম্মো মা পুত্রক! বৃথা কৃথাঃ ॥
> শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্! মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ ।
> অনুবাকহতা বুদ্ধির্ধর্ম্মমেবৈকমীক্ষতে ॥
> অঙ্গাবেক্ষস্ব ধর্ম্মং ত্বং যথা সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
> বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াঃ সৃষ্টা বাহুবীর্য্যোপজীবিনঃ ॥
> উদ্‌যোগপর্ব্ব, ১২৩/৫-৭[৬০]

অর্থাৎ, হে পুত্র! তুমি শুধু মন্দমতি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের মতো কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ। ফলে তোমার বুদ্ধি-বিকৃত হচ্ছে। তুমি ক্ষত্রিয় এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বাহু থেকে সৃষ্ট। স্বয়ং ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়দের জন্য যে ধর্ম নির্দিষ্ট করেছেন সেদিকেই লক্ষ রাখা তোমার কর্তব্য। তাই তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম পালন কর।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধজয়ের জন্য কুন্তী একদিকে যেমন বাস্তববাদী ও কৌশলী ভূমিকা পালন করেন, তেমনি ক্ষমতার প্রতি লোভও তাঁকে যুদ্ধে উজ্জীবিত করে তোলে। এছাড়া জীবনের প্রথম দিকে কুমারীত্ব বজায় রাখার জন্য তিনি যেমন কর্ণকে জন্মের পরই পরিত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি; আবার প্রয়োজনের সময় পাণ্ডবদের ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে কর্ণকে ফিরিয়ে আনতে নিজ পরিচয় প্রদানেও দ্বিধান্বিতা হননি, কুণ্ঠাও বোধ করেননি। কুন্তী দ্রৌপদীর যোগ্যা শাশুড়ি। উন্মুক্ত সভাস্থলে দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র খুলে নেবার ঘটনায় কুন্তী নিরতিশয় অপমানিতা বোধ করেছিলেন এবং এর প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নারীর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তাই নানাদিক থেকে মহাভারতে কুন্তীর চরিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল।

কুন্তীর উপর্যুক্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিবার-সমাজ-সংসার ও রাজকার্যে কুন্তীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে ছোটবেলা থেকেই তিনি পিতৃ আদেশ পালন করেছেন। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। সপত্নীর সঙ্গে আমৃত্যু সদ্ভাব বজায় রেখেছেন, বংশরক্ষায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে উত্তরাধিকারী তৈরি করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রী হিসেবে স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মাতা হিসেবে তিনি নিজ পুত্র এবং সপত্নী-পুত্রদের যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করে রাজকার্যের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। অন্যায়ভাবে পুত্রদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করেছেন এবং সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুত্রদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন ও যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সকল প্রকার কৌশল অবলম্বন করে রাজ্য উদ্ধার করেছেন। সুতরাং, একজন নারী হিসেবে রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাই আমরা বলতে পারি, আজন্ম নিঃসঙ্গবাসী কুন্তী যেমন একজন মনস্বিনী নারী তেমনি একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্না রাজনৈতিক চরিত্র।

দ্রৌপদী : দ্রৌপদী মহাভারতের নায়িকা।তিনি যজ্ঞবেদি সমদ্ভূতা, অযোনি সম্ভূতা, নাথবৎ, অনাথবতী, কৃষ্ণ-সখী, পঞ্চপাণ্ডবের পট্টমহিষী এবং পঞ্চ বীরপুত্রের জননী। গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ বলে দ্বিজগণ তাঁর নাম রাখেন কৃষ্ণা, যজ্ঞসেনের কন্যা বলে তাঁর নাম যাজ্ঞসেনী, দ্রুপদের (যজ্ঞসেন) কন্যা বলে তাঁর নাম দ্রৌপদী, পাঞ্চাল রাজ্যের কন্যা বলে তাঁর নাম পাঞ্চালী। ঋষি যাজের আশীর্বাদে দ্রৌপদী যজ্ঞসেনকে পিতা এবং তাঁর মহিষী পার্ষতীকে জননী বলে জানতেন। তিনি রূপে-গুণে সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং নিত্য স্মরণীয়া পঞ্চকন্যার একজন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্রৌপদী সর্ববিষয়ে অসামান্যা, তেজস্বিনী এবং স্পষ্টবাদিনী। শুধু তাই নয়, দ্রৌপদী সকলের প্রাণাধিক প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়া এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় রক্ষণীয়া। এখানে উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দ্রৌপদীকে এক জীবন্তচরিত্ররূপে চিত্রিত করা হয়েছে।যা অন্যকোনো নারীর ক্ষেত্রে আর লক্ষ করা যায় না।

সর্বগুণে বিভূষিতা ও অসামান্যা রূপবতী এই নারীর জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। আপন কর্মফলে তাঁর জীবনে নানা দুর্ভাগ্য দেখা দেয়। পূর্বজন্মে দ্রৌপদী অপরূপ রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত স্বামী না পাওয়ার কারণে এক কঠিন তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে অভীষ্ট বর লাভ করেন। "আমি সর্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করতে ইচ্ছা করি"।এই অভীষ্ট বাক্যটি পর পর পাঁচবার উচ্চারণ করায় মহাদেব তাঁকে ভরতবংশীয় পঞ্চস্বামী লাভের বর প্রদান করেন। পূর্বজন্মের এই বর নিয়ে দ্রৌপদী পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা দ্রুপদের কন্যারূপে আবির্ভূতা হন।

কাল পরিক্রমায় দ্রৌপদী যৌবনে পদার্পণ করলে পিতা রাজা ধ্রুপদ তার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন এবং ভরতবংশীয় অর্জুন ধনুর্বাণ দ্বারা লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করতে সমর্থ হন। পরবর্তীতে নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পঞ্চপাণ্ডব মাতৃ-আজ্ঞানুসারে দ্রৌপদীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচজন পুত্রের জন্ম হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে দ্রৌপদী অর্জুনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

ইতোমধ্যে হস্তিনারাজ্যে নানা ঘটনা ঘটে গেছে। দুর্যোধন ও শকুনির কপটপাশা খেলায় পাণ্ডবগণ সর্বস্বান্ত হয়ে অবশেষে দ্রৌপদীকেও পণ রেখে হেরে যান। ফলে দুর্যোধন দুঃশাসনের মাধ্যমে সকল পাণ্ডব, কুরু প্রমুখের সম্মুখে উন্মুক্ত সভাস্থলে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করার জন্য দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের আয়োজন করেন। দ্রৌপদীর শত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তাঁরা এই কাজ থেকে বিরত থাকেননি। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীও তেমন কোনো তীব্র প্রতিবাদ করেননি। দ্রৌপদী অবশ্য সকলকেই তিরস্কার করেন এবং শেষ আশ্রয়ের স্থল হিসেবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে এই অপমান, লাঞ্ছনা ও লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পান। ঘটনার এখানেই শেষ নয়, পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় হেরে গিয়ে দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে বার বছরের জন্য বনবাসে এবং এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হয়। এই বনবাস জীবন পঞ্চপাণ্ডবদের জন্য যেমন, তেমনি দ্রৌপদীর জন্যও অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। শুধু তাই নয়, সিন্ধুদেশের রাজা মহাযশা জয়দ্রথ বনবাসকালীন এক আশ্রম থেকে দ্রৌপদীকে হরণ করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া অজ্ঞাতবাসকালে একদা বিরাট রাজার সেনাপতি

Dhaka University Institutional Repository

কীচক দ্রৌপদীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে রমণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অবশ্য কীচকের এই অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। বরং এর জন্য তাঁকে জীবন দিতে হয়েছিল। এসব কারণে দ্রৌপদীর মনে যেমন অভিমান ছিল, তেমনি তিনি প্রতিবাদও করেছিলেন। অভিমানিনী দ্রৌপদী উন্মুক্ত সভায় বস্ত্রহরণের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে বাষ্পরূদ্ধকণ্ঠে কৃষ্ণকে বলেন, তাঁকে রক্ষা করার কেউ নেই—'স্বামীরা নেই, পুত্ররা নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই, ভ্রাতারা নেই, পিতাও নেই এবং স্বয়ং কৃষ্ণ তুমিও নেই। আমার নির্যাতন, আমাকে উপহাস কোনো কিছুরই তোমরা প্রতিকার করলে না। সবকিছুই উপেক্ষা করে গেলে।' কিন্তু আমার মনে হয় 'সম্পর্ক', 'গুরুত্ব', 'সখিত্ব' ও 'প্রভুত্ব'– এই চারটি কারণেই তোমাদের আমাকে রক্ষা করা উচিত ছিল:

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন! ॥
যে মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈরুপেক্ষধ্বং বিশোকবৎ।
ন চ মে শাম্যতে দুঃখং কর্ণো যৎ প্রাহসত্তদা ॥
চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ! ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।
সম্বন্ধাদ্‌গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব! ॥
বনপর্ব্ব, ১১/১২৬-১২৮[৬১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দ্রৌপদী পঞ্চ বীরপুত্রের জননী। কিন্তু তাঁর এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাঁর এই পঞ্চপুত্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অশ্বত্থামা ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। পুত্রশোকে শোকাতুর দ্রৌপদী এর প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে অশ্বত্থামাকে হত্যা না করা পর্যন্ত 'প্রায়োপবেশনে' প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ অশ্বত্থামার মস্তকে অবস্থিত সহজাত মণি আনার জন্য নির্দেশ দেন। ভীমসেন পলাতক অশ্বত্থামাকে ব্যাসদেবের আশ্রম থেকে খুঁজে বের করে তাঁর মাথার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সহজাত মণিটি বের করে আনেন। কৃষ্ণের অভিশাপে অশ্বত্থামাকে তিন হাজার বছর ব্যাধিগ্রস্ত এবং পূতিগন্ধময় দেশে নির্বাসন করলে দ্রৌপদী 'প্রায়োপবেশন' ভঙ্গ করেন। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর মধ্যে ভীম ও অর্জুন একাধিক বিয়ে করেন। এরূপ জটিল বিবাহিতজীবনে দ্রৌপদী অত্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সকল সমস্যার সমাধান করেন। তবে তিনি তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতেন, বিনা প্রতিবাদে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতেন না।

এভাবেই মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদী তাঁর জীবনসায়াহ্নে উপনীত হন। ইতোমধ্যে কৃষ্ণ তাঁর পার্থিবদেহ ত্যাগ করেছেন শুনে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত জানালেন। যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান শেষ করে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেন। হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে

তাঁরা মরুভূমি এবং পরে মহাপর্বত সুমেরু পাহাড় দেখতে পান। সকলেই একাগ্রচিত্তে এবং দ্রুতগতিতে পাহাড় অতিক্রমকালে দ্রৌপদী একাগ্রতাভ্রষ্ট হয়ে নীচে পড়ে যান। আর এভাবেই মহাভারতের মহানায়িকা দ্রৌপদীর জীবনাবসান হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দ্রৌপদী মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং নায়িকা। দ্রৌপদীর জীবনকে কেন্দ্র করেই মহাভারতের মূলবিষয়গুলো আবর্তিত-বিবর্তিত। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দ্রৌপদীর আবির্ভাব এবং পর্বত থেকে পড়ে গিয়ে ব্যতিক্রমভাবেই তাঁর জীবনের অবসান। দ্রৌপদীর জীবন অত্যন্ত নির্মল, পবিত্র। তিনি সরলা, কিন্তু আত্মাভিমানিনী। তিনি ধর্মানুসারিণী; কিন্তু ধর্মের ব্যত্যয়ে প্রতিবাদিনী। পিতা-মাতা, স্বামী-পুত্র-সংসার, আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিতা এই সহজ-সরল নারীর জীবন সরল রৈখিক রেখায় সমান্তরালভাবে অতিবাহিত হয়নি। নানা ঘটনা পরম্পরায় তাঁর জীবনে নেমে এসেছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, কখনো কখনো জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ, বিষাদময়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে হতে হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত। আবার অনেক সময় তাঁকে হতে হয়েছে করুণার পাত্রী, উপেক্ষিতাও হয়েছেন বার বার। একি তাঁর অদৃষ্ট? বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান? নাকি তিনি সমাজ-সংস্কারের শিকার? জীবিতাবস্থায় এই মহীয়সী নারীকে সমর্যাদা ও সম্মান দিতে না পারলেও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে প্রাতঃস্মরণীয়া নারী হিসেবে এই নারীকে মহাকাব্যকার ভুলে যাননি।

দ্রৌপদী অযোনি সম্ভূতা নারী; মানবীয় নারী নয়। ঋষির আনুকূল্যে ও দয়ায় তিনি রাজা দ্রুপদ ও তাঁর স্ত্রীকে পিতা-মাতা বলেই মানতেন। এই পিতা-মাতার গৃহেই তিনি আর অন্য নারীর মতো স্নেহ-আদরে বেড়ে উঠেন এবং যথাসময়ে যৌবনপ্রাপ্ত হন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার রীতি অনুসারে রাজকন্যাদের জন্য প্রচলিত স্বয়ংবর সভায় তিনি পিতার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ পঞ্চ পাণ্ডবদের অন্যতম ভ্রাতা অর্জুনকে বরমাল্য প্রদান করেন। স্বয়ংবর সভার বর্ণনা অনুযায়ী পাণ্ডবগণসহ বিভিন্ন স্থান থেকে আগত রাজপুত্রগণ উপযুক্ত স্ত্রীর পরিবর্তে দ্রৌপদীর অপরূপ দেহ-লাবণ্যে কামার্ত ও লোলুপ দৃষ্টিতে ভোগাকাঙ্ক্ষায় সদা ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রী প্রাপ্তি নয়, কাম পিপাসা নিবারণই যেন এখানে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। একজন নারীর জীবনে বিষয়টি কি লজ্জা ও অপমানের নয়? কিন্তু সমাজ-সংস্কারের ভয়ে দ্রৌপদী হয়তো নীরব থেকেছেন। অবশ্য স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদী কর্ণকে লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত দেখে উচ্চস্বরে বলেন যে, 'আমি সূতকে (কর্ণ) বরণ করব না।' তাঁর এই কথায় কর্ণ ক্রোধ এবং হাসির সঙ্গে সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করেন:

দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্।
সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ ॥
আদিপর্ব্ব, ১৮০/২৩[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

স্বয়ংবর সভায় অর্জুনের গলায় বরমাল্য দিলেও মাতা কুন্তীর উচ্চারিত বাক্যই পঞ্চপাণ্ডবের নিকট অলঙ্ঘনীয় হয়ে দেখা দেয়। ফলে দ্রৌপদীর একই সঙ্গে পঞ্চস্বামী লাভ হয়। অথচ বিষয়টি ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধ হলেও যুক্তিতর্ক দ্বারা তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মায়ের উচ্চারিত বাক্যকে শিরোধার্য করে পঞ্চপাণ্ডবের কোনো ভাই-ই যেমন অপারগতা প্রকাশ করেননি, তেমনি দ্রৌপদীও প্রতিবাদ করেননি। যুক্তি হিসেবে দ্রৌপদীর প্রতি পূর্বজন্মের মহাদেবের বরকেই স্বীকার্যসত্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে।

হস্তিনায় দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পট্টমহিষী হিসেবে অধিষ্ঠিতা হন। রাজমহিষী হিসেবে দ্রৌপদীর সময় কেটেছে স্বামীদের পালাক্রমে সঙ্গদান, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গৃহ পরিচর্যায়। এ সময়ে তিনি পঞ্চস্বামী কর্তৃক পাঁচজন পুত্র সন্তানেরও জন্ম দেন এবং যথাবিহিতভাবে তাদের ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যা ও অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। দ্রৌপদীর নিপুণ গৃহকর্মে পাণ্ডবদের গার্হস্থ্যজীবন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং তাঁর সদা সতর্ক পরিচর্যা ও বুদ্ধিমত্তা পঞ্চস্বামীর মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়াও সংসারের যাবতীয় আয়-ব্যয়, দাস-দাসী পরিচালনা, অতিথি-আপ্যায়ন, ব্রাহ্মণদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও সেবা সকল বিষয়েই তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, পিতৃগৃহেই তিনি ন্যায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। যা পরবর্তী জীবনে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। ফলে রাজমহিষী হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল আর দশজন নারীর তুলনায় ব্যতিক্রম।

রাজমহিষী হিসেবে দ্যূতক্রীড়ায় স্ত্রীকে পণ রাখার বিষয়টিকে তিনি স্বাভাবিকভাবে মেনে নেননি এবং বিশ্বাসও করেননি। তাই তো উন্মুক্ত রাজসভায় বস্ত্রহরণের সময় স্বামীসহ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের ভর্ৎসনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

কৌরববংশ ধ্বংস, দুর্যোধন ও দুঃশাসনের মৃত্যু, কীচকের মৃত্যু, জয়দ্রথকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর পঞ্চস্বামীর অনেকেই অন্য নারীকে বিবাহ করেন যা তিনি গ্রাহ্যই করেননি। শুধু সুভদ্রাকে বিবাহ করার জন্য অর্জুনের প্রতি তাঁর দারুণ অভিমান ছিল। বিভিন্ন সময়ে সমাজ-সংসার ও রাজকার্যে স্বামীদের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও তিনি করেছেন।

মহাভারতের নায়িকা তাই তেজস্বিনী, প্রতিবাদিনী, বিদুষী এবং সর্বোপরি বুদ্ধিমতী ও সবলা নারী। তিনি যেকোনো বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস রাখতেন এবং বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দ্বারা তার সফল

Dhaka University Institutional Repository

সমাধান করতে পারদর্শিনী ছিলেন। তৎকালীন পুরুষপ্রধান সমাজে দ্রৌপদী তাই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আর সে কারণেই প্রাতঃস্মরণীয়া।

হিড়িম্বা : হিড়িম্বা মানবী নয়; রাক্ষসী। তিনি দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের রাক্ষস-পত্নী, হিড়ম্ব রাক্ষসের ভগ্নী এবং ঘটোৎকচ-জননী। হিড়িম্বা প্রথম দর্শনেই ভীমসেনের প্রতি প্রেমাসক্তা হন এবং যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর কাছে তিনি তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। হিড়িম্বার সারল্য এবং কামার্তভাবের কারণে তাঁরা ভীমের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে হিড়িম্বার বিবাহের সম্মতি দেন। যুধিষ্ঠির শর্ত দেন যে, হিড়িম্বা সারাদিন ভীমের সঙ্গে থাকলেও সূর্যাস্তের পর ভাইদের নিকটে ভীমকে ফিরিয়ে দিবে। ভীমও শর্ত দেন যে, পুত্রের জন্মের পর তিনি আর হিড়িম্বার সঙ্গে থাকবেন না। হিড়িম্বা এই দুটি শর্তই মেনে নিয়ে ভীমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

যথাসময়ে ভীমের ঔরসে এবং তাঁর গর্ভে পুত্র ঘটোৎকচের জন্ম হয়। পুত্রের জন্মের পর হিড়িম্বা কোনো এক নির্জন বনে লোকালয় থেকে বহু দূরে এক পর্ণকুটিরে ঘটোৎকচকে লালন-পালন করেন। তিনি ঘটোৎকচকে পাণ্ডব-পরিবার সম্পর্কেই অবগত করেন এবং ঘটোৎকচও পিতার প্রয়োজনে স্মরণ করলে উপস্থিত থাকবেন। এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন। তাই পাণ্ডবদের যেকোনো প্রয়োজনে ঘটোৎকচের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ঘটোৎকচ ছিলেন রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ নেতা, ভয়ংকর বলশালী এবং মায়াবিদ্যার অধিকারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধে কৌরবপক্ষের সকল যোদ্ধাই পরাজিত হন। এমন কি, স্বয়ং ভীষ্ম তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ঘটোৎকচকে এভাবেই হিড়িম্বা তৈরি করেছিলেন। মায়ের কাছ থেকে পুত্র জেনেছিল পিতার শৌর্য-বীর্য, আর দায়িত্ব পালনে কর্তব্যনিষ্ঠার কথা। তিনি স্বামীর প্রতি ছিলেন অবিচল বিশ্বাসী, একান্ত পতিপ্রাণা। যে কারণে দ্বিতীয় কোনো পুরুষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না।

রাক্ষসী হলেও হিড়িম্বা সকল মানবিক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। সহজ-সরল জীবনের অধিকারিণী হিড়িম্বা জীবনে মিথ্যাচার করেননি কিংবা কপটতার আশ্রয় নেননি। তিনি তাঁর বিবাহের শর্তকে অনুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন, পুত্রের জন্মের পর স্বামীর সঙ্গে দেখা করেননি, কখনো হস্তিনাপুর বা ইন্দ্রপ্রস্থেও যাননি। কুন্তী এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ। স্বামীর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন কোমল স্বভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মাতৃভক্তি। হিড়িম্বা ছিলেন একান্তই নিঃসঙ্গ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের একের পর এক রাক্ষসবধের সংবাদ জেনেও তিনি বিচলিতবোধ করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন রাক্ষসসমাজে মানবের সঙ্গে রাক্ষসের বিবাহ সমাজ-গর্হিত হলেও তাঁর প্রেমের কাছে এটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি যে প্রিয়তমা নারীমূর্তি নিয়ে ভীমের প্রণয়প্রার্থিনী হয়েছিলেন।আজীবন একাকিনী নির্জন পর্ণকুটিরে থেকে সেই মানবীসত্তাই বজায় রেখেছেন। জীবনে লোভ-লালসা, হিংসা বা স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কখনো রাক্ষসমূর্তি ধারণ করেননি। স্বামী ভীমই ছিল তার একমাত্র কল্পনার বস্তু। একজন রাক্ষসীর এরূপ কল্যাণময়ী চিত্র আমাদের আকর্ষণ করে ও সহানুভূতি জাগ্রত করে।

উর্বশী : উর্বশী অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। অপ্সরারা অযোনি সম্ভূতা। সমুদ্রমন্থনের মাধ্যমে তাদের উৎপত্তি। এরা সাধারণত নারী হিসেবে গণ্য। কারণ দেবতা-দানব কেউ তাদের গ্রহণ করতে রাজি নন। স্বর্গ-মর্ত্য সকল স্থানে তাদের অবারিত দ্বার। এরা সকলেই স্বর্গের নর্তকী এবং গায়িকা। রূপ-লাবণ্যে, পোশাকে-আশাকে, সুগন্ধ-সুগন্ধিতে ভরপুর অত্যন্ত আকর্ষণীয়া, চিরযৌবনা, মোহিনীশক্তিতে দক্ষ এবং রতিকলায় অত্যন্ত পারদর্শিনী। এই বহুগুণে গুণান্বিতা অপ্সরাদের স্বর্গীয় দেবতারা নানাবিধ কার্যে নিয়োগ করে তাঁদের স্বার্থ উদ্ধার করেন।

পাণ্ডবদের বার বছর বনবাসকালের সময় অর্জুন অস্ত্রশিক্ষালাভের জন্য ইন্দ্রলোকে পিতার নিকট গমন করেন। অর্জুনকে গান্ধর্ব নৃত্য এবং কামকলা শিক্ষার জন্য ইন্দ্র নৃত্য পারদর্শিনী উর্বশীকে নিয়োগ করেন। এ সময় উর্বশী অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী অর্জুনকে রমণে আহ্বান জানালে অর্জুন তা প্রত্যাখ্যান করেন। অর্জুন উর্বশীকে বলেন যে, তিনি তার পূর্বপুরুষ পুরূরবার অঙ্কশায়িনী থাকার কারণে তার পক্ষে রমণে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, তিনি তার কাছে জননীর মতো এবং শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। তার রমণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে কামতাপিতা উর্বশী অপমানিতা বোধ করেন এবং ক্রোধোন্মত্তা হয়ে বলেন যে, তিনি তার পিতার অনুমতিক্রমে এবং কামার্তা হয়েই তার কাছে এসেছেন। কিন্তু তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তিনি অর্জুনকে অভিশাপ দেন যে, তিনি নর্তক হিসেবে সম্মানহীন ও পুরুষত্বহীন হয়ে পৃথিবীতে পরিচিত হবেন এবং নপুংসক হিসেবেই স্ত্রীলোকের মাঝে বসবাস করবেন :

> তব পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতাং স্বয়ঞ্চ গৃহমাগতাম্ ।
> যস্মান্মাং নাভিনন্দেথাঃ কামবাণবশং গতাম্ ॥
> তস্মাত্ত্বং নর্ত্তনঃ পার্থ! স্ত্রীমধ্যে মানবর্জ্জিতঃ।
> অপুমানিতি বিখ্যাতঃ ষণ্ডবদ্বিচরিষ্যসি ॥
>
> বনপর্ব্ব, ৩৯/৬৬-৬৭[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন পুত্রমুখে সকল বিষয় শুনে ইন্দ্র তাকে অভয় দিয়ে চিন্তিত না হওয়ার উপদেশ দেন এবং আরো বলেন যে, তাদের অজ্ঞাতবাসকালে এই অভিশাপ প্রয়োজনে আসবে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন বৃহন্নলারূপে উত্তরার নৃত্য-শিক্ষক হিসেবে বিরাট রাজ্যে আত্মগোপন করে থাকেন। বৃহন্নলা হওয়ার কারণে অর্জুন উত্তরাকে বিবাহ করেননি। বরং অজ্ঞাতবাস শেষে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ হলে নিজ-পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত আর সবাই যখন নিহত , তখন উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর অনাগত পুত্র Í যিনি কুরু-পাণ্ডবগোষ্ঠীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে পৃথিবীতে আগমনের প্রতিক্ষায়—সত্যবতীর অতি কাঙ্ক্ষিত হস্তিনাপুরের রাজ্যাধিকারী একমাত্র বংশধর। তাই বলা যায় যে, উর্বশীর মতো একজন অপ্সরার অভিশাপের ফলে অর্জুনের সাময়িক শারীরিক পরিবর্তনে মহাভারতের মূলকাহিনির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে।

উলূপী : উলূপী মানবী নয়; নাগ তথা সর্পবংশীয়া। উলূপী ঐরাবত বংশোদ্ভূত নাগরাজ 'কৌরব্য'–এর কন্যা, অর্জুন-পত্নী এবং বীর যোদ্ধা ইরাবাণ-জননী। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, অকুণ্ঠিতা ও সর্বোপরি পতিপরায়ণা। মহাভারতে দেখা যায়, পাণ্ডবদের সঙ্গে রাক্ষসদের যেমনি, ঠিক নাগজাতির সঙ্গেও তেমনি সম্পর্ক ছিল।

অর্জুন একবার দাম্পত্যজীবনের নিয়ম লঙ্ঘন করলে স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য বনবাসে গমন করেন। সেখানে তিনি অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাগ-যজ্ঞাদি পালন করেন। একদা অর্জুন গঙ্গায় স্নান করে পিতৃলোকের তর্পণ শেষে হোম করার জন্য উপরে উঠার সময় কামার্তা নাগকন্যা উলূপী তাকে টেনে জলের ভিতর পায়াল মহাপ্রাসাদে নিয়ে যান এবং রমণে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান করেন। অর্জুন তাঁর ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করলে নাগকন্যা উত্তরে বলেন যে, তিনি কামার্তা, কামনায় পীড়িতা এবং পীড়িতের মনোবাসনা পূর্ণ করা ধর্মসিদ্ধÍইত্যাদি নানা প্রকার যুক্তি দিয়ে অর্জুনকে সম্মত করান এবং অর্জুনের সঙ্গে রমণে লিপ্ত হন। অর্জুনও ধর্মরক্ষার্থে তার সঙ্গে রমণে লিপ্ত হন। রাত্রিবাসের পর অর্জুন সেখান থেকে পুনরায় গঙ্গাতীরে চলে আসেন। তিনি অর্জুনকে এই বলে বর দেন যে, সমস্ত জলই তাঁর (অর্জুনের) অজেয় হবে, সর্বপ্রকার জলজন্তু তাঁর বশীভূত হবে।

অর্জুনের ঔরসে উলূপীর গর্ভে ইরাবাণের জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইরাবাণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শকুনির ছয় ভাইকে হত্যা করেন এবং অলম্বুষ নামক রাক্ষসের হাতে প্রাণ দেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে

বভ্রুবাহনের নিকট অর্জুন নিহত হলে পতিপ্রাণা উলূপী অর্জুনের প্রাণদান করেন এবং অর্জুনের জীবনে চিরস্মরণীয়া ও অমর হয়ে থাকেন।

উলূপীর উপর্যুক্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, একজন সর্পকন্যার সঙ্গে মানুষের প্রেম কত গভীর এবং স্থায়ী হয়।উলূপীর জীবন তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একথা ঠিক, উলূপী অর্জুনের রূপ-লাবণ্যে কামার্তা হয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাকে স্বামী হিসেবেই বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিঃস্বার্থভাবে আজীবন অর্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে ধর্মানুযায়ী পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধে পুত্রকে উৎসাহিত করেন এবং যুদ্ধে নিহত অর্জুনকে প্রাণদান করে সর্পজাত হয়েও স্ত্রীর ভূমিকায় চির উজ্জ্বল হয়ে আছেন। আর এখানেই তার নারীজীবনের সার্থকতা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের আলোচনায় থাকবে মহাভারতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্র। এসব নারীচরিত্র আলোচনায় আমরা তাদের অবস্থা ও অবস্থানের আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ করেছি যে, প্রতিটি নারীচরিত্র নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দিক থেকে বহু জটিলতায় পরিপূর্ণ। তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো নারী নীরব-নিভৃতে জীবনযাপন করেছেন। আবার কোনো কোনো নারী সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে নিজ অবস্থান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। আবার কোনো কোনো নারী প্রতিশোধ স্পৃহায় পরজন্ম কামনা করে সেই জন্মে প্রতিশোধও নিয়েছেন। মহাভারতের নারীদের এই বিচিত্র ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। মহাভারতের নারীচরিত্রের নারীজীবনের এরূপ অবস্থার ক্ষেত্রে কখনো পূর্বজীবনের অভিশাপ; কখনো ধর্মীয় বিধান; কখনো ভাগ্যের কথা বলে তাদের অবদমিত রাখা হয়েছে। তবে এসব ছাড়াও কখনো কখনো স্বামী নির্বাচনে; কখনো কখনো স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছাও নারীদের জীবনে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনা একেবারেই গৌণ।

মহাভারতের নারীচরিত্রের মধ্যে অম্বার চরিত্রটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর নারীজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় শুধুই পুরুষের অবমৃশ্যকারিতার জন্য। তিনি দৈববাণী মানতে নারাজ। প্রতিবাদেও দৃঢ়চিত্ত। তারপরেও তিনি সমাজ, সংসার, পুরুষ এবং দৈব-শক্তির কাছে ক্রীড়ানকে পরিণত হয়ে তার প্রতিশোধ স্পৃহাকে জন্মান্তরে নিয়ে গিয়ে জয়ী হন। তৎকালীন নারীসমাজের জন্য যেমন, তেমনি বর্তমান নারীসমাজের জন্যও অম্বা পথপ্রদর্শক হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজপরিবারে কুন্তীর জন্ম হলেও তাঁর জীবনপ্রবাহ নিতান্তই নিঃসঙ্গ ও দুঃখে অতিবাহিত হয়। সুখ বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায়Iকোনোদিনই তা তাঁর ভাগ্যে হয়নি। প্রথম সন্তানের লালন-পালন ও দাম্পত্যজীবনের সুখভোগ থেকে বঞ্চিতা, অজ্ঞাতবাস এবং শেষ পর্যন্ত তপোবনে অগ্নিদাহে কুন্তীর নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তিI এসবই কুন্তীর জন্য আমাদের করুণার উদ্রেক করে।

পুরুষশাসিত সমাজের যত অত্যাচার সবই ঘটেছে মহাভারতের মহানায়িকা মহীয়সী দ্রৌপদীর উপর। পুরুষের লোভ, লালসা, কামনা, বস্ত্রহরণের লজ্জা ও লাঞ্ছনা সবই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছেI হয় পিতা, না হয় স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে। তবে তাঁর জীবনের সার্থকতা এই, তিনি স্বামী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের একান্ত সঙ্গিনী ছিলেন। কখনো সঙ্গচ্যুতা হননি। রাক্ষসী হিড়িম্বা এবং নাগকন্যা উলূপী এক অনন্যা প্রেমময়ী নারী। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকে বিবাহ করার কারণে আত্মীয়-স্বজন হিড়িম্বাকে ত্যাগ করেছে, হয়েছে সমাজচ্যুতা। তবুও স্বামীর প্রতি অনুরাগ বিন্দুমাত্র কমেনি। তিনি পুত্রকে স্বামীর মতোই গড়ে তুলেছিলেন।

রামায়ণের মতো মহাভারতও এক বিশাল ক্যানভাসে রচিত। দেব-দেবী, মানব-মানবী, রাক্ষস-রাক্ষসী, অপ্সরা, নাগবংশীয় ইত্যাদি প্রতিনিধি সমন্বয়ে নানা শাখা-উপশাখায় মহাভারতের আলোচনা পরিব্যাপ্ত। জটিল মানবসমাজের বিচিত্র ও জটিল কাহিনিকে কবি কল্পনায় বহুমুখী বিষয়ের অবতারণা করেছেন। মানুষ যেমন কামনা-বাসনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তথা জৈবিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ, মহাভারতের কবিও তেমনি মানুষের মতোই দেব-দেবী, অপ্সরা, রাক্ষস-রাক্ষসী, সর্প ইত্যাদিকে জৈবিক আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ করে মানবসমাজের সাথে একীভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, মানবসমাজের সঙ্গে এসব মানবেতর সমাজের মেলবন্ধন এবং উভয় সমাজের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নায় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর বিষয়। মানব ও মানবেতর সমাজের চরিত্র চিত্রণে যে স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা আছে, তা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই এসব সমস্যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কখনো পূর্বজন্ম, কখনো দৈব ঘটনা, কখনো বা মানবেতর প্রাণীর আগমন ঘটিয়ে তার একটি সহজসাধ্য সমাধান দেওয়ার প্রয়াস কবির কল্পনায় কাজ করেছে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি, মহাভারতে নারীজীবনের নানা বাধা-নিষেধ, সমাজ-সংস্কারের আবদ্ধতা তাদের স্বাধীনজীবনকে বাধাগ্রস্ত করলেও নারীজীবনের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা যুগ যুগ ধরে নারীদের অণুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ আমরা ইতোপূর্বে বৈদিকসাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারতে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। রামায়ণ রচনা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচিত হয়—যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মনুসংহিতা*, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, বাৎসায়ণের *কামসূত্র*, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ইত্যাদি। এর কিছুকাল পরেই শুরু হয় পুরাণ সাহিত্যের রচনা। এই রচনাগুলোর মধ্যে *মনুসংহিতা* 'ধর্মশাস্ত্র' হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করে এবং স্থান-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে বিপুল জনমানুষে সমাদৃত হয়।

মনুসংহিতা মূলত স্মৃতিশাস্ত্র এবং এর রচনাকাল খ্রি.পূ. ২য় শতক থেকে খ্রিষ্টাব্দ ২য় শতকের মধ্যে। মনুসংহিতার রচয়িতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও 'মনু'র নামের সঙ্গে মনুসংহিতার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পণ্ডিতদের অভিমত মনুসংহিতাতেই সমস্ত বেদার্থ বিদ্যমান। তাই ভারতবর্ষীয় ধর্মসাহিত্যে বেদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পর আর্থ-সামাজিক নির্দেশনা হিসেবে মনুসংহিতার গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি ধর্মশাস্ত্র হিসেবে মনুসংহিতার স্থান সর্বোচ্চ। ভারতবর্ষের শ্রুতি ও স্মৃতির ধারাবাহিকতায় বেদের সূক্ষ ও গূঢ় বিষয়গুলো সহজ উপলব্ধির জন্য উপনিষদ-পরবর্তীকালে মনুসংহিতার মতো ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়। তাই অনেকে মনুসংহিতাকে সমাজ থেকে উদ্ভূত আইনশাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন।

মনুসংহিতা'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম। তাই যা কিছু ধর্ম নামে অভিহিত, তাই এই শাস্ত্রে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং, ধর্ম বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য অন্যকোনো শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল না হলেও চলে। *মনুসংহিতা* গ্রন্থটি বারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর প্রথম অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় সৃষ্টিপ্রকরণ; দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় ধর্মানুষ্ঠান প্রকরণ; তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় ধর্ম-সংস্কার-প্রকরণ; চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যাশ্রম-ধর্মপ্রকরণ; পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্যবিষয় ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেক, অশৌচ নির্ণয়, দ্রব্যশুদ্ধি ও যোষিদ্ধর্ম; ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় আশ্রমধর্মানুশাসন; সপ্তম অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় রাজধর্ম ও রাজ্যরক্ষার্থ উপায়াদিবর্ণন; অষ্টম অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় রাষ্ট্রনীতি; নবম অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম, দায়বিভাগ, দ্যূতক্রীড়া, চৌর্যাদি-নিরাকরণোপায় ও বৈশ্য-শূদ্রের কর্তব্য; দশম অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় সমাজনীতি: সঙ্করজাতির উৎপত্তি, চারবর্ণের আপৎকালে বৃত্তিবিধান; একাদশ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় মোক্ষধর্ম।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মহাকাব্য রামায়ণ রচনার শেষ পর্যায়ে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* রচিত হয়—যার রচনাকাল আনুমানিক খ্রি.পূ. ৩য় শতক। (মতান্তরে খ্রি.পূ. ৪র্থ শতক)। কৌটিল্য চার্ণক্য এবং বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। জানা যায়, তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রাথমিক শিক্ষক এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, রাজশাস্ত্র, মানব প্রকৃতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে *অর্থশাস্ত্র* ও *নীতিশাস্ত্র* অন্যতম। পণ্ডিতগণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে রাজনীতি, রাজশাসন প্রণালি এবং দণ্ডনীতি বিষয়ক গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। অনেকেই তাঁকে আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের জনক মেকায়েভেলির[৬৪] সঙ্গে তুলনা করেন।

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থটি পনেরটি অধিকরণে বিভক্ত এবং প্রতিটি অধিকরণে একাধিক অধ্যায় রয়েছে। গ্রন্থটির অধিকরণের বিষয়বস্তুগুলো নিম্নরূপ :

প্রথম অধিকরণ: বিনয়াধিকারিক; দ্বিতীয় অধিকরণ: অধ্যক্ষ প্রচার; তৃতীয় অধিকরণ: ধর্মস্থীয়; চতুর্থ অধিকরণ: কণ্টকশোধন; পঞ্চম অধিকরণ: যোগবৃত্ত; ষষ্ঠ অধিকরণ: মণ্ডলযোনি; সপ্তম অধিকরণ: ষাড়্গুণ্য; অষ্টম অধিকরণ: ব্যসনাধিকারিক; নবম অধিকরণ: অভিযাস্যৎকর্ম; দশম অধিকরণ: সাংগ্রামিক; একাদশ অধিকরণ: সংঘবৃত্ত; দ্বাদশ অধিকরণ: আবলীয়স; ত্রয়োদশ অধিকরণ: দুর্গলম্ভোপায়; চতুর্দশ অধিকরণ: ঔপনিষদিক এবং পঞ্চদশ অধিকরণ: তন্ত্রযুক্তি।

এই গ্রন্থে একদিকে যেমন রয়েছে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আর্থ-সামজিক ব্যবস্থা এবং ধর্মের নানা তাত্ত্বিক আলোচনা, তেমনি রয়েছে জীব-জগৎ ও উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্ক, খনিজ ও ধাতু জাতীয় পদার্থের ব্যবহার, ভূতত্ত্ব, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ক নানা আলোচনা।

আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভের মূলপ্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে *মনুসংহিতা* ও কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* নারীর অবস্থা ও অবস্থান তথা তৎকালীন সমাজে নারীর পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থান নিয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হব।

***মনুসংহিতা* :** মনুসংহিতায় নারীর অবস্থা ও অবস্থান আলোচনার পূর্বে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে যে, মনু নারীদের সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার মনোভাবই পোষণ করেছেন। মনু তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে যেমন নারীদের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয় রোধে নারীদের সম্পর্কে কোনো কোনো জায়গায় নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। মূলত মনুর উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

সমাজব্যবস্থার সংস্কার এবং একটি সুস্থিত সমাজব্যবস্থা গঠন। এজন্য আমরা দেখতে পাই, তিনি তাঁর সংহিতা প্রণয়নে ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক, নৈতিক এবং শাস্ত্রানুগ ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজকে একটি সুশৃঙ্খল শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই প্রথম অধ্যায়ে নর-নারীর সৃষ্টির বর্ণনায় তিনি লিঙ্গ-সমতার (Gender equality) কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর নিজ দেহকে দ্বিধাবিভক্ত করে নারী ও পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেন এবং এই নারীর গর্ভেই বিরাটের জন্ম :

> দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
> অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভু ॥
>
> *মনুসংহিতা*, ১/৩২[৬৫]

উপর্যুক্ত শ্লোক থেকে এই কথায়ই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি, তেমনি নারীও ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে নারী পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ার কারণে নারীদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

পারিবারিক অবস্থা ও অবস্থান

আমরা বেদের আলোচনায় দেখেছি যে, বেদে পুত্রসন্তান জন্মদানের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনু পুত্র বা কন্যাসন্তান জন্মদানের ব্যাপারে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব পোষণ করেননি। তাঁর কাছে পুত্র এবং কন্যা সমান মর্যাদার অধিকারী। মনু পিতৃগৃহে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। যে পিতা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠাদের বিবাহ দেন সেই পিতা যাগ-যজ্ঞের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন এবং সামাজিকভাবে অসম্মানিত হবেন।[৬৬] শুধু তাই নয়, মনু বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্বেই কন্যাদের ভোজনের নির্দেশ দেন।[৬৭] শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যদি মুখ্য শ্রোত্রিয়াদিগকে ভোজন করানোর জন্য না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে মনু মাতামহ, মাতুল, ভাগ্নে, দৌহিত্র, জামাতা প্রমুখের ভোজন করানো বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ করেন।[৬৮] উল্লেখ্য, এখানে মনু কন্যাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিরই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

মনুসংহিতায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কন্যাদের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতাই হবে প্রকৃত অভিভাবক এবং রক্ষাকর্তা (protector)। পিতার প্রধান কাজ হচ্ছে কন্যার সঠিক বয়সে যথোপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা। যদি কোনো পিতা তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি সমাজে অবজ্ঞার পাত্র হবেন। কিন্তু উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গেলে মনু কন্যাদের অবিবাহিতা রাখার কথা

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেন। এ থেকে মনুর নারীদের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার মনোভাবই ব্যক্ত হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা-বিরোধী হলেও তিনি নারী-বিবাহ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, পিতৃগৃহে কন্যা ঋতুমতী হওয়ার তিন বছরের মধ্যে যদি পিতা-মাতা বিবাহের ব্যবস্থা না করেন, তবে কন্যা নিজেই পছন্দানুযায়ী স্বামী নির্বাচন করার অধিকারিণী হবেন এবং এরূপ বিবাহে কন্যার কোনো পাপ হবে না। অবশ্য এরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা এবং ভায়ের কাছ থেকে কোনো প্রকার অলংকারাদি ঐ কন্যা গ্রহণ করতে পারবেন না।

মনু পিতৃগৃহে কন্যাদেরকে যথাযথ সম্মান দেওয়ার লক্ষ্যে সমভাবে আদর-আপ্যায়নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কন্যারা পিতৃগৃহে যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করলে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। অন্যথায় সেই সংসারের সকল প্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মই নিষ্ফল হয়:

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥
মনুসংহিতা, ৩/৫৬[৬৯]

মনু অন্যত্র বলেন, যে সকল পরিবারে কন্যাসহ পত্নী, পুত্রবধূ কোনো কারণে দুঃখিতা হয়ে পরিতাপ করেন, সেই পরিবার অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিপরীতক্রমে তারা যদি দুঃখিতা না হয়ে পরিতাপ না করেন, সেই পরিবারের উন্নতিসাধিত হয়। সুতরাং, সংসারের উন্নতিকল্পে স্ত্রীলোকের সন্তুষ্টি বিধান অপরিহার্য।[৭০]

মনুসংহিতায় মনু যেমন পিতৃগৃহে কন্যাদের যথোপযুক্ত সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা বলেছেন, তেমনি আবার এসবের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছেন। অনেকের মতে, মনুর এরূপ নেতিবাচক অবস্থানের কারণ সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়ন। যেমন, কন্যা সম্পর্কে মনু তাদের সর্বাবস্থায় অধীনস্থ রাখার কথা বলেন। কন্যারা পিতৃগৃহে পিতা কর্তৃক, বিয়ের পর যৌবনকালে স্বামী কর্তৃক এবং বৃদ্ধ অবস্থায় পুত্রের অধীনস্থ থাকেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মনু স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন:

পিতা রক্ষিত কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥
মনুসংহিতা, ৯/৩[৭১]

মনু মনে করেন, বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকের একমাত্র বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। নারী শুধু স্বামীর সেবা করেই দিন যাপন করবেন। শুধু পুরুষের অনুগামী হওয়াই তার নিয়তি। কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর জীবনযাপন করার অধিকার নেই। এছাড়াও নারীকে ধর্ম-শাস্ত্রাদির অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। এভাবে মনু নারীচরিত্রের নেতিবাচক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাছাড়া কুমারীত্ব, সতীত্ব ইত্যাদি নষ্ট করার ক্ষেত্রে পুরুষদের শাস্তি বিধানের কথা বলা হলেও নারীকেই প্রধানত এ ব্যাপারে দায়ী করা হয়েছে।

মনুসংহিতায় বিবাহিতা নারী এবং পারিবারিক জীবনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিবাহিতা নারীকে সৌভাগ্যের দেবী হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী এবং স্ত্রী ব্যতীত স্বামী অপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন শাশ্বত এবং চিরন্তন—স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা এই মেলবন্ধন সৃষ্টি করেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর জন্য ঈশ্বরের উপহারস্বরূপ এবং স্বামীর জন্মজন্মান্তরের সুকর্মের ফলেই স্ত্রীলাভ হয়। সন্তান উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিবারের প্রাত্যহিক ও ধর্মীয় কাজকর্ম, অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনদের সেবা, ভিক্ষাদান ইত্যাদি স্ত্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। স্ত্রীরা গৃহের দীপ্তিস্বরূপ, তারাই পরিবারের সৌভাগ্য এবং আশীর্বাদ বয়ে আনেন। একটি পরিবারে ধনসম্পদকে যেমন অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং পবিত্রভাবে রক্ষা করা হয়, স্ত্রীদেরও একইভাবে সেই মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করা উচিত। স্ত্রীরাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সকল সুখের উৎস। সুতরাং, স্ত্রীদের সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা, তাদের সঙ্গে সমঝোতা রাখা এবং সানুরাগ-সহযোগ ইত্যাদি সাংসারিক মঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। মনুসংহিতার বিভিন্ন শ্লোকে বিবাহিতা নারী সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। আমরা নিম্নে এরূপ দু-একটি শ্লোকের উল্লেখ করছি:

> এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ ।
> বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥
> *মনুসংহিতা*, ৯/৪৫[৭২]

> দেবদত্তাং পতির্ভার্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
> তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্ ॥
> *মনুসংহিতা*, ৯/৯৫[৭৩]

মনুসংহিতায় পারিবারিক কল্যাণ অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত এবং এই পারিবারিক কল্যাণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে অতীব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় তাই বলা হয়েছে, যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, সেই পরিবারের নিশ্চিতভাবে কল্যাণসাধিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যে মনুসংহিতায় বিবাহিতা নারীকে এত উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে সেই বিবাহিতা নারী সম্পর্কেই মনু নানা প্রকার নেতিবাচক মন্তব্য করে নারীদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। মনুসংহিতায় শুধু নারীকেই কামের আধার হিসেবে বিবেচনা করে নারীর উপরই সকল প্রকার দোষ আরোপ করা হয়েছে। যেমন, মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, এই পার্থিবজগতে সকল পুরুষকে দূষিত করাই নারীর প্রকৃতিগত স্বভাব। তাই পণ্ডিতদের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনোই প্রমত্ত এবং অসাবধান না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্ত্রীজাতিকে গৃহসজ্জা উপকরণ হিসেবে তুলনা করা হয়েছে এবং তাদের সর্বদা নানা রকম বস্ত্র-অলংকারাদি দ্বারা সুশোভিত থেকে পতিকে আকর্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। কারণ সাজ-সজ্জায় ভূষিত না হলে পতিরা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত না হওয়ায় সন্তান উৎপাদনও সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়, স্ত্রীদের একমাত্র কাজ স্বামীদের দেবতার মতো সেবা করা, সে স্বামী যদি দুশ্চরিত্র কিংবা পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনে মিলিত হয় বা কোনো গুণের অধিকারী নাও হয়। এরপরও স্ত্রীজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: কোনো স্ত্রী যদি স্বামীকে অবহেলা করে কিংবা ব্যভিচারিণী হয়, তাহলে সেই স্ত্রী শুধু সংসারে নিন্দিতই হবেন না; কুষ্ঠ-যক্ষাদির মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করবেন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন। এই জগৎ-সংসারে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর অন্য কিছু নেই; স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম করার অধিকার নেই এবং একমাত্র স্বামী-সেবার মাধ্যমেই তাঁর সর্বপ্রাপ্তি সম্ভব।

এভাবেই মনুসংহিতায় বিভিন্ন শ্লোকে একের পর এক নারীকে কামনার বস্তু, মর্যাদাহীন এবং অধীনস্থ রাখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নিম্নে এরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হলো:

ব্যভিচারাত্তু ভর্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্ ।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে ॥
মনুসংহিতা, ৫/১৬৪[৭৪]

মনু স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনকে অত্যন্ত পবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মেলবন্ধন জন্মজন্মান্তরে অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে। বিবাহিতজীবনে স্বামীর জীবিতাবস্থায় কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাবস্থায় স্ত্রীর এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যা স্বামীর মনোকষ্টের কারণ হয়। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি বিধবাদের জন্য কঠোর নিয়ম পালন, আত্মসংযম ও সতীত্ব রক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু বিধবাদের দীর্ঘজীবন লাভের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেননি। মনু বিধবা বিবাহে ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাই নয়, পুণ্যবতী নারীদের দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অনুমোদন দেননি। তিনি ধর্মীয় কারণে পুত্রসন্তান জন্মদানের ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে এবং সদাচারশালিনী থেকে বিধবারা স্বর্গে গমন করতে পারবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই বিধবাদের পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুত্রজন্মদানের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[৭৫] তবে শ্রাদ্ধক্রিয়াদির ব্যাপারে বিধবারা দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারবেন বলে মনে করেন। তিনি সন্তান-উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'নিয়োগ' প্রথারও বিরোধী ছিলেন।

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিতে মাতার স্থান সর্বোচ্চ শিখরে এবং মাতা সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার পাত্রী। মনুও তাঁর মনুসংহিতায় এই ভারতীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন। তিনি মাকে তুলনা করেছেন সর্বংসহা পৃথিবীর সঙ্গে। তাঁর মতে, মা সন্তানের জন্য সব রকম দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করেন। সে-কারণেই মাতৃঋণ অপরিশোধ্য তথা শত শত বছরে শত শত জন্মেও সেই ঋণ শোধ হবার নয়। এর পাশাপাশি তিনি পুত্র কর্তৃক মাতাকে পরিত্যাজ্যের বিষয়টিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেন এবং এরূপ পুত্রকে সকল প্রকার সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্রিয়াদি থেকে বিরত রাখার পরামর্শ দেন। এছাড়া মায়ের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের অপবাদ এবং অপপ্রচারকেও মনু শাস্তিযোগ্য বলে মনে করেছেন। শুধু তাই নয়, মাতৃত্বকে মনু নারীজীবনের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, মা হওয়ার জন্যই স্ত্রীজাতির জন্ম। তিনি গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে কর থেকে অব্যাহতিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীজাতিকে তিনি অশুদ্ধ এবং তাদের নিকট থেকে ব্রাহ্মণদের খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেননি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মনুসংহিতায় মনু সার্বিকভাবে নারীজাতি সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়প্রকার মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। আমরা মনুসংহিতায় আলোচিত নারীদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাদের কন্যা, বধূ, মাতা, বিধবা স্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করে আলোচনা করেছি। এসব আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, মনু সার্বিকভাবে নারীদের যেমন প্রশংসা করেছেন, সম্মানসূচক উক্তি করেছেন; আবার তেমনি তাদের অসম্মান এবং অমর্যাদাও প্রদর্শন করেছেন। মনুর এই বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে পরস্পর বিরোধী ভাষ্য লক্ষ করা যায়। তবে আমরা মনে করি মনু পারিবারিক কল্যাণ ও মঙ্গলের স্বার্থে ইতিবাচকদিকের পাশাপাশি নেতিবাচকদিক উল্লেখ করে ভারসাম্যমূলক অবস্থায় উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান

মনু বিরচিত মনুসংহিতায় উল্লিখিত সমাজব্যবস্থা ছিল বর্ণাশ্রমভিত্তিক। বর্ণ ছিল চারটি : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং আশ্রমও ছিল চারটি : ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। তাঁর সমাজব্যবস্থায় বর্ণ ও আশ্রম ছিল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। নারীরাও সমাজে এই চারটি বর্ণের ও আশ্রমের অন্তর্গত ছিল। তবে এই বর্ণাশ্রমে পুরুষের কথা যত সবিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, নারীদের ক্ষেত্রে মনু তেমনটি উল্লেখ করেননি। এই সমাজব্যবস্থায় নারীদের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং সকল প্রকার সামাজিক অধিকার ভোগেরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তবে স্থান-কাল বিশেষে সমাজের মঙ্গল ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নারীদের উপর বিশেষ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে—যাকে আমরা ইতোমধ্যে নারীজাতি সম্পর্কে মনুর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উল্লেখ করেছি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মনু পুরুষ ও নারী উভয়কেই ঈশ্বরের অংশ হিসেবে মনে করেন। সমাজে পুরুষ যেমন নিজ জীবনরক্ষায় যত্নবান হবেন, ঠিক নারীরাও নিজ আত্মরক্ষায় যত্নবতী হবেন। ফলে দেখা যায়, মনু স্ত্রীজাতির নিরাপত্তা বিধানে স্ত্রীজাতির নিজস্ব সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে মনু মনে করেন, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করা পরমধর্ম এবং পরম কর্তব্য। তাই সকল স্বামীদের উচিত নিজ স্ত্রীকে যত্নসহকারে রক্ষা করা। মনু সমাজে বহু বিবাহকে স্বীকৃতি দেননি। এটা যেমন নারীর ক্ষেত্রে, তেমনি পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, তিনি বহুবিবাহকে পাপ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি মনে করেন, স্বামী-স্ত্রী আমৃত্যু একসঙ্গে বসবাস করবেন। এটি হচ্ছে নারী-পুরুষের পরমধর্ম। মনুসংহিতায় যৌতুক প্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মনুর মতে, যৌতুক প্রথা বিয়ের নীতি বিরুদ্ধ এবং যৌতুকমুক্ত বিবাহ হচ্ছে 'আসুর-বিবাহ'।[৭৬] মনু কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার পিতা শুল্ক বা যৌতুক গ্রহণ করতে পারবেন না বলে উল্লেখ করেন। লোভবশে তিনি যদি শুল্ক গ্রহণ করেন, তাহলে সেটি হবে সন্তান বিক্রয়ের সমান:

> ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
> গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী।
>
> *মনুসংহিতা*, ৩/৫১[৭৭]

আবার তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, শূদ্রও কন্যাদানের ক্ষেত্রে শুল্ক গ্রহণ করবেন না। কারণ যে- কোনো প্রকার শুল্ক গ্রহণে প্রচ্ছন্নভাবে কন্যা বিক্রয় করা হয়। মনু নারীদের স্ত্রীধন অপহরণের

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিতা করে বলেন যে, কোনো আত্মীয়-স্বজন যদি তাদের ধন-সম্পদ অপহরণ করেন, তবে তারা অধোগতি প্রাপ্ত হবেন।[৭৮]

মনু স্ত্রীজাতির ক্ষতিকারকদের কঠোর শাস্তি বিধানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। যেমন, তিনি নারী অপহরণকারীদের মৃত্যুদণ্ড, নারী, শিশু ও গুণবান পণ্ডিতদের হত্যাকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান এবং সর্বোপরি নারীধর্ষণকারী, উত্যক্তকারী ও ব্যভিচারে প্ররোচিতকারীকে এমন শাস্তি প্রদানের উল্লেখ করেন যে, যা দেখে অন্যেরা ভীত হন এবং এরূপ কাজ করতে সাহস না পান। শুধু তাই নয়, স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করাকেও তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করেন। এছাড়া ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত যদি কোনো ব্যক্তি মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ করেন, তাকেও কঠোর দণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। তিনি স্ত্রী-বিক্রয় বা পরিত্যাগ করাকেও নিরুৎসাহিত করেন।

মনুর সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। যেমন, যানবাহনে বয়স্ক ব্যক্তি, ক্লান্ত ব্যক্তি, রাজা, স্নাতক এবং স্ত্রীলোকদের পথ ছেড়ে দেওয়া কর্তব্য বলে বিধান দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীজাতির সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানেও মনু সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তাই তিনি বলেন, স্বামী প্রবাসী হলে তাকে পত্নীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে যেতে হবে। এভাবে মনু তাঁর মনুসংহিতায় স্ত্রীজাতির সামাজিক নিরাপত্তার কথা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন।

মনুসংহিতার যুগে সমাজে পতিতা প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু মনু পতিতা প্রথাকে সমর্থন করেননি। উপরন্তু তিনি এই প্রথাকে সামাজিক অশুভ কাজ হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যা করাও অনুমোদন করেছেন। শুধু তাই নয়, পতিতাদের মৃত্যুর পর ধর্মীয়ভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার অনুমোদনও দেননি।

মনুসংহিতায় শিক্ষাব্যবস্থারও একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিষ্ট ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাসভায় সমবেত হয়ে নিয়মিত শাস্ত্রাদি আলোচনা করতেন। মনু বলেন, 'বেদোঽখিলো ধর্মমূলং...' অর্থাৎ সমগ্র বেদ ধর্মের মূল তথা প্রমাণস্বরূপ। সুতরাং, মনুসংহিতায় বেদকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বেদ থেকে নানা শিক্ষণীয় বিষয়ের কথাও বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যে মনুসংহিতায় শিক্ষাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—সেখানে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে কন্যাকে সযত্নে পালন করা এবং শিক্ষা দেওয়া যে কর্তব্য তাতে মনু কোনো আপত্তি করেননি। আমরা লক্ষ করেছি যে, মনু স্ত্রীজাতির ক্ষেত্রে বিবাহ, স্বামী সেবা এবং গৃহকর্মকে

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রাধিকার দিলেও স্ত্রীজাতিকে মূর্খ করে রাখার বিধান কোথাও উল্লেখ করেননি। মনু পুরুষের ন্যায় স্ত্রীরও দেহশুদ্ধির জন্য জাতকর্ম জাতীয় সংস্কার যথাসময়ে ও যথাক্রমে সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই সংস্কার হবে মন্ত্রপাঠহীন। এর কারণ হিসেবে সাধারণত বলা হয়, স্ত্রীজাতির বিশেষ শারীরিক গঠন যথাযথভাবে বেদ উচ্চারণের অনুপযোগী। মনু মন্ত্রশক্তি মেনে চলতেন বিধায় স্ত্রী জাতিসহ শূদ্রদের বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করতে নিষেধ করেন। মনুসংহিতায় নারীদের যেমন কন্যা, স্ত্রী, মাতা, পতিতা ইত্যাদি হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে—তেমনি তাদের দাসী হিসেবেও দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ মনু তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীদের দাসকার্যে নিয়োজিত থাকার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। দাসীরা মূলত রাজন্যবর্গের সেবায় নিয়োজিত থাকত এবং তাদের পদমর্যাদাও বিভিন্ন হতো। আর এই পদমর্যাদা অনুসারে বেতন নির্ধারিত হতো। দাসীদের নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল না। রাজার আদেশ-নির্দেশই তাদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো।

যে মনুসংহিতায় নারীকে এত উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে, সেই *মনুসংহিতায়* আবার নানাভাবে নানাক্ষেত্রে নারীদের শৃঙ্খলিতও করা হয়েছে। যেমন, নবম অধ্যায়ের ২নং শ্লোকে বলা হয়েছে: নারীদের দিবারাত্রি পুরুষের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে এবং নারী কখনো স্বাধীন হবেন না। আবার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪৭নং শ্লোকে বলা হয়েছে: কোনো স্ত্রীলোক কখনো স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারবেন না, এমন কি নিজ গৃহেও নয়।

মনুসংহিতার এই আপাত অসংগতির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমরা বলেছি যে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে মনু স্ত্রীজাতি সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার মন্তব্যই করেছেন। সমাজের কল্যাণ বিবেচনায় আমরা মনুর স্ত্রীজাতির ইতিবাচক দিকের প্রতিই গুরুত্বারোপের চেষ্টা করেছি।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও অবস্থান

মনুসংহিতায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক বিবরণ পাওয়া যায়। এই অর্থনীতির মুখ্যভাগ ছিল কৃষিনির্ভর। ফলে মনুসংহিতার নানা উপলক্ষ্য এবং নানা প্রসঙ্গে কৃষির কথা বলা হয়েছে। মূলত বৈশ্যদের দ্বারা এই কৃষিকাজ পরিচালিত হতো। তবে বৈদিকযুগের মতো মনুসংহিতার যুগেও নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। বৈদিকযুগে নারীরা গৃহকর্ম ছাড়াও

নানা রকম কাজ যেমন, পশম বুনন, পশুপালন এবং অন্যান্য শিল্প কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এরূপ কাজ থেকে তারা কিছু উপার্জন করতেন কিনা তা জানা যায় না।

মনুসংহিতার যুগেও নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা কিংবা অন্য কোনো পেশায় যুক্ত থেকে অর্থ উপার্জনের বিষয়টিও জানা যায় না। তাই আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মনুসংহিতায় নারীরা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতার অধীন, বিবাহিতা অবস্থায় যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন ছিল। নারীরা কোনো প্রকার সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন বলে জানা যায় না। তবে তারা শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের অধিকার ভোগ করতেন।

মনুসংহিতার পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক এবং সকল সম্পত্তির অধিকার পিতারই। সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রয়েছে জ্যেষ্ঠপুত্রের অগ্রাধিকার। তবে অন্যান্য পুত্রও কমবেশি সম্পত্তির অধিকার লাভের যোগ্য।। তাই দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে নারীর অধিকার একেবারেই নেই। তবে পিতার অবর্তমানে অবিবাহিতা ভগ্নীরা ভাইদের সম্পত্তি থেকে যৎসামান্য বা একাকালীন কিছু সম্পদ পাওয়ার যোগ্য।[৭৯] *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের কোনো অধিকার থাকবে না, যদিও ঐ সম্পত্তিতে পুত্রদের অধিকার থাকবে। অবশ্য মনু মনে করেন, মাতার সম্পদ ও স্ত্রীধনে অবিবাহিতা কন্যারই অধিকার থাকবে। যদি পিতার কোনো পুত্রসন্তান না থাকে, তবে সেই সব ধনসম্পত্তি কেবল কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্র পাবেন :

মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।
দৌহিত্র এব চ হরেদপুত্রস্যাখিলং ধনম্ ॥
মনুসংহিতা, ৯/১৩১[৮০]

মনুসংহিতায় মনু স্ত্রী, পুত্র এবং দাসদের অধম হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, স্ত্রী, পুত্র ও দাস যা কিছু অর্জন করবেন তার মালিক যথাক্রমে স্বামী, পিতা এবং দাস-প্রভু হবেন। তাহলে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদের নিজের অর্জিত সম্পদেও কোনো অধিকার নেই। তারা শুধু সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারিণী।

কিন্তু মনু অন্যত্র বলেন, স্ত্রীরা শুধু ‘স্ত্রীধনের’ই মালিক। এই স্ত্রীধন ছয় প্রকার: অধ্যগ্নি; অধ্যাবাহনিক; প্রীতিদত্ত; ভ্রাতৃদত্ত; মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত। বিবাহের সময় পিতাসহ অন্যেরা যে-ধন প্রদান করেন তাই অধ্যগ্নি ধন; বিবাহের পর নব বিবাহিতা বধূকে পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে নিয়ে আসার সময় নববধূ যে-ধন লাভ করেন তাই অধ্যাবাহনিক ধন। রতিকালে বা অন্য সময়ে স্বামী সন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীকে যে-ধন

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেন তাই প্রীতিদত্ত ধন। একইভাবে বিবাহের পর ভ্রাতা, মাতা ও পিতা কর্তৃক প্রদত্ত ধন যথাক্রমে ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত ধন নামে পরিচিত।[৮১]

স্ত্রীধন সম্পর্কে মনু এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, স্ত্রী জীবিতাবস্থায় এই ধন ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু এই ধন স্বামীই রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তবে স্ত্রীর অনুমতিক্রমে স্বামীও এই ধনভোগের অধিকারী হবেন। এখানে উল্লেখ্য, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ত্রীধন কন্যারা পাবেন। মনু বলেন যে, মাতার মৃত্যুর পর মাতার স্ত্রীধন সহোদর ভ্রাতা এবং অবিবাহিতা সহোদরা ভগ্নী সম অংশে ভাগ করে নেবেন। কিন্তু তার যদি বিবাহিতা কন্যা থাকে তাহলে তিনি এক-চতুর্থাংশ পাবেন। আবার মনু বলেন যে, যদি ঐ সকল কন্যার আবার কন্যা থাকে অর্থাৎ অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে তবে তার সম্মানার্থে মাতামহীর ধন থেকে সামান্য ধন দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

মনু নবম অধ্যায়ের ১৯৫নং শ্লোকে পূর্বে উল্লিখিত স্ত্রীধন ব্যতীত স্ত্রীর 'অন্বাধেয়' ধন নামে অন্য এক প্রকার স্ত্রীধনের কথা উল্লেখ করেন। 'অন্বাধেয়' ধন বলতে মনু কন্যার বিবাহের পর পিতা, মাতা, স্বামী, পিতৃকুল এবং ভর্তৃকুল থেকে প্রাপ্ত ধনকে বুঝিয়েছেন। এই 'অন্বাধেয়' ধন এবং প্রীতিদত্ত ধন স্বামীর জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে তার সন্তানেরা পাবেন। কিন্তু যদি স্ত্রীর কোনো সন্তানাদি না থাকে এবং সেই স্ত্রী যদি আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই তিন প্রকার বিবাহে আবদ্ধ হয়ে ধন লাভ করেন, তাহলে সেই ধন তার পরিবার লাভ করবে, অর্থাৎ প্রথমে মাতা এবং মাতার মৃত্যু হলে পিতা লাভ করবেন। মনু আবার অন্যত্র বলেন, কোনো স্ত্রী যদি পাঁচটি স্বীকৃত বিবাহ পদ্ধতি, অর্থাৎ, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব ও প্রাজাপত্য ইত্যাদি বিবাহ থেকে ধন লাভ করেন এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে সেই ধন স্বামীরই প্রাপ্য হবেঃ

> যৎ তস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
> অপ্রজায়ামতীতায়াং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে ॥
> *মনুসংহিতা*, ৯/১৯৭[৮২]

> ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্বপ্রাজাপত্যেষু যদ্বসু।
> অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্তুরেব তদিষ্যতে ॥
> *মনুসংহিতা*, ৯/১৯৬[৮৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, মনু স্ত্রীদের স্ত্রীধন বিক্রি করা বা উপহার দেওয়ারও অধিকার দেননি। এমনকি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী তার ধন-সম্পদ থেকে কোনো ব্যয়ও করতে পারবেন না। তবে মনু উল্লেখ করেন যে, তার স্বামীর কোনো আত্মীয়-স্বজন যদি তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে এবং এই প্রকার কাজ পাপ হিসেবে গণ্য হবে এবং তারা নরকবাসী হবেন।

মনুসংহিতায় মনু বিধবাদের অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তিনি পুত্রসন্তানহীন স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর কথা উল্লেখ করেননি এবং কোথাও বিধবাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকারের কথা বলেননি। পিতা-মাতা জীবিতাবস্থায় বা পিতা-মাতার মধ্যে যে-কেউ একজন মৃত্যুবরণ করলে সম্পত্তি ভাগ-বণ্টন করা অনুমোদন করেননি। এক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবেন না; শুধু সম্পত্তি ভোগ করবেন।

মনুসংহিতায় মাতা হিসেবে স্ত্রীদের সম্পদের অধিকার সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, নবম অধ্যায়ের ২১৭নং শ্লোকে মনু বলেন যে, সন্তানহীন পুত্রের ধন তার মাতার প্রাপ্য; কিন্ত মাতা মারা গেলে ঐ সম্পদ পিতার মাতা, অর্থাৎ, ঐ পুত্রের মাতামহী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করবেন। আবার মনু বলেন, যদি কোনো পুত্র তার পুত্র রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তার বিধবা স্ত্রী তার সম্পদ তার পুত্রের অভিভাবক হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কিন্তু তার (মাতা) জীবিতাবস্থায় সেই সম্পদ ভাগ-বণ্টন করা যাবে না। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, মাতা জীবিতাবস্থায় যদি পুত্রসন্তানাদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে মাতা পুত্রসন্তানাদির সম্পদের বৈধ উত্তরাধিকারিণী হবেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ কথাই বলতে পারি যে, মনুসংহিতায় নারীদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায় সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পিতার অবর্তমানে বা স্বামীর অবর্তমানে কিংবা পিতা-স্বামী উভয়ের অবর্তমানে নারীরা যাতে দুঃখকষ্টে দিনাতিপাত না করেন—সেদিকে লক্ষ রেখেই মনু নারীদের উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির বিধান রেখেছেন। হয়তো এ সম্পদ নারীর সোপার্জিত নয়; হয়তো তারা এর মালিকও নন; কিংবা তারা এই সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারিণী নন। তবুও পরিবারের সদস্য হিসেবে এসব সম্পদের প্রতি তাদের যে এক ধরনের অধিকার রয়েছে—তা সে অধিকার যতই নগণ্য হোক না কেন—একান্তই তাদের। তাই আমরা বলতে পারি, নারীজাতি সম্পর্কে মনুর নেতিবাচক মনোভাব যতই থাকুক না কেন—নারীর জীবনধারণের জন্য বিশেষ করে তৎকালীন সমাজে অসহায় নারীদের জন্য জীবনধারণের ব্যবস্থা রেখেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে এসব আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তিবিধানেরও কথা বলেছেন। তাই তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতি মনুর এক ধরনের উদারতা ছিল বলেই আমরা মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থান

ভারতবর্ষের ইতিহাস অতি প্রাচীন এবং নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই বৈশিষ্ট্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। তৎকালীন ভারতে রাজাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা আবর্তিত হতো। অর্থাৎ, রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু। মনুসংহিতার 'রাজধর্ম' নামক সপ্তম অধ্যায়ে মনু এই রাজা এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য ও কৌতূহলের বিষয় যে, মনু মানবজীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করলেও তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীদের ভূমিকা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করেননি কিংবা বলা যায়, মনু রাজকার্যে নারীদের অংশগ্রহণ বা রাজকার্যে নারীদের গুরুত্ব একেবারেই উপেক্ষা করে গেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে মনু পরোক্ষভাবে নারীজাতি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকভাবে যে দুই-একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, আমরা নিম্নে তাই তুলে ধরব।

মনুর রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। অর্থাৎ, সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি প্রজাপালন থেকে শুরু করে রাজ্যের যাবতীয় কার্যের একচ্ছত্র অধিপতি। এই রাজার মহিষী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনুর এরূপ অভিমত যে, রাজা 'সুপর্যাপ্ত' গৃহে বসবাস করে তাঁর 'সর্বণা', 'শুভলক্ষণ-বিশিষ্টা', 'উচ্চবংশে উৎপন্না', 'লাবণ্যময়ী', 'মনোহারিণী', 'রূপ' ও 'গুণযুক্তা' স্ত্রী গ্রহণ করবেন। মনুর ভাষায় :

> তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্যাং সর্বণাং লক্ষণান্বিতাম্।
> কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্ ॥
> *মনুসংহিতা*, ৭/৭৭ [৮৪]

রাজার স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা মনুর কঠোর মনোভাবের পরিচয় পাই। তিনি রাজার বিবাহের ব্যাপারে একেবারে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা সৃষ্টি করেছেন—যার বাইরে যাওয়া রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যান্য বংশীয়া নারী যদি উপর্যুক্ত গুণসম্পন্না হন, সেক্ষেত্রেও মনুর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে বলে মনে হয়।

মনু রাজার রাজকার্যের আশেপাশে নারীজাতির উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে মনুর অভিমত, নারীজাতি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ গোপন রাখতে পারেন না। এটি নারীজাতির স্বভাবদোষ

Dhaka University Institutional Repository

এবং এ কারণে তিনি নারীজাতিকে পশু, পাখি প্রভৃতি তির্যক প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নারীজাতি সম্পর্কে মনুর এরূপ মন্তব্য কতটুকু সত্য বা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মনু রাজার রাজকার্যে দাসী নিযুক্তির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের কার্যানুসারে বিভিন্ন পদমর্যাদা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে দৈনন্দিন ভাতা প্রদানের কথা বলেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, মনু রাজার কামজ দশটি এবং ক্রোধজ আটটি প্রবল ব্যসনের কথা জোর দিয়ে বর্জন করতে বলেছেন। এই ব্যসনের মধ্যে স্ত্রীসম্ভোগকেও তিনি যুক্ত করেছেন এবং এটিকে তিনি 'কামজদোষ' বলে অভিহিত করেছেন। এই কামজদোষের ফলে রাজা স্বদেহ থেকে বিচ্যুত হবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে বিভিন্ন রকম অপরাধ সংঘঠিত হতে পারে—সে ব্যাপারে মনু সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। অপরাধীর যে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যে দণ্ড থাকা প্রয়োজন, সেবিষয়টিও মনু গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই অপরাধীর অপরাধের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা যে অবশ্যম্ভাবী তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তি (পুরুষ বা স্ত্রী) সাক্ষ্য গ্রহণের উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত তার একটি দিক নির্দেশনা তিনি প্রদান করেছেন। যেমন, অষ্টম অধ্যায়ের ৬৮ নং শ্লোকে তিনি বলেন, স্ত্রীলোক ও স্ত্রীলোকের বিবাদের ক্ষেত্রে শুধু স্ত্রীলোকেরাই সাক্ষী প্রদান করবেন। তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের মামলা-মোকদ্দমা হয়, তাহলে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু বাদী-বিবাদী উভয়ে পুরুষ হলে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য অপরিহার্য নয়। মনু আবার একই অধ্যায়ের ৭০নং শ্লোকে বলেন যে, যদি কোনো গৃহে, নির্জনস্থানে, কিংবা অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ করে চোর প্রভৃতির দ্বারা কেউ আক্রান্ত হন ও আততায়ীর দ্বারা নিহত হন অথবা তার অর্থসম্পদ অপহৃত হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে যদি উপযুক্ত সাক্ষীর অভাব ঘটে, তাহলে প্রত্যক্ষদর্শী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু নিতান্ত অপরিহার্য না হলে বহুগুণের অধিকারিণী স্ত্রীলোকও সাক্ষ্য প্রদানে উপযুক্ত হবেন না। কারণ মনুর মতে, স্ত্রীবুদ্ধি নিতান্তই চঞ্চল। এছাড়া যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক ক্রোধ বা যে সকল স্ত্রীলোক চোর্যবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত তারাও সাক্ষী হবার উপযুক্ত নয়।

তাহলে আমরা দেখতে পাই, কোনো কার্যের অপরাধের ক্ষেত্রে মনু নারীজাতির সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শ্রেণিবিভাজন করেছেন এবং যেসব কারণে নারীজাতিকে সাক্ষ্য প্রদানে অনুপযুক্ত ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন তা শক্তিশালী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এসব ক্ষেত্রে নারীজাতির প্রতি মনুর এক ধরনের বৈষম্য এবং নারীজাতিকে খাটো করে দেখার কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মনুসংহিতায় রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক তথা পুরুষকর্তৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থা। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনু রাষ্ট্রশাসনে পুরুষের কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় কার্যে নারীকে অনুপস্থিত রেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে নারীজাতি তাও আবার সমবর্ণের, উচ্চবংশীয়া ইত্যাদি শ্রেণির নারীরাই রাজমহিষী হবার উপযুক্ত। এক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণির নারীকে তিনি অধস্তন হিসেবে গণ্য করেছেন — যা থেকে তাঁর নারীবৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। দাসী এবং সাক্ষীর ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন। মনু অত্যন্ত সুকৌশলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রাজকার্য পালনে স্ত্রীজাতির ভূমিকা একেবারেই এড়িয়ে গেছেন অথবা তাদের অনুপযুক্ত মনে করেছেন।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অবস্থান

মনুসংহিতার বিভিন্ন অধ্যায়ে মনু ধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মনুর সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি ছিল বর্ণ ও আশ্রম। মনু চারটি বর্ণের জন্য অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য যেসব আচরণবিধি সুনির্দিষ্ট করেছেন, তাই হচ্ছে মনুর মতে 'মানুষের ধর্ম'। মনু তাঁর ধর্ম ব্যবস্থায় মোক্ষলাভের কথা উল্লেখ করলেও সাংসারিক বিধি-বিধানের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তাই তিনি বলেন, প্রথমে নিয়মানুযায়ী বেদপাঠ, এরপর ধর্মানুসারে সন্তান উৎপাদন এবং নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে যাগ-যজ্ঞাদি সম্পন্ন করার পরই মোক্ষলাভে মনোনিবেশ করা উচিত। মনু চেয়েছিলেন, মানব 'অন্তঃপ্রকৃতি' এবং 'বহিঃপ্রকৃতি'র মধ্যে একটি সুসামঞ্জস্য সমন্বয়সাধন করা। এছাড়াও মনু গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে মানুষের জাতি নিরূপণের কথা উল্লেখ করেন।

মানুষের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে নারীজাতি সম্পর্কে মনু ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকে যতখানি সোচ্চার ছিলেন,ধর্মবিষয়ে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কীরূপ হবে, তা নিয়ে মনু তেমন উৎকণ্ঠিত ছিলেন না। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তথা বেদ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি সর্বপ্রকার বিধি-বিধানের কথা পুরুষদের ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নারীজাতির ক্ষেত্রে এরূপ কোনো সুস্পষ্ট বিধানের কথা তেমন কোনো শ্লোকে উল্লেখ করেননি। মনু তাঁর মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৬নং শ্লোকে শুধু উল্লেখ করেছেন:

অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্ ॥
মনুসংহিতা, ২/৬৬[৮৫]

অর্থাৎ, পুরুষের মতো স্ত্রীজাতিরও দেহশুদ্ধির জন্য জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে সংস্কার সমূহের আনুষ্ঠানিক কর্মসমূহ(আবৃত) যথাসময়ে এবং যথানিয়মে সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে ঐ সকল অনুষ্ঠানে কোনো মন্ত্রের প্রয়োগ থাকবে না। ঠিক এর পরবর্তী শ্লোকে অর্থাৎ ৬৭নং শ্লোকে মনু বলেন:

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া ॥
মনুসংহিতা, ২/৬৭[৮৬]

অর্থাৎ, স্ত্রীজাতির জন্য বিবাহই হচ্ছে 'উপনয়ন'। বিবাহের পর স্ত্রীজাতির পতিগৃহে বসবাসই গুরুগৃহে বসবাসের অনুরূপ এবং স্বামীর গৃহকার্যের কাজই হচ্ছে স্ত্রীজাতির গুরু গৃহের কাজ।

তৎকালীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, বেদাদি অধ্যয়ন গুরুগৃহে থেকেই নিষ্পন্ন করতে হবে। কিন্তু মনু বলেন, স্ত্রীজাতি যেহেতু গুরুগৃহে বাস না করে স্বামীগৃহে বাস করেন, তাই তাদের বেদাদি অধ্যয়নের প্রশ্ন উঠে না। স্ত্রীজাতির কাজ হচ্ছে শুধু স্বামীগৃহের কার্য সম্পাদন করা। এথেকে আমরা বলতে পারি, পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীজাতির 'উপনয়ন'–এর অধিকার হরণ করার সঙ্গে সঙ্গে, তারা অর্থাৎ, স্ত্রীজাতি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিতা হয়েছেন। সে কারণেই মনু তাঁর মনুসংহিতায় স্ত্রীজাতির শিক্ষার বিষয়ে নীরব থেকেছেন। অর্থাৎ, শিক্ষার অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিতা রেখেছেন। শুধু তাই নয়, মনু আরো কঠোরভাবে বলেন যে, বেদ-উপনিষদের শ্লোক-মন্ত্র রচনাকারিণী নারীর উত্তরসূরিদের বেদসহ অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠের কোনো অধিকার নেই। কারণ নারীরা 'ধর্মজ্ঞ নয়', 'নারীরা মন্ত্রহীন' এবং এরা মিথ্যা অর্থাৎ 'অপদার্থ'।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বৈদিকযুগে নারীজাতির শিক্ষার অধিকার ছিল। কিন্তু কালক্রমে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, কঠোর পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে নারীদের শিক্ষার অধিকার থেকে একেবারেই দূরে রেখে গৃহকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, মনুসংহিতায় আমরা পুরুষ দেবতার পাশাপাশি বহু নারীদেবতার উল্লেখ পাই: লক্ষ্মী, ভদ্রকালী, নির্ঋতি দেবী ইত্যাদি এবং এঁরাও সে সময় পূজিত হতেন। মনুসংহিতা থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন সমাজে 'বেদবহির্ভূত স্মৃতি' এবং 'বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র' প্রচলন ছিল।[৮৭] মনুর মতে, একমাত্র বেদশাস্ত্রানুযায়ী ধর্মই প্রকৃত ধর্ম এবং

Dhaka University Institutional Repository

বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম 'কুতর্কমূলক' এবং 'নিষ্ফল'। এসব ধর্মানুসারীদের তিনি 'বিকর্মস্থ', 'পাষণ্ড' ইত্যাদি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের রাজ্য থেকে অতি সত্বর নির্বাসিত করার জন্য রাজাকে নির্দেশ দেন।

মনুসংহিতায় চিত্তবিনোদনের উল্লেখ রয়েছে। এই চিত্তবিনোদনের মধ্যে রয়েছে 'প্রমোদানুষ্ঠান', অর্থাৎ, কণ্ঠসংগীত, নৃত্য ও অভিনয় এবং যন্ত্রসংগীত, 'ক্রীড়া ও অবসর বিনোদন'। ক্রীড়ার মধ্যে রয়েছে: ঘোড় দৌড়, রথ দৌড়, দাবা খেলা, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি এবং অবসর বিনোদনের মধ্যে রয়েছেঃ মৃগয়া এবং গ্রন্থপাঠ। তবে মনু অশ্লীল গ্রন্থপাঠ অনুমোদন করেননি। মনু এসব আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে নারীজাতির অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেননি। হয়তো স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এরূপ প্রমোদানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন বা উপভোগ করতে পারতেন। তবে উল্লেখ্য যে, মনু কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্য ও অভিনয়কে সুনজরে দেখেননি এবং নৃত্যোপজীবীর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপরত ও গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করেন।

মনুসংহিতায় অলংকার ব্যবহার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। মনু বিবাহের সময় যথোপযুক্ত অলংকারাদি দ্বারা বরের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, স্ত্রীজাতি থেকেই এই 'অলংকার ভূষণের' জন্ম এবং এগুলো নারীজাতির অত্যন্ত প্রিয়বস্তু।

মনুসংহিতায় প্রসাধনসামগ্রীরও উল্লেখ রযেছে। মনুর মতে. স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই প্রতিদিন স্নান, বেশভূষা পরিধান, দন্ত মার্জন, অঞ্জন লেপন, সুগন্ধির ব্যবহার এবং দেবতা পূজা প্রাত্যহিক কর্ম এবং এসকল কর্ম সৌন্দর্যবর্ধক। এছাড়াও মনুসংহিতায় সৌরভযুক্ত দ্রব্য যেমন, কর্পূর, চন্দন, অগুরু এবং ফুলের মালা ব্যবহারের কথাও জানা যায়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এগুলো ব্যবহার করতেন।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সুরাপানের কথা মনুসংহিতায় উল্লেখ রয়েছে। তবু মনু মনে করেন, মদ্যপান নারীজাতির অধঃপতনের অন্যতম একটি কারণ। শুধু তাই নয়, মদ্যপানে আসক্তা স্ত্রীর স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবেন এবং মৃত্যুর পর স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি পাবেন না। এভাবে মনু মনুসংহিতায় সাংস্কৃতিকক্ষেত্রেও নারীজাতির অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করেছেন।

মনু বিরচিত *মনুসংহিতা* বহুল আলোচিত ও সমালোচিত, বহু নিন্দিত ও নন্দিত। *মনুসংহিতা* বহুল আলোচিত, কারণ এই গ্রন্থটিতে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি দিকের একটি সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। আবার গ্রন্থটি বহুল সমালোচিত এ কারণে যে, মানবসমাজজীবন চিত্রায়ণে মনু অনেক নেতিবাচক বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে অনেক নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তিনি নন্দিত এই কারণে যে, একজন সমাজবিজ্ঞানী, ধর্মবেত্তা এবং রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সময়কার অবস্থা পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন এবং নিন্দিত এই কারণে যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে যা নারীজীবনের মান-মর্যাদার প্রশ্নকে বিদ্ধ করেছে। আমরা সে-কারণেই মনুসংহিতার উভয়দিকই বিশেষ করে নারীদের প্রতি মনুর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের মনে হয়েছে, মনু একজন সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান সামাজিক-নৈতিক সমস্যাবলির একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি নারীদের প্রতি যে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন তা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই করেছেন। মূলত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকল প্রকার সামাজিক অনাচার দূর করে একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক মঙ্গল আনয়ন করা।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বৈদিকযুগে তুলনামূলকভাবে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান সুদৃঢ় ছিল। ধীরে ধীরে কঠোর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে নারীদের সেই অবস্থান লুপ্ত হয় এবং নারীর জীবনযাত্রা সীমিত হতে থাকে।

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রম্*: আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বেদ-পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়—যার মধ্যে মনু বিরচিত *মনুসংহিতা* এবং কৌটিল্য বিরচিত *অর্থশাস্ত্র* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা ইতোমধ্যে মনুসংহিতার নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিষয়ে আলোকপাত করব। এখানে উল্লেখ্য যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধু রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ নয়—গ্রন্থটি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার একটি ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ।

মনুসংহিতার মতো কৌটিল্যের সমাজব্যবস্থাও বর্ণ ও আশ্রমভিত্তিক। (বর্ণ চারটি: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং আশ্রমও চারটি: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) কৌটিল্যের মতে, এই চার বর্ণের লোকেরা স্ব স্ব শাস্ত্রানুসারে কর্মের দ্বারা সমাজব্যবস্থাকে প্রগতির দিকে নিয়ে যাবে। তবে ব্রাহ্মণরাই সমাজ প্রধান এবং সমাজে তাদের গুরুত্বও বেশি। মনুর মতো কৌটিল্য রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং পুরুষতান্ত্রিক পরিবার প্রথার উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের 'ধর্মস্থীয়' নামক তৃতীয় অধিকরণে নর-নারীর বিবাহ সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, সামাজিক অবস্থান লাভের জন্য সামাজিক রীতি-নীতি অনুসারে নর-নারীর বিবাহ অনিবার্য এবং সন্তান জন্মদান উভয়ের জন্যেই নিয়তিস্বরূপ। তাই তিনি বলেন, ১২ (বার) বছর অতিক্রান্ত কন্যাকে স্বামী-সহবাসে

Dhaka University Institutional Repository

ও সাংসারিক কাজকর্মে উদ্যোগী হতে হবে এবং স্বামী ষোল বছর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি স্বামী-স্ত্রী বিবাহ সম্পর্কিত সেবা ও কর্তব্যাদি পালন থেকে বিরত থাকেন, তবে তাদের জরিমানা হবে :

> দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা ভবতি। ষোড়শবর্ষঃ পুমান্। অত ঊর্ধ্বমশুশ্রূষায়াং দ্বাদশপণঃ স্ত্রিয়া দণ্ডঃ পুংসো দ্বিগুণঃ।
>
> *অর্থশাস্ত্রম্*, ৩/৩ [৮৮]

তিনি আরো বলেন যে, পুরুষের জন্য স্ত্রীর ঋতুকাল সমাপনে সহবাস স্বধর্মস্বরূপঃ

> গৃহস্থস্য স্বকর্মাজীবস্তুল্যৈরসমানর্ষিভির্বৈবাহ্যমৃতুগামিত্বং দেবপিত্রতিথিভৃত্যেষু ত্যাগ-রশেষভোজনং চ।
>
> *অর্থশাস্ত্রম্*, ১/৩ [৮৯]

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ কথাই বলতে পারি যে, কৌটিল্যের মতে, নর-নারী নির্বিশেষে সকলেরই বিবাহ করা এবং সন্তান জন্মদান অনেক কাজের মধ্যে একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এই বিবাহ প্রক্রিয়ায় যৌনমিলনে নারীর মুখ্যকাজ হচ্ছে 'পুত্রসন্তান' জন্মদান। কারণ পুত্রসন্তানের সঙ্গে রাজত্ব এবং সম্পত্তির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেমন, অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, যদি কোনো রাজপুত্র রাজ্যশাসনে অনুপযুক্ত হন, তাহলে পুত্রিকার পুত্রকে সেই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। পুত্রিকা না থাকলে তার আত্মীয়, আত্মীয় না থাকলে কোনো নিজবংশীয় ব্যক্তির দ্বারা 'নিয়োগ প্রথা'র মাধ্যমে 'ক্ষেত্রজপুত্র' উৎপাদন করে তাকে রাজভার অর্পণ করবেন। এ'থেকে বোঝা যায় যে, নারীর জন্ম শুধুমাত্র পুত্রসন্তান জন্মদানের জন্য এবং এই পুত্রসন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে যেকোনো ব্যবস্থাই সমাজ দ্বারা স্বীকৃত। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, রাজপদে কোনো নারীকে উপযুক্ত মনে করা হয়নি। পুরুষের প্রয়োজনেই নারীর দেহ এবং নারীর একান্ত গোপনীয় বিষয়টিও পুরুষের নিকট উন্মুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঋতুকাল গোপনকারী নারীর জন্য শাস্তিরবিধানও করা হয়েছে। এভাবে নারী এবং যৌনতাকে অবিচ্ছেদ্য করে তোলা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর একজন নারী যেকোনো পুরুষের জন্যই উন্মুক্ত এবং পুরুষসমাজ যেকোনো নারী বা নারীবংশের উপর বল প্রয়োগ করতে পারবে। নারীবংশের উপর বল প্রয়োগ তথা নারী অপহরণকারীকে কৌটিল্য 'সাহস'[৯০] হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাই কন্যার পিতা এসব সাহসী পুরুষের আক্রমণের শিকার হওয়ার ভয়ে অতি অল্প বয়সে বা বাল্য বিবাহের বিধান মেনে নিতে বাধ্য।

Dhaka University Institutional Repository

কৌটিল্য নারীর যৌনমিলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুকৌশলে বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছেন; কিন্তু নারীকে পুত্র জন্ম দিতে হবে বিধায় স্বামীই হবে একমাত্র বৈধ উপায়। তাই তিনি বলেন, কোনো স্ত্রী যদি 'পুত্রবতী', 'ধর্মাচরণা', 'বন্ধ্যা', 'মৃতপত্রকা', 'নীরজস্কা', 'কুষ্ঠরোগাক্রান্তা' এবং 'উন্মাদ' হন, তাহলে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করবেন না। অন্যদিকে, পুত্রলাভের ইচ্ছায় যেকোনো স্ত্রী কুষ্ঠরোগী কিংবা উন্মাদ স্বামী-সহবাসে যেতে পারবেন। শুধু তাই নয়, এক বা একাধিক পুত্র উৎপাদনের জন্য যেকোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারবে। এভাবেই কৌটিল্য একদিকে যেমন স্ত্রীর যৌনমিলনের সীমারেখা টেনেছেন, অন্যদিকে পুরুষের বহুবিবাহের অধিকারকে আইনসংগত করেছেন। এছাড়াও স্ত্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারীর কুমারীত্ব বা যৌন শুদ্ধতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিবাহের পূর্বে নারীর কুমারীত্ব রক্ষা ধর্মের নির্দেশ হলেও পুরুষের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। তাই বিবাহের পূর্বে কুমারীত্ব হারানো কন্যার জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুমারীত্বের ক্ষেত্রে নারী কোনোরূপ মিথ্যাচার করতে পারবেন না। বরং মিথ্যাচার করলে জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে:

> প্রকর্মণ্যকুমার্যাশ্চতুস্পঞ্চাশৎপণো দণ্ডঃ। শুল্কব্যয়কর্মণী চ প্রতিদদ্যাৎ অবস্থায়। তজ্জাতং পশ্চাৎকৃতা দ্বিগুণং দদ্যাৎ। অন্যশোণিতোপধানে দ্বিশতো দণ্ডঃ, মিক্ষ্যাভিশিংসিনশ্চ। পুংসঃ শুল্কব্যয়কর্মণা চ জীয়েত। ন চ প্রাকাম্যমকামায়াং লভেত।
>
> *অর্থশাস্ত্রম্*, ৪/১২ [৯১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কৌটিল্য সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যকে বিশেষ করে পুত্রসন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নর-নারীর বিবাহের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই নারীর বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের বিষয়টিও সন্তান জন্মদানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। কৌটিল্য বিভিন্ন কারণে যেমন, বিদ্যার্জন, রাজপুরুষের প্রবাসজীবন, সন্ন্যাসগ্রহণ, মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর পুনর্বিবাহের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে সেক্ষেত্রে শর্ত একটি—সন্তান জন্মদান তথা পুত্রসন্তান জন্মদান। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, যে স্ত্রী সন্তান প্রসব করেননি বা একটি সন্তান জন্মের পর আর গর্ভধারণ করেননি কিংবা পুত্রসন্তান প্রসব করেননি বা স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হন, তবে সে স্ত্রী একটি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে পুনর্বিবাহ করতে পারবেন। অন্যদিকে, তিনি বলেন, কোনো স্ত্রী যদি শুধু মৃত-সন্তান প্রসব করেন বা শুধু কন্যা-সন্তানের জন্ম দেন, তাহলে স্বামী একটি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে পুনর্বিবাহ করতে পারবেন। আবার স্ত্রীধন প্রদান ও ক্ষতিপূরণ দানের মাধ্যমেও কোনো স্বামী একাধিক স্ত্রী গ্রহণের উপযুক্ত হবেন। এভাবেই কৌটিল্য নারীর জীবনকে শুধুমাত্র সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের মাধ্যমে নারীর জৈবিক, সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক এক কথায় নারীর জীবনের সর্ববিধ অধিকার পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাই স্বামীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো কাজ স্ত্রীর জন্য শাস্তিস্বরূপ। যেমন, কোনো স্ত্রী যদি দর্পবশত মদ্যপান করেন বা উদ্যানে ক্রীড়া দেখতে যান কিংবা স্বামীর কাছ থেকে পলায়ন করেন, তাহলে স্ত্রী শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধিনী হবেন। এছাড়াও স্বামীর নিষেধ অমান্য করে কোনো স্ত্রী যদি গৃহত্যাগ করেন বা ছলনা করে জ্ঞাতিকুলে বাস করেন বা স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও অন্য পুরুষের সঙ্গে আত্মীয় বাড়িতে যান কিংবা দিবাভাগে নারী প্রযোজিত কোনো নাটক দেখেন বা খেলাধুলার জন্য উদ্যানে যান, তাহলেও স্ত্রীকে শাস্তি পেতে হবে। শুধু তাই নয়, দিবাভাগে স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় বা মদ্যপান অবস্থায় থাকাকালে স্ত্রী গৃহত্যাগ করলেও তাকে শাস্তি পেতে হবে। এছাড়াও রাতে স্বামী বাইরে থেকে এলে স্ত্রী যদি গৃহদ্বার না খুলেন কিংবা রাতে স্ত্রী যদি গৃহত্যাগ করে বাইরে যান, অথবা যদি কোনো স্ত্রী রাতে গৃহে আগত স্বামীকে প্রবেশ করতে না দেন, তাহলেও স্ত্রীর শাস্তি হবে। এই শাস্তি অর্থদণ্ডে হতে পারে, বা স্ত্রীধন থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে, অথবা পিতৃগৃহ থেকে প্রাপ্ত শুল্কাদি থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে। এখানে লক্ষণীয়, কৌটিল্য নারীর দাম্পত্য জীবনকে নিষেধবাণীর বেড়াজালে আবদ্ধ করেছেন।

কৌটিল্য নর-নারীর গার্হস্থ্যজীবনকে বিবাহের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। বিবাহের সময় একজন নারী যা কিছু লাভ করেন বা যে সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হন, কৌটিল্য তাকে 'স্ত্রীধন' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, একজন কন্যার দু প্রকারের স্ত্রীধন থাকতে পারে:

১. বৃত্তি, অর্থাৎ জীবিকার উপযোগী ভূমি, হিরণ্য ইত্যাদি; এবং

২. আবন্ধ্য, অর্থাৎ শরীরকে অলংকৃত করার ভূষণাদি।

কৌটিল্য স্ত্রীধন ব্যয় করার উপায়ও উল্লেখ করেছেন। যেমন, সন্তানের ভরণপোষণ, স্বামীর প্রবাসকালীন অর্থসংকট, দস্যুর হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা, ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিকার, ভীতি পরিত্রাণ এবং ধর্মকার্যের জন্য স্ত্রীধন ব্যবহার করা যাবে। তবে উল্লেখ্য যে, কৌটিল্য স্ত্রীধন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবাহপ্রথা, দ্বিতীয় স্বামীগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এভাবে কৌটিল্য একদিকে নারীর যেমন অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছেন, তেমনি অন্যভাবে সেই অর্থনৈতিক অধিকারকে সীমিত করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীজাতিকে স্ত্রীধন থেকে বঞ্চিতও করেছেন।[৯২]

কৌটিল্য সমাজে নারীদের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রয়েছে মূলত সূতাকাটা এবং বস্ত্রবুনন। সমাজের বিভিন্ন ধরনের নারীরা এই অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থাকবেন—যাদের মধ্যে রয়েছেন : বিধবা স্ত্রী, বিকলাঙ্গ স্ত্রী, অবিবাহিতা কন্যা, সন্ন্যাসিনী, দণ্ডপ্রতিকারিণী, গণিকামাতৃকা, বৃদ্ধা রাজদাসী, এবং দেবতার পূজাকার্য হতে অযোগ্যা বিবেচিতা দেবদাসী। কৌটিল্যের ভাষায়:

> সূত্রাধ্যক্ষঃ সূত্রবর্মবস্ত্ররজ্জুব্যবহারং তজ্জাতপুরুষৈঃ কারয়েত। ঊর্ণাবল্ককার্পাসতূলশণ ক্ষৌমাণি চ বিধবান্যঙ্গাকন্যাপ্রব্রজিতাদণ্ডপ্রতিকারিণীভী রূপাজীবামাতৃকাভির্বৃদ্ধরাজ-দাসীভির্ব্যুপরতোপস্থানদেবদাসীভিশ্চ।
>
> *অর্থশাস্ত্রম্*, ২/২৩ [৯৩]

এসব নারীদের নির্দিষ্ট কোনো পারিশ্রমিক না থাকলেও তাদের কাজের মান ও পরিমাণ অনুসারে বেতন নির্ধারণের কথা কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। কাজের উৎসাহের জন্য এসব নারীদের তেল, চুলে ব্যবহারের জন্য আমলকির নির্যাস, দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সাবান প্রভৃতি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সূতাকাটার জন্য এমন আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, যে আলো শুধু সূতাকাটার জন্যেই পর্যাপ্ত এবং যে আলো অন্যকোনো কাজে বিশেষ করে সূতা বুননকারিণীর মুখদর্শন কাজে ব্যবহৃত না হয়। এথেকে কৌটিল্যের নারীর কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি সামাজিক দায়িত্বপালনের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, নারীর কর্মক্ষেত্রে নারীকে রক্ষা করার তথা যৌন নির্যাতনের হাত থেকে নারীকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি সূত্রাধ্যক্ষের উপর আরোপ করেন।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'সমাহর্তৃ সমুদয়প্রস্থাপনম্' শিরোনামে রাষ্ট্রের ধনাগমের সাতটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সাতটি স্থান হচ্ছে : দুর্গ, রাষ্ট্র, খনি, সেতু, বন, ব্রজ ও বণিকপথ। এই সাতটি স্থান থেকে বাইশটি উপায়ে রাষ্ট্রীয় ধনাগম হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তি।[৯৪] এভাবে তিনি বেশ্যাবৃত্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনিব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নারী তথা গণিকার অবস্থান সুদৃঢ় ও নিশ্চিত করেন। ফলে সমাজে গণিকাবৃত্তির প্রচলন হয় এবং নারীকে গণিকা ব্যবসায়ে নিয়োজিত করা হয়। এই বৃত্তি বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। গণিকারা রাষ্ট্রে ভ্রষ্টা হিসেবে গণ্য হলেও রাষ্ট্র এবং রাজকার্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হন।

গণিকারা হবেন গণিকা বংশজাত বা অ-গণিকাবংশজাত 'রূপযৌবনশিল্পসম্পন্না' নারী এবং গণিকাধ্যক্ষ তাদের বার্ষিক বা এককালীন বেতনের বিনিময়ে রাজগণিকার পদে নিয়োগ করবেন। রূপ-যৌবন অনুসারে গণিকাদের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হবে এবং সে

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারে তাদের বেতন ও কর্ম নির্দিষ্ট হবে। বৃদ্ধা গণিকারা ভোগ্যা গণিকার মাতৃস্থানীয়া হিসেবে রাজবংশে নিযুক্ত হতে পারেন। অর্থাৎ, তারা সমাজের গলগ্রহ না হয়ে রাজানুকূল্যেই জীবন অতিবাহিত করবেন। গণিকার পুত্ররাও রাজার দাস হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

কৌটিল্য বেশ্যাবৃত্তি থেকে মুক্তিকামী বেশ্যার জন্য জরিমানার বা 'মুক্তিমূল্য'র কথা উল্লেখ করেন। তার পুত্রের মুক্তির ক্ষেত্রেও জরিমানা প্রযোজ্য হবে। বেশ্যারা ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের সুযোগ লাভ করবেন। কিন্তু অর্থগ্রহণ করে যদি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে না চান বা কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন বা প্রহার করেন কিংবা অঙ্গছেদন করেন, তাহলে তাকে অর্থদণ্ড দিতে হবে। কোনো বেশ্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলাৎকার করলে সেই পুরুষকে জরিমানা দিতে হবে। বেশ্যা, বেশ্যা-মাতা, বেশ্যা-কন্যা এবং রূপ-দাসীকে হত্যা করলে জরিমানা করা হবে। এছাড়া কৌটিল্য বেশ্যার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যবস্থাও করেছেন। যেসব নারী সমাজে গোপনে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী, তাদের কথাও কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। অর্থশাস্ত্রে এরূপ এগার শ্রেণির নারীর কথা রয়েছে। এরা হলেন : নট, নর্তক, গায়ক, বাদক, বাগ্‌জীবন, কুশীলব, প্লবক, সৌভিক, চারণ ও স্ত্রী ব্যবহারকারী এরূপ দশ প্রকার লোকের স্ত্রী এবং গূঢ়াজীবা।[৯৫]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বেশ্যাবৃত্তি রাষ্ট্রীয় অর্থের একটি বিরাট উৎস। তাই কৌটিল্য এই ব্যবসায় নিয়োজিত নারীদের মাসিক বেতনের পনের ভাগের এক ভাগ রাষ্ট্রকে কর হিসেবে প্রদানের কথা বলেছেন। বেশ্যাবৃত্তি যেহেতু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন; সে কারণে এই বৃত্তি সমাজ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়কে উৎসাহিত করে। কৌটিল্য এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন যে, যে আচার্য বেশ্যা, দাসী বা রঙ্গোপজীবিনীকে 'গীত, বাদ্য, পাঠ্য, নৃত্য, নাট্য, অক্ষর, চিত্রকর্ম, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, পরচিত্তজ্ঞান, গন্ধসংযূহণ, মাল্যসংযূহণ, সংপাদন, সংবাহন ও বৈশিক কলা'র জ্ঞান শিক্ষা দিবেন, রাজা রাজকোষ থেকে তাঁর বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নারীরা গুপ্তচর, যুদ্ধক্ষেত্রে রাঁধুনী, চিত্তবিনোদনকারিণী, স্বার্থ উদ্ধারের উপায় এবং কূটনৈতিক ইত্যাদি কার্যে ব্যবহৃত হতেন। রাজকার্যে নারীদের এরূপ সক্রিয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কৌটিল্য তাদের বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই বলা যায় রাজকার্যে নারীর ভূমিকা ছিল শারীরিক ও কূটনেতিক। অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে নারীর গুপ্তচরবৃত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

সংজ্ঞাভাষান্তরজ্ঞাশ্চ স্ত্রিয়স্তেষামনাত্মসু।
চারঘাতপ্রমাদার্থং প্রযোজ্যা বন্ধুবাহনাঃ ॥

Dhaka University Institutional Repository

অর্থশাস্ত্রম্, ২/২৭ [৯৬]

আবার যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা হবে সৈন্যদের জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরি এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা। তবে এক্ষেত্রে নারীরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবেন। অন্যথায় সৈন্যদের যুদ্ধ করার স্পৃহা কমে আসতে পারে:

...স্ত্রিয়শ্চান্নপানরক্ষিণ্যঃ পুরুষাণামুদ্ধর্ষণীয়াঃ পৃষ্ঠতস্তিষ্ঠেয়ুঃ।

অর্থশাস্ত্রম্, ১০/৩[৯৭]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার আত্মরক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ কারণে রাজা যেমন তাঁর পারিপার্শ্বিক নারীদের বিশ্বাস করবেন না, অনুরূপভাবে নিজ স্ত্রী/রানি এবং পুত্রদেরও বিশ্বাস করবেন না।

কৌটিল্যের ভাষায় :

রক্ষিতো রাজা রাজ্যং রক্ষত্যাসন্নেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ। পূর্বং দারেভ্যঃ পুত্রেভ্যশ্চ।

অর্থশাস্ত্রম্, ১/১৭ [৯৮]

রাজা অবশ্যই রাজপ্রাসাদে বসবাস করবেন। তবে রাজমহিষীদের অবস্থানের ক্ষেত্র হবে রাজার ব্যবহারোপযোগিতার উপর। এক্ষেত্রেও কৌটিল্য কোনো বিশ্বস্ত ও বৃদ্ধ পরিচারিকার দ্বারা রাজমহিষীদের মনোভাব সঠিকভাবে জানার পরেই তাদের সঙ্গে রাজা সাক্ষাৎ করতে যাবেন বলে উল্লেখ করেন। কৌটিল্য আরো বলেন যে, গর্ভাবস্থা এবং ব্যাধিগ্রস্তাবস্থায়ই শুধু রাজমহিষীদের আত্মীয়স্বজন তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন; অন্য সময় তাদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারবেন না। তবে রাজা ও রাজমহিষীদের সেবার জন্য বেশ্যা এবং রূপাজীবারা স্নান সমাপনে নতুন বস্ত্র পরিধান করে শুদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। এছাড়া সংবাদাদি আদান-প্রদানের জন্য অশীতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষ, রাজগৃহে নিযুক্ত স্থবির এবং নপুংশক অন্তঃপুরে যেতে পারবেন। এভাবে কৌটিল্য এক অর্থে রাজমহিষীদের অন্তঃপুরে গৃহবন্দি করার ব্যবস্থা করেছেন—যার ফলে সন্তান উৎপাদন ছাড়া নারীরা আর সমাজে সকল প্রকার ভূমিকা রাখা থেকে বঞ্চিতা হয়েছেন—যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই প্রতিফলন।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে সামাজিকভাব অসহায় নারীদের সহায়তা করার জন্য রাজার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যেমন, বন্ধ্যানারী, স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় নারী, স্ত্রী, পিতা-মাতা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক

Dhaka University Institutional Repository

সহোদর ভ্রাতা, অবিবাহিতা বা বিধবা ভগ্নীকে যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভরণপোষণ না করেন, তবে রাজা তাকে দণ্ড দিবেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপর্যুক্ত আলোচনায় সার্বিকভাবে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় আমরা কৌটিল্য উল্লিখিত নারীর অবস্থা ও অবস্থানের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একথা সর্বজন বিদিত যে, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* রাজ্যশাসনের বিধিব্যবস্থাসম্বলিত শাসককুলের সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। তাই শাসককে সর্বদিক থেকে সুরক্ষার জন্য কৌটিল্য সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই অর্থশাস্ত্রে নারীর বিষয়টি তথা সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের বিষয়টি চলে এসেছে—যাতে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার নারী ও নারীজীবনের এবং নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তিনি আলোচনা করেছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নর-নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নর-নারীর বৈধ মিলন যা বিবাহ প্রথা নামে পরিচিত। একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীর বিবাহিতজীবনকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তারই একটি চিত্র কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, কৌটিল্য তৎকালীন সমাজে নারীর জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবদমনের বিষয়টি সুপ্রাচীনকাল থেকেই কমবেশি প্রচলিত। বৈদিকযুগে নারীর স্বাধীনতা কিছুটা থাকলেও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতাকে বিভিন্ন কারণেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। মনুসংহিতার ক্ষেত্রে একথাটি যেমন সত্য, কৌটিল্যের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে সত্য। তবে কৌটিল্য নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করেছেন এ কারণেই যে, রাজ্যশাসনে যে ধনসম্পদের প্রয়োজন, তার একটি বিরাট অংশের উৎস স্বয়ং নারীরা। এছাড়া কৌটিল্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অসহায় নারীদের প্রতি রাজার সামাজিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার কথাও বলেছেন। তবে রাজ্যশাসন করতে গিয়ে যে সমস্ত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, সেক্ষেত্রে নারীর প্রতি কীরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা উচিত, তা উল্লেখ করতে গিয়ে কৌটিল্য নারীর স্বাধীনতা যে খর্ব করেননি বা ক্ষেত্র বিশেষে নারীকে যে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা করেননি, সেকথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই আমরা বলতে পারি, নারীর প্রতি কৌটিল্যের শুধুমাত্র একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল না, সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪. অশ্বঘোষ : এ পর্যন্ত আমরা ভাস-পূর্ব সাহিত্যে তথা বৈদিকসাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, *মনুসংহিতা* ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এখন ভাসপূর্ব ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য এবং যুগ সন্ধিক্ষণের মহাকবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষের প্রধান রচনাবলিতে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

শুরুতেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অশ্বঘোষের জীবনী নিয়ে প্রামাণ্য কোনো তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই দুর্ভাগ্যবশত আমরা তাঁর জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানতে পেরেছি। তবে তাঁর *বুদ্ধচরিত* গ্রন্থ আবিস্কৃত হওয়ার পর গবেষকগণ তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে Maurice Winternitz তাঁর *A History of Indian Literature* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন:

> Until the year 1892, when the French scholar Sylvain Levi published the first chapter of the Buddha-Carita, little more than the name of Asvaghosa was known in Europe. To-day we know him as one of the most prominent poets of Sanskrit literature, as the most important predecessor of Kalidasa, and as the creator of epic, dramatic and lyrical compositions; but of his life we know little.[৯৯]

অবশ্য, একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দী তাঁর আবির্ভাবকাল এবং তিনি রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। এ বিষয়টিও সকলেই স্বীকার করেন যে, অশ্বঘোষ সংস্কৃত সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত কবি এবং বেশ কয়েকটি কাব্য, নাটক, গীতিকাব্য ইত্যাদি রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন গবেষকের নানা তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, অশ্বঘোষ এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হন। ফলে একদিকে বৌদ্ধদর্শন ও বেদ-বেদান্ত, বেদাঙ্গ সম্পর্কে তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বলা হয় যে, তিনি বিশেষ অলৌকিক শক্তির অধিকারী, সংগীত রচয়িতা এবং সংগীতজ্ঞও ছিলেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অশ্বঘোষ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি খুব কমই পাওয়া যায়। ফলে তাঁর রচনাবলি নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ করা যায়। তবে এ কথা সবাই স্বীকার করেন যে, এসব রচনার মধ্যে *বুদ্ধচরিতম্*, ও *সৌন্দরনন্দম্* শীর্ষক মহাকাব্য এবং *শারিপুত্রপ্রকরণম্* শীর্ষক

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যগ্রন্থ তাঁর নিজস্ব রচনা এবং এই তিনটি রচনার কারণেই তিনি বিশ্বজগৎ সভায় সংস্কৃত মহাকবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্য শাস্ত্রবিশারদ এস. কে. দে বলেন :

> The three works, which are known for certain to be Axvaghosa's, are: the *Buddha-carita*, the *Saundarananda* and the *Xariputra-prakarana*; and his fame as a great Sanskrit poet rests entirely on these.[১০০]

এস. কে. দের উপর্যুক্ত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে। তিনি বলেন, "অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ নামক মহাকাব্য এবং শারিপুত্রপ্রকরণ নামক নাটক নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব কৃতি।"[১০১] অশ্বঘোষ গবেষকগণ মনে করেন যে, অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত আরো কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে: *মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র*, *বজ্রসূচী*, *সূত্রালংকার*, *গণ্ডীস্তোত্রগাথা*, *ত্রিদণ্ডমালা* ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার রচনা। আবার কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, তাঁর *প্রতীক নাটক* ও *রাষ্ট্রপাল* নামক আরো দুটি নাট্যগ্রন্থও রয়েছে। এই দুটি গ্রন্থের খণ্ডিতাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নাট্যকার বা রচনার নাম উদ্ধার করা যায়নি। তাই উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত কিনা—তা নিয়ে গবেষকগণ সন্দেহপোষণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ভিত্তি প্রদান করেন অশ্বঘোষ। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ভাস, কালিদাস এবং শূদ্রকের নাটক রচিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন অশ্বঘোষ বিরচিত দুটি মহাকাব্য অর্থাৎ *বুদ্ধচরিত* ও *সৌন্দরনন্দ* এবং একটি নাট্যগ্রন্থ তথা *শারিপুত্রপ্রকরণ*-এ উল্লিখিত মুখ্য নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

বুদ্ধরচিতম্ : সাধারণত বলা হয়ে থাকে, অশ্বঘোষ রামায়ণ ও মহাভারতের কবিকল্পিত রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে গৌতমবুদ্ধকে তদ্রূপ মহামানবীয় চরিত্ররূপে অঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং আর্যসত্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে তিনি এই মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁর সুললিত শৈল্পিক ভাষা, রচনাশৈলী, কাব্যিক-কল্পনা দৃষ্টিভঙ্গি, অলংকার, উপমা-রূপক ইত্যাদি মিলিয়ে *বুদ্ধচরিত* গ্রন্থটি মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। সপ্তম শতকের তিব্বতের বৌদ্ধ গবেষক I-Tsing (ইৎসিঙ) *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

> æ*Buddhacarita* is widely read or sung throughtout the five divisions of India and the countries of Southern Sea. Asvaghosa clothes many-fold meanings and ideas in a few words, which rejoice the heart of the reader, so that he never feels tired of

reading the poem. Besides, it should be counted as meritorious for one to read this book, in as much as it contains, the noble doctrine, given in a concise form."

Thus Axvaghosa through his *Buddhacarita*, has made Buddha rank amongst the incarnations of god like Rama, Krishna, etc.[১০২]

বুদ্ধচরিত মহাকাব্যটি গৌতম বুদ্ধের জীবনালম্বনে রচিত অশ্বঘোষের অমর ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ কাব্যটি মোট ২৮টি সর্গে রচিত হলেও ১ম সর্গ থেকে ১৪শ সর্গ পর্যন্ত অশ্বঘোষের মূলরচনা। কিন্তু এর মধ্যেও ১ম ও ১৪শ সর্গের বেশ কিছু শ্লোক পাওয়া যায়নি।[১০৩]

আমরা নিম্নে অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিতের সর্গের নাম এবং কাহিনিসংক্ষেপ আলোচনা করবঃ

১ম সর্গ :	ভগবানের জন্ম
২য় সর্গ :	অন্তঃপুর বিহার
৩য় সর্গ :	উদ্বেগের উৎপত্তি
৪র্থ সর্গ :	নারী-প্রত্যাখ্যান
৫ম সর্গ :	অভিনিষ্ক্রমণ
৬ষ্ঠ সর্গ :	ছন্দক বিসর্জন
৭ম সর্গ :	তপোবন প্রবেশ
৮ম সর্গ :	অন্তঃপুরে বিলাপ
৯ম সর্গ :	কুমারের অন্বেষণ
১০ম সর্গ :	বিম্বসারের আগমন
১১শ সর্গ :	কামনিন্দা
১২শ সর্গ :	অরাড়-দর্শন
১৩শ সর্গ :	মার বিজয়
১৪শ সর্গ :	বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

উপর্যুক্ত সর্গগুলোতে অশ্বঘোষ গৌতমবুদ্ধের যে জীবনরচিত কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন তার কাহিনি সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে লুম্বিনী বনে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। তাঁর জন্মলগ্নেই নানা অলৌকিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করলে রাজার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু অসিত নামে এক মহর্ষি তপস্যার দ্বারা জেনেছিলেন যে, এই পুত্র জগতের জ্ঞানসূর্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। মাঙ্গলিক

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়াকর্ম এবং ধনদান সমাপণে রাজা নিজবাসগৃহ কপিলাবস্তুতে প্রবেশ করেন। পুত্রের জন্মের পর থেকেই রাজপরিবার এবং রাজ্যের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দেখে রাজমহিষী মায়াদেবী আনন্দ সংবরণ করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করলে মাতৃষ্বসা গৌতমী সিদ্ধার্থের লালন-পালনের ভার নেন। যথাসময়ে যৌবনে প্রবেশ করে যশোধরার সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং রাহুল নামে তাঁদের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। একদা বনে ভ্রমণকালে আকস্মিকভাবে জরা, ব্যাধি এবং মৃত ব্যক্তি প্রত্যক্ষণ করে সিদ্ধার্থের ভাবান্তর হয়। ফলে তিনি গৃহত্যাগ করে পরমসত্য উদ্ঘাটনের জন্য পদ্মষণ্ড বনে নবীন ব্রহ্মচারী রূপে প্রবেশ করেন। এখানে বহু কমার্তা নারী তাঁকে সংসারজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রলুব্ধ করে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি নিজ গৃহে ফিরে এসে গৃহত্যাগের জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। পিতৃ-অনুমতি না পেয়েও তিনি গৃহত্যাগ করে পরমসত্য অনুসন্ধানের নিমিত্তে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি গৃহে ফিরে এলে স্ত্রীসহ সকলেই তাঁকে নানা যুক্তি-তর্ক দ্বারা সংসারজীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে গৃহত্যাগ করে অরাড় মুনির আশ্রমে গমন করেন। সেখানেও তাঁর অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় তিনি অবশেষে গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থ হন। এ সময় তিনি সদ্ধর্মের শত্রু মার এবং তার সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হন। কিন্তু তাদের আক্রমণে সিদ্ধার্থ অবিচল এবং অচঞ্চল থাকেন। তখন মারের প্রতি আকাশবাণী হয় যে, তিনি যেন বৃথা শ্রম না করেন এবং পুণ্যকর্মের ফলে সিদ্ধার্থ তখনই বোধি লাভ করবেন। ফলে মার সৈন্যসহ সেই স্থান ত্যাগ করে। অতঃপর সিদ্ধার্থ ধ্যানস্থ হয়ে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর প্রবহমান ধারা স্মরণ করে উপলব্ধি করেন যে, এই জগৎ-সংসার কদলী বৃক্ষের ন্যায় অসার—'কদলীগর্ভনিঃসারঃ সংসার ইতি নিশ্চয়ঃ।' তিনি পরমসত্য, অর্থাৎ, জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্পর্কে অবগত হন এবং জীবের পাপের ফলভোগ দেখে তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হয়। জীব তার কু-কর্মের ফলেই নরকে প্রবেশ করে। আবার কেউ বা মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। আর এভাবেই তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন।

অশ্বঘোষ তাঁর *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যে গৌতমবুদ্ধের জীবনীকে পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্তরূপ দেওয়ার প্রসঙ্গে বাস্তব চরিত্র ছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে বেশ কিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এসব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নর-নারী, দেব-দেবী, অপ্সরা ইত্যাদি। আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই মহাকাব্যের শুধু বাস্তব নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অশ্বঘোষ বিরচিত মহাকাব্য বুদ্ধচরিতের নারীচরিত্রসমূহকে নিম্নলিখিত দুইভাগে ভাগ করতে পারি:

১। বাস্তব নারীচরিত্র :

মায়াদেবী (সিদ্ধার্থের মাতা)
গৌতমী (সিদ্ধার্থের মাতৃস্বসা)
যশোধরা (সিদ্ধার্থের পত্নী)

২। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নারীচরিত্র :

অহল্যা (৪/৭২)
উর্বশী (৯/৯, ১১/১৫)
কালী (৪/৭৬)
গঙ্গা (৯/২৫)
গৌতম মন্থাল (৪/১৭)
ঘৃতাচী (৪/২০)
জুহ্বতী (৪/৭৫)
পার্বতী (১/৬১, ১৩/১৬)
বিশ্বাচী (৪/৭৮)
মমতা (৪/৭৪)
মারুতী (৪/৭৪)
মাদ্রী (৪/৭৯)
রোহিণী (৪/৭৩)
লোপামুদ্রা (৪/৭৩)
শচী (২/২৭) ইত্যাদি উলেখযোগ্য।

মায়াদেবী: মায়াদেবী কপিলাবস্তুনগরের রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী, সিদ্ধার্থের মাতা, গৌতমীর ভগ্নী এবং যশোধরার শশ্রূমাতা। মায়াদেবী 'পৃথিবীর মতোই গৌরবময়ী'। সংসারজীবনে তিনি অত্যন্ত সুখী এবং রাজা সকল বিষয়ই তাঁর সঙ্গে ভোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, 'লোককল্যাণে'র জন্য তিনি গর্ভধারণ করেছেন। অশ্বঘোষের ভাষায় :

আসীন্মহেন্দ্রাদিসমস্য তস্য পৃথ্বীর গুর্বী মহিষী নৃপস্য।

Dhaka University Institutional Repository

মায়েতি নাম্নী শিবরত্নসারা শীলেন কান্ত্যাংপ্যধিদেবতেব ॥
দেবৈরভিপ্রার্থ্যমনল্পভোগং সার্ধং তয়াংসৌ বুভুজে নৃপালঃ।
সা চাথ বিদ্যেব সমাধিযুক্তা গর্ভং দধে লোকহিতায় সাধ্বী ॥
বুদ্ধচরিতম্, ১/২-৩[১০৪]

মায়াদেবী বিশ্বসভ্যতায় অতি সুপরিচিতা এই কারণে যে, তিনি পৃথিবীখ্যাত বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের প্রবক্তা সিদ্ধার্থ তথা গৌতম বুদ্ধের মাতা। সমাজ-সংসারে এই তাঁর পরিচয় এবং আর দশটি নারীর মতো পুত্রসন্তান জন্মদানে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। অবশ্য তাঁর পুত্র আর দশজন পুত্রের চেয়ে জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার-আচরণে এবং মানবসেবায় একেবারেই ব্যতিক্রম। সর্ব বিষয়ে সিদ্ধ বলে তাঁর পুত্র 'সবার্থসিদ্ধ'। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, দেবতার মতো পুত্রের এই প্রভাব দেখে তিনি তাঁর আনন্দ সংবরণ করতে পারেননি এবং পুত্রের জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পূর্বেই অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তৎকালীন পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে রাজমহিষীর অন্যকোনো ভূমিকা অত্যন্ত বিরল এবং তাঁদের জীবন পরিক্রমা অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ। মায়াদেবীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি একজন সার্থক বধূ হিসেবে সংসারধর্ম পালন করেছেন, সার্থক মাতা হিসেবে সৎপুত্রের জন্ম দিয়েছেন এবং অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনলীলা শেষ করেছেন।

গৌতমী : গৌতমী রাজমহিষী মায়াদেবীর ভগ্নী, সিদ্ধার্থের মাতৃষ্বসা (মাসি) এবং শুদ্ধোদনের শ্যালিকা। গৌতমী ভগ্নীর বাড়িতেই জীবনযাপন করেছেন এবং ভগ্নীর মৃত্যুর পর দেবতাতুল্য ভগ্নী-পুত্রকে সযত্নে ও মাতৃস্নেহে লালন-পালন করে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে উপনীত করেন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে উপনয়ন, সংস্কার ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সিদ্ধার্থের যথোপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণেও সহায়তা করেন। মাতৃস্নেহে লালন-পালন করে তিনি সিদ্ধার্থের বিবাহকার্য সম্পাদনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আমরা গৌতমীকে তাই একজন সার্থক নারী হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ গৌতমী যথার্থ মাতৃস্নেহ ও অনুরাগে সিদ্ধার্থকে গড়ে তুলেছেন। অশ্বঘোষের ভাষায় :

ততঃ কুমারং সুরগর্ভকল্পং স্নেহেন ভাবেন চ নির্বিশেষম্।
মাতৃষ্বসা মাতৃসমপ্রভাবা সংবর্ধনায়াত্মজবদ্ বভূব ॥
বুদ্ধচরিতম্, ২/১৯[১০৫]

মাতৃস্নেহাভাবের কথা সিদ্ধার্থ কখনো অনুভব করেননি। ফলে সিদ্ধার্থ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এছাড়া সমাজে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে গৌতমীর আর কোনো ভূমিকা আছে বলে জানা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

যশোধরা: যশোধরা সিদ্ধার্থের সহধর্মিণী, রাহুল-জননী, রাজা শুদ্ধোদন ও রানি মায়াদেবীর পুত্রবধূ এবং গৌতমীর ভাগ্নে-বধূ। যশোধরা উচ্চবংশীয়া, সাধ্বী, রূপবতী, লজ্জাবতী, বিনয়ের আধার, লক্ষ্মীতুল্যা, ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠগুণে বিভূষিতা। স্বাভাবিক গার্হস্থ্যজীবনে সিদ্ধার্থের মন যাতে আকৃষ্ট থাকে—সেকারণেই রাজা শুদ্ধোদন এরূপ সর্বগুণে গুণান্বিতা কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচিত করেন। বিবাহিতজীবনের একটি পর্যায় পর্যন্ত যশোধরা সার্থক বধূ হিসেবে গৃহকার্য সম্পাদন করেন এবং যথা সময়ে একটি পুত্র সন্তানেরও জন্ম দেন। কিন্তু পরবর্তীতে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ইত্যাদি প্রত্যক্ষণ করে সিদ্ধার্থের ভাবান্তর হলে যশোধরার জীবন এক ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়। সিদ্ধার্থের এই ভাবান্তর তাঁকে কামনা-বাসনা বিমুখ এবং গৃহত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। তাই সিদ্ধার্থ এক নিশীথ রাতে পতিব্রতা স্ত্রী এবং একমাত্র অবোধ শিশুসন্তানকে না জানিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গৃহত্যাগ করেন। একজন সহজ-সরল নারীর জীবনে স্বামীর এরূপ গৃহত্যাগকে আমরা সিদ্ধার্থের এক রকম পলায়নী মনোবৃত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। যশোধরা সিদ্ধার্থের এই পলায়নী মনোবৃত্তিতে যে সন্তুষ্ট ছিলেন না—তার ইঙ্গিত বিভিন্নস্থানে কাব্যকার উলেখ করেছেন। আমরা যশোধরার বিলাপ থেকেই তাঁর এই মনোভাবের কথা জানতে পারি। যেমন, যশোধরা বিলাপ করে বলেছেন :

> স মামনাথং সহধর্মচারিণী মপাস্য ধর্মং যদি কর্তুমিচ্ছতি।
> কুতোঽস্য ধর্মঃ সহধর্মচারিণীং বিনা তপো যঃ পরিভোক্তুমিচ্ছতি ॥
> শৃণোতি নূনং স ন পূর্বপার্থিবান্মহাসুদর্শপ্রভৃতীন্ পিতামহান্ ।
> বনানি পত্নীসহিতানুপেয়ুষ স্তথা হি ধর্মং মদৃতে চিকীর্ষতি ॥
> মখেষু বা বেদবিধানসংস্কৃতৌ দম্পতী পশ্যতি দীক্ষিতাবুভৌ ।
> সমং বুভুক্ষূ পরতোঽপি তৎফলং ততোঽস্য জাতো ময়ি ধর্মমৎসরঃ ॥
> ধ্রুবং স জানন্মম ধর্মবল্লভো মনঃ প্রিয়ের্ষ্যাকলহং মুহুর্মিথঃ।
> সুখং বিভীর্মামপহায় রোষণাং মহেন্দ্রলোকেঽপ্সরসো জিঘৃক্ষতি ॥
> ইয়ং তু চিন্তা মম কীদৃশং তু তা বপুর্গুণং বিভ্রতি তত্র যোষিতঃ।
> বনে যদর্থং স তপাংসি তপ্যতে শ্রিয়ং চ হিত্বা মম ভক্তিমেব চ ॥
> ন খল্বিয়ং স্বর্গসুখায় মে স্পৃহা ন তজ্জনস্যাত্মবতোঽপি দুর্লভম্।
> স তু প্রিয়ো মামিহ বা পরত্র বা কথং ন জহ্যাদিতি মে মনোরথঃ॥
>
> *বুদ্ধচরিতম্*, ৮/৬১-৬৬[১০৬]

অর্থাৎ, “আমি সহধর্মচারিণী অনাথা, তিনি আমাকে দূর করে যদি ধর্ম আচরণ করতে চান তবে কোথায় তাঁর ধর্ম যিনি সহধর্মচারিণী ছাড়াই তপস্যা করতে ইচ্ছুক? অবশ্যই তিনি পূর্ববর্তী রাজা সুদর্শ প্রভৃতি পিতামহদের কথা শোনেন নি। এঁরা তো পত্নীদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছিলেন। তাই আমাকে ছাড়াই তিনি তপস্যা করতে ইচ্ছুক। যজ্ঞে বৈদিক

Dhaka University Institutional Repository

> বিধানের দ্বারা সংস্কৃত এবং দীক্ষিত, পরকালেও উভয়ে একত্রে ফলভোগে অভিলাষী দম্পতী তিনি দেখেন নি তাই আমার প্রতি ধর্মে এই কার্পণ্য! নিশ্চয়ই সেই ধর্মপ্রিয় গোপনে বারবার আমার ঈর্ষ্যা ও কলহপ্রিয় মনকে জেনে এবং সুখের অভাব আশঙ্কা করেছেন; তাই কোপনস্বভাবা আমাকে ছেড়ে স্বর্গের অপ্সরাদের গ্রহণ করতে অভিলাষী হয়েছেন। কিন্তু আমার চিন্তা এই, সেখানে সেই নারীরা কেমন দেহের গুণ ধারণ করে যার উদ্দেশ্যে তিনি ঐশ্বর্য এবং আমার ভক্তি ত্যাগ করে বনে তপস্যায় রত হয়েছেন? এ-নয় যে স্বর্গসুখে আমার অভিলাষ; আত্মসংযত ব্যক্তির তা দুর্লভও নয়। কিন্তু সেই প্রিয় আমাকে ইহলোকে বা পরলোকে কোন প্রকারে যেন ত্যাগ না করেন এই আমার আকাঙ্ক্ষা।"

যশোধরার উপর্যুক্ত বিলাপ থেকে আমরা একজন অসহায় নারীর করুণ আর্তনাদের কথা জানতে পারি। যশোধরার কোনো অপরাধ ছাড়াই সিদ্ধার্থ তাঁকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন বৃহত্তর মানবকল্যাণের জন্য ক্ষুদ্রব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'এই ক্ষুদ্রস্বার্থত্যাগ' একজন অবলা নারীর জন্য কতটা গ্রহণীয় কিংবা কষ্টকর—তা অবশ্যই ভেবে দেখার অবকাশ রাখে। যশোধরার এখানে অবশ্য করণীয় কিছু নেই। কারণ তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক অসহায় নারী এবং এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একধরনের শিকারও বটে।

কন্যা হিসেবে যশোধরা পিতা-মাতার ইচ্ছা ও ধর্মীয় বিধান অনুসারেই রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। বধূ হিসেবে আর দশটি নারীর মতো স্বামী-সংসার-স্বজন নিয়ে দিন অতিবাহিত করে, এবং পুত্রসন্তান জন্ম দিয়ে নিজের এবং পরিবারের আকাঙ্ক্ষাকেও পরিপূরণ করেন। তবে পরবর্তীকালে স্বামীর একাকী সংসার ত্যাগের বিষয়টি তাঁর মনোকষ্টের কারণ হয়—যা একজন নারীর জন্য নিতান্তই স্বাভাবিক। এছাড়া রাজবধূ হিসেবে তাঁর কোনো সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভূমিকা ছিল না।

অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গৌতমবুদ্ধের জীবনকাহিনির একটি সুস্পষ্ট বিবরণ। তিনি একজন নিপুণ কবি হিসেবে আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে বাস্তব ঘটনা অনুসরণে এই মহাকাব্যটি রচনা করেন। নারীর চরিত্র অঙ্কনে এবং নারীচরিত্রের ভূমিকার ক্ষেত্রেও তিনি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং সংযত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে তাঁর নারীচরিত্রগুলো ছন্দময় কাব্যিক ভাষার কারণে আরো প্রাণবন্ত, জীবন্ত ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমাজ-সংসারে নারীচরিত্রগুলোর যথাযথ ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

উলেখ করতে তিনি দ্বিধান্বিত হননি। তাই তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় তৎকালীন রাজমহিষী, রাজপুত্রবধূ এবং অন্যান্য নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের একটি সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে রামায়ণ-মহাভারতের মতো অপ্সরা চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষণীয়। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অপ্সরাদের যে একমাত্র কাজ পুরুষের মনোরঞ্জন, সে কথাটিও তিনি এই মহাকাব্যে উল্লেখ করতে ভুলেননি।

***সৌন্দরনন্দম্* :** *সৌন্দরনন্দ* মহাকাব্যটি মহাকবি অশ্বঘোষের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠকীর্তি। অষ্টাদশ সর্গে বিরচিত এই মহাকাব্যের মূলবিষয় কাব্যরীতিতে রচিত 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ'। এই মূলবিষয়টিকে কেন্দ্র করে কবি নানা উপমা, রূপক, দীপক, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসক্তি—এক কথায় বিভিন্ন অলংকারের মধ্য দিয়ে পাঠকমনে অনুভবমূলক, চিন্তামূলক, আধ্যাত্মিক তথা দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং পরিণামে দার্শনিক চিন্তাই কাব্যটিতে প্রকটরূপ ধারণ করেছে।

গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুন্দর এবং তাঁর স্ত্রী সুন্দরীর প্রেমোপাখ্যানের মধ্য দিয়ে গৌতমবুদ্ধের জীবন এবং বাণীকে মূলভিত্তি করে বেশকিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নর-নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই মহাকাব্যে। সুন্দর স্ত্রীর প্রতি গভীর কামাসক্তে নিমজ্জিত থেকে এবং পার্থিব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জীবনের মূলবিষয় 'মুক্তি'র কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। গৌতমবুদ্ধ তাঁর এই ভ্রম ভঙ্গ করে অসার জীবনের পথ থেকে তাঁকে মুক্তির পথে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই *সৌন্দরনন্দ* মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উলেখ্য যে, অশ্বঘোষ তাঁর ধর্মীয় অনুভূতিগুলোকে মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন:

(ক) যারা নিজ আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা নিজমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত; এবং

(খ) যারা অন্যের সাহায্য নিয়ে নিজমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত।

অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত্র* প্রথম শ্রেণিভুক্ত এবং *সৌন্দরনন্দ* দ্বিতীয় শ্রেণিভূক্ত।[১০৭] আমরা নিম্নে *সৌন্দরনন্দ* মহাকাব্যের স্বর্গের নাম এবং কাহিনিসংক্ষেপ আলোচনা করব :

১ম সর্গ: কপিলবাস্তু বর্ণন

২য় সর্গ : রাজবর্ণন

৩য় সর্গ : তথাগত বর্ণন

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ সর্গ: ভার্যার প্রার্থনা (ভার্যাযাচিতকো)

৫ম সর্গ : নন্দর সন্ন্যাস (নন্দপ্রব্রাজনো)

৬ষ্ঠ সর্গ : ভার্যাবিলাপ

৭ম সর্গ : নন্দবিলাপ

৮ম সর্গ : স্ত্রীবিঘাত

৯ম সর্গ : মদাপবাদ

১০ম সর্গ : স্বর্গনিদর্শন

১১শ সর্গ : স্বর্গাপবাদ

১২শ সর্গ : প্রত্যবমর্শ

১৩শ সর্গ : শীলেন্দ্রিয় জয়

১৪শ সর্গ : আদিপ্রস্থান

১৫শ সর্গ : বিতর্কপ্রহাণ

১৬শ সর্গ : আর্যসত্য ব্যাখ্যা

১৭শ সর্গ : অমৃতাধিস (অমৃতাধিগম)

১৮শ সর্গ : আজ্ঞা ব্যাকরণ

উপর্যুক্ত সর্গগুলোতে গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরের যে কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

নন্দ এবং তাঁর স্ত্রী সুন্দরী ভোগ-বিলাসের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এরূপ একদিনে গৌতমবুদ্ধ ভিক্ষার জন্য তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলে কেউ তাঁকে ভিক্ষা না দেওয়ায় তিনি চলে আসেন। এ কথা শুনে নন্দ অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বুদ্ধের নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ তাঁর কোনো কথা শ্রবণ না করে নিজের ভিক্ষাপাত্রটি তাঁর হাতে তুলে দেন। নন্দ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন থাকার কারণে ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। নন্দের স্ত্রী সুন্দরীও স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেন এবং নানাভাবে বিলাপ করতে থাকেন। গৌতমবুদ্ধ নন্দকে আধ্যাত্মিকভাবে আকৃষ্ট করে আশ্রমে নিয়ে যান এবং পার্থিব কামনা-বাসনা ত্যাগ করে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা বিফল হলে স্বর্গের অপূর্ব সুন্দরী অপ্সরাদের দেখিয়ে গৌতমবুদ্ধ বলেন যে, তাঁর স্ত্রী অপ্সরাদের চেয়েও সুন্দরী কিনা? নন্দ এই অপরূপা অপ্সরাদের লাভের জন্য ব্যাকুল হলে তিনি নন্দকে গভীরভাবে তপস্যা করার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর নন্দ অপ্সরাদের লাভের জন্য তপস্যায় মগ্ন হন। বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ নানা রকম

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ দিয়ে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এরূপ কামনাময় জীবন ক্ষণস্থায়ী। এভাবে নন্দ অপ্সরালাভের চিন্তা পরিত্যাগ করে গৌতমবুদ্ধের নিকট সত্য ও আলোকিত পথ দেখানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করলে গৌতমবুদ্ধ তাঁকে যথারীতি বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত করে গহিন অরণ্যে গভীর তপস্যা করতে নির্দেশ দেন। দীর্ঘসাধনার পর নন্দ 'অর্হৎ' হন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর নন্দ গৌতমবুদ্ধের চরণ বন্দনা করেন এবং সিদ্ধিলাভের জন্য অভিনন্দন জানান।

আমরা পূর্বেই উলেখ করেছি যে, *সৌন্দরনন্দ* মহাকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নন্দের বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ—এই বিষয়টিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে মহাকাব্যকার অশ্বঘোষ তাঁর *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যের ন্যায় বাস্তব চরিত্র ছাড়াও বেশকিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এসব চরিত্রের মধ্যেও রয়েছে নর-নারী, দেব-দেবী, অপ্সরা ইত্যাদি। এই মহাকাব্যটি আলোচনায়ও আমরা শুধু বাস্তব নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরতে প্রয়াসী হব। আমরা এই মহাকাব্যটির নারীচরিত্রসমূহকে নিম্নলিখিত দুইভাগে ভাগ করতে পারি :

১। বাস্তব নারীচরিত্র :

সুন্দরী (গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের স্ত্রী)

২। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নারীচরিত্র :

অহল্যা (৭/২৫)
অক্ষমালা (৭/২৮)
উর্বশী (৭/৩৮, ৪২)
কালী (৭/২৯)
কুমুদবতী (৮/৪৪)
গঙ্গা (৭/৪০)
দিতি (৯/১৯)
মেনকা (৭/৩৯-৪০)
যমুনা (৭/৩৩)
রম্ভা (৭/৩৬)
শকুন্তলা (১/২৬)
শান্তা (৭/৩৪)
সরস্বতী (৭/৩১)

Dhaka University Institutional Repository

সরণ্যূ (৭/২৬)

স্বাহা (৭/২৫) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরী : অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দ* মহাকাব্যের একমাত্র বাস্তব নারীচরিত্র সুন্দরী। তাঁর মূল পরিচয় হলো তিনি গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের স্ত্রী এবং রাজা শুদ্ধোদনের পুত্রবধূ। সুন্দরী প্রকৃত অর্থেই 'সুন্দরী', 'মানিনী' এবং 'ভামিনী'। শুধু তাই নয়, সুন্দরী উচ্চবংশজাত এবং স্ত্রী জাতির মধ্যে তিনি অত্যন্ত ব্যতিক্রম। নন্দের যোগ্যতমা স্ত্রী হিসেবে আমোদ-প্রমোদ এবং আনন্দে তাদের বিবাহিতজীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন নন্দকে আলোকিত জগতে নিয়ে আসার কারণে সুন্দরীর সুখময় জীবনস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষাদ নেমে আসে। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এই নারীর করুণ আর্তনাদের চেয়ে নন্দের মোহভঙ্গ করাকেই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় শোকে-দুঃখে কাতর এক বিপর্যস্ত নিঃসহায় রমণীর ব্যাকুলতা মূল্যহীন এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সমাজ-সংস্কার এবং ধর্মাচার মানবীয় আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করে নেয়। তাঁর আর্ত চিৎকারে শুধু সান্ত্বনার বাক্যই উচ্চারিত হয়। তাঁর স্বামীও এই দীর্ঘকালের প্রেমময় জীবনের মূল্য না দিয়ে ধর্মকেই গুরুত্ব দেন। আমরা নিম্নে সুন্দরীর অসহায় ও করুণ বিলাপের দুটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি:

> সংদৃশ্য ভর্তুশ্চ বিভূষণানি বাসাংসি বীণাপ্রভৃতীংশ্চ লীলাঃ।
> তমো বিবেশাভিননাদ চোচ্চৈঃ পঙ্কাবতীর্ণেব চ সংসসাদ॥
> সা সুন্দরী শ্বাসচলোদরী হি বজ্রাগ্নিসংভিন্নদরীগুহেব।
> শোকাগ্নিনান্তর্হৃদি দহ্যমানা বিভ্রান্তচিত্তেব তদা বভূব ॥
>
> *সৌন্দরনন্দম্*, ৬/৩২-৩৩[১০৮]

অর্থাৎ, "তার স্বামীর অলঙ্কার, বসন, বীণা ও অন্যান্য বিনোদন-দ্রব্য দেখতে দেখতে সে যেন অন্ধকারে নিমগ্ন হল; উচ্চকণ্ঠে সে আর্তনাদ করতে লাগলো—যেন সে পঙ্কে পতিত হয়েছে। সুন্দরীর বক্ষ শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে, নামছে, যেন বজ্রাগ্নিতে বিদীর্ণ এক গিরিগুহা, কেননা দুঃখের অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ; দেখে মনে হচ্ছিল তার চিত্ত বিভ্রান্ত।"

সুন্দরী রাজপুত্রবধূ, অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়ার কারণেই রাজপরিবারে তাঁর এই স্থান। কিন্তু সমাজের আর দশটি নারীর মতোই তিনি অসহায়; সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য পরমুখাপেক্ষী। তাঁকে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে আসার সাহসও করেনি। কারণ আমাদের এই সমাজ-সংসারে পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে ধর্মের স্থান সুউচ্চ শিখরে। নারীর এরূপ সামাজিক চিত্র চিরায়ত। সন্তান উৎপাদন ছাড়া যেন সমাজে তাঁর কোনো

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা নেই—না পরিবারে, না সমাজজীবনে, না রাষ্ট্রীয় জীবনে। এভাবেই একজন নারীর জীবন ধীরে ধীরে নীরবে-নিভৃতে 'মহাপ্রয়াণে'র দিকে অগ্রসর হয়।

***শারিপুত্রপ্রকরণম্* :** *বুদ্ধচরিত* এবং *সৌন্দরনন্দ* মহাকাব্যের মতো অশ্বঘোষের *শারিপুত্রপ্রকরণ*[১০৯] নাট্যগ্রন্থটিও গৌতমবুদ্ধ কেন্দ্রিক। এই নাট্যগ্রন্থটিরও বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্ম, গৌতমবুদ্ধের শিক্ষা ও সংসার ত্যাগ এবং শারিপুত্র ও মৌদ্‌গলায়নের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ।

মহাকাব্য রচনায় অশ্বঘোষ যেমন উত্তরসূরিদের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং অনুকরণীয়, নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অত্যন্ত সিদ্ধহস্তে তিনি এক্ষেত্রেও সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন এবং নাটকের যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন—তা অনুসরণ করেই পরবর্তীকালের নাটকগুলো পরিপক্বতা লাভ করেছে। *শারিপুত্রপ্রকরণ* নাটকের পাত্র-পাত্রী, সংলাপ, উপস্থাপনা, চিত্রকল্প সব মিলিয়ে এই নাট্যগ্রন্থের যে খণ্ডাংশটুকু গবেষকদের হাতে এসেছে, তাতে অশ্বঘোষের নাট্যপ্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অশ্বঘোষের *শারিপুত্রপ্রকরণ* নাট্যগ্রন্থে উল্লিখিত নারীচরিত্র হলো গণিকা (মগধবতী) এবং চেটি।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গণিকা প্রথার যে প্রচলন ছিল এবং গণিকারা যে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা পালন করত—তার উলেখ আমরা প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্যে যেমন, বৈদিকসাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য, *মনুসংহিতা* ও *অর্থশাস্ত্র* ইত্যাদিতে দেখতে পাই এবং এ সম্পর্কে আমরা আলোচনাও করেছি। গণিকারা তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। এদের প্রধান কাজ ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন। এই মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে অনেক গণিকাই আবার রাজষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন। গণিকাদের মধ্যে আবার স্তরভেদও ছিল। এই ধারাবাহিকতায় আমরা অশ্বঘোষের *শারিপুত্রপ্রকরণ* নাটকের নারীচরিত্র গণিকা এবং তার পরিচারিকা হিসেবে চেটির উলেখ দেখতে পাই। এই নাট্যগ্রন্থ থেকে সমাজ-সংসারে তাদের ভূমিকার কথা জানা যায় না। তবে গণিকারা যে প্রেমক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই গণিকার একটি সংলাপে :

> কিং খলু ইদানীং সুরতবিমর্দক্ষম...[১১০]
>
> অর্থাৎ "এখন কি তবে প্রেমক্রীড়াক্ষম..."

আমরা পূর্বেই উলেখ করেছি যে, *শারিপুত্রপ্রকরণ* নাটকের খণ্ডাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সংলাপও তাই অসম্পূর্ণ। নাটকটিতে ‘চেটি’র উল্লেখ থাকলেও তার কোনো সংলাপ নেই। ফলে চেটি সম্পর্কে কোনো প্রকার আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

আমরা ভাস-পূর্ব মহাকাব্যকার এবং নাট্যকার অশ্বঘোষ বিরচিত *বুদ্ধচরিত*, *সৌন্দরনন্দ* এবং *শারিপুত্রপ্রকরণ*-এ উল্লিখিত নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করেছি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীদের যে অবস্থা ও অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়, অশ্বঘোষের নারী চরিত্রগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। পার্থিব কামনা-বাসনায় মোহাচ্ছন্ন মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গৌতমবুদ্ধের গৃহত্যাগ এবং বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত কিংবা নন্দের মোহভঙ্গের জন্য গৌতমবুদ্ধের আপ্রাণ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু এর পেছনে একজন মহীয়সী নারীর কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কীভাবে উপেক্ষিত হয়েছে তা পর্দার অন্তরালেই থেকে গেছে এবং তাঁর অবদানের স্বীকৃতির বিষয়টি প্রায় অনুচ্চারিতই থেকে গেছে।

আমরা এ অধ্যায়ে বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে অশ্বঘোষ পর্যন্ত রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থানের একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাসের নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থানের পথ সুগম করে তোলা। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা যখন ভাসের নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করব, আমাদের এ আলোচনা তখন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এক বিশেষ স্থান রয়েছে। নানান উত্থান-পতন, ঘাত-সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা একটি সুস্থিত ও সুশৃঙ্খল রূপ ধারণ করে। ভারতের আবহাওয়া, জলবায়ু, প্রতিবেশ, পরিবেশ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীব্যবস্থা একটি বৌদ্ধিক (Intellectual) পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর এই অবস্থার মধ্য দিয়েই বিশাল ভারতে প্রতিভাধর ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হয় পৃথিবীখ্যাত অমরকাব্য কাহিনি। একথা বিশেষভাবে উলেখ্য যে, বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে অশ্বঘোষ পর্যন্ত সকলেই সমাজজীবনের নানা চরিত্র চিত্রণে নারীদের কথা উলেখ করেছেন। সকলেই স্বীকার করেছেন যে, নর-নারী উভয়েই স্রষ্টারই সৃষ্টি এবং একে অন্যের পরিপূরক ও সম্পূরক। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থান-কাল-পাত্র, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারী চরিত্র রূপায়ণে সেই যুগের সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে বৈদিকযুগে নারীর যে অবস্থা ও অবস্থানের চিত্র আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীকালে

Dhaka University Institutional Repository

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে এবং তারও পরবর্তীতে মনু এবং কৌটিল্যের যুগে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের একটি ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায় এবং পাওয়া যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে একথা স্বীকার্য যে, ভারতের অধিকাংশ সময়েই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ফলে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, ক্ষমতা নানাভাবে অবদমিত হয়েছে। একজন নারীর পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে যে ভূমিকা পালন করার কথা, তা তারা পালন করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, নারীদের কখনো কখনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং সেভাবেই তাদের সঙ্গে আচরণ করা হয়েছে। ফলে নারীর মন ও মননের স্বাধীন বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈদিকযুগে কিছুটা ব্যতিক্রম। এখানে নারীর যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে এবং গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখ স্বাধীনচেতা মেধাবী নারীর মন ও মননের বিকাশ লাভের সুযোগ হয়েছে।

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনাকে আরো অগ্রসর করে নেওয়ার জন্যে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে ভাসের নাট্যসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করব এবং এই আলোচনার সুত্রপাত ধরেই পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তু ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ১২৪-১২৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৩. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* [দ্বিতীয় খণ্ড], হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃ. ৫৭২

৪. প্রাগুক্ত

৫. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* [প্রথম খণ্ড], প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ. ৫৫৭

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

৭. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* [দ্বিতীয় খণ্ড], প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮৯

৮. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* [প্রথম খণ্ড], ভূমিকা, শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১, এছাড়াও ড. গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর *বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা* গ্রন্থে (বিশ্ব জ্যোতির্বিদ সংঘ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৬০) বলেন, "পতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পত্যন্তর গ্রহণের কথা আছে।"

৯. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* [দ্বিতীয় খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮

১০. অথর্ববেদের অষ্টাদশ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকে ভার্যার সহমরণের কথা বলা হয়েছে। (শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী, (অনুবাদ ও সম্পাদনা), *অথর্ববেদ*, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২, পৃ. ৩৫৩)

Dhaka University Institutional Repository

১১. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ (অনূদিত ও সম্পাদিত), *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৪, পৃ. ৮৭৫

১২. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* [প্রথম খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭

১৩. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, [দ্বিতীয় খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬

১৪. অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ (অনূদিত ও সম্পাদিত), *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩০

এখানে উল্লেখ্য যে, যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রদত্ত আত্মতত্ত্ব এবং অমৃতত্ত্বের উপদেশটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম ব্রাহ্মণেও বর্ণিত হয়েছে।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৯

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭১

১৭. ড. যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৫, পৃ. ২০১-২০২

১৮. শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামী (অনুবাদ ও সম্পাদনা), *যজুর্বেদ-সংহিতা*, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৬, পৃ. ২১৯-২২১

১৯. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, [প্রথম খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

২০. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, [দ্বিতীয় খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১

২১. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, [প্রথম খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

২২. ড. যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

২৩. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, [প্রথম খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

২৪. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, [দ্বিতীয় খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮

২৫. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, [প্রথম খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

২৮. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা* [দ্বিতীয় খণ্ড], প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৭, ৬৫৮

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫

৩০. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ (অনূদিত ও সম্পাদিত), *উপনিষদ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯০

৩১. Winternitz, Maurice, *A History of Indian Literature,* Vol. I, First Edition, Delhi, 1981, Reprint, 1996, p. 211

৩২. শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, *প্রাচীন ভারতে নারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ৫২

৩৩. সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০১, পৃ. ২৮

৩৪. রামায়ণের একাধিক পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এর আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড পরবর্তীকালের সংযোজন বলে পণ্ডিতগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। সুতরাং, বাল্মীকি রচিত তথা মূল রামায়ণে পাঁচটি কাণ্ড বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ২য়–৬ষ্ঠ কাণ্ড বাল্মীকির মূলরচনা বলে অনুমিত। উল্লেখ্য, নাট্যকার ভাস রচিত রামায়ণ আশ্রিত দুটি নাটকই বাল্মীকি কৃত মূল রামায়ণকে অবলম্বন করেই রচিত।

৩৫. মহর্ষি– শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীত *মহাভারতম্*,১৩ খণ্ড, উদ্‌যোগপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭১

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রাচীন সাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৭১২

৩৭. পূরবী বসু, *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ২৬-২৭

৩৮. আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত *রামায়ণম্*, প্রথম খণ্ড (অনুবাদ, আলোচনা, সম্পাদনা), আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, নিউলাইট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮৬

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৪১. সুখময় ভট্টাচার্য, *রামায়ণের চরিতাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৬, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৬, পৃ. ২৩৮

৪২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত *রামায়ণম্*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

৪৪. প্রাগুক্ত

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫৫

৪৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১০-৬১২

৪৭. আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণম্, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৯৯৭, পৃ. ৫৯১

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২

৪৯. আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত *রামায়ণম্*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০, ১৯২

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৩

৫১. আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত *রামায়ণম্*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩-৫৭৪

৫৩. আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত *রামায়ণম্*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬

৫৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯

৫৫. আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত *রামায়ণম্*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৫৬. পূরবী বসু, *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯

৫৭. মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীত *মহাভারতম্*, ৩ খণ্ড, আদিপর্ব্ব, প্রাগুক্ত, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৪৯

৫৮. প্রাগুক্ত, ৫ খণ্ড, সভাপর্ব্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯৫

৫৯. প্রাগুক্ত, ৩১ খণ্ড, স্ত্রীপর্ব্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৬০. প্রাগুক্ত, ১৫ খণ্ড, উদ্‌যোগপর্ব্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৯৯-১১০০

৬১. প্রাগুক্ত, ৬ খণ্ড, বনপর্ব্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪২

৬২. প্রাগুক্ত, ৪ খণ্ড, আদিপর্ব্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮১৪

৬৩. প্রাগুক্ত, ৭ খণ্ড, বনপর্ব্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩৩

৬৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, ড. প্রদীপ রায় (অনূদিত) *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* (মূল Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*), অবসর, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৫ এবং আরো দেখুন, বশীর রায়হান (বাংলায় ভাষান্তর) *দ্য প্রিন্স*, (মূল Niccolo Machiavelli, *The Prince*), প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৮

৬৫. ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৬, পৃ. ২৩

৬৬. প্রাগুক্ত, ৩/১৬০

৬৭. প্রাগুক্ত, ৩/১১৪

৬৮. প্রাগুক্ত, ৩/১৪৮

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৭০. প্রাগুক্ত, ৩/৫৭

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৮

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৪

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৫

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

৭৫. প্রাগুক্ত, ৫/১৫৯-১৬০

৭৬. আসুর বিবাহ বলতে বোঝায়, কন্যার পিতা বা অন্য কোনো গুরুজনকে যথাসাধ্য ধন দান করা।

৭৭. ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), *মনুসংহিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৭৮. প্রাগুক্ত, ৯/৯৮, ৩/৫২

৭৯. প্রাগুক্ত, ৯/১১৮

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫০

৮১. প্রাগুক্ত, ৯/১৯৪

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭৪

৮৩. প্রাগুক্ত

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. এখানে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের কথা বলা হয়েছে। দেখুন, মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ৯৫নং শ্লোক। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. ড. রাধাগোবিন্দ বসাক (সম্পাদিত), *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৮৯, p. 88

৮৯. প্রাগুক্ত, p. 4

৯০. "সর্ব্বসমক্ষে বলাৎকারসহকারে যে (অপহরণাদি) কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম সাহস।" প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৭

৯১. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮০, p. 17

৯২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধিকরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়

৯৩. প্রাগুক্ত, p. 63

৯৪. কৌটিল্যের রাষ্ট্রীয় ধনাগমের বাইশটি উপায় হচ্ছেঃ শুল্ক, দণ্ড, পৌতব, নাগরিক, লক্ষণাধ্যক্ষ, মুদ্রাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, সূনাধ্যক্ষ, সূত্রাধ্যক্ষ, তৈলবিক্রেতা, ঘৃতবিক্রেতা, ক্ষারবিক্রেতা, সৌবর্ণিক, পণ্যসংস্থা, বেশ্যাধ্যক্ষ, দ্যূত, বাস্তুক, কারুগণ, শিল্পীগণ, দেবতাধ্যক্ষ, দ্বার এবং বাহিরিকের আদেয় ধন।

৯৫. ড. রাধাগোবিন্দ বসাক (সম্পাদিত), *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধিকরণ, সপ্তবিংশ অধ্যায়

৯৬. প্রাগুক্ত, p. 70

৯৭. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, p. 95

৯৮. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, p.19

৯৯. Winternitz, Maurice, *A History of Indian Literature*,vol. Π, Munshiran Manoharlal publishers pvt. Ltd, New Delhi, Third edition, 1991, p. 256

১০০. Dasgupta, S.N., and S. K. De, *A History of Sanskrit Literature: Classical Period*, vol. 1, University of Calcutta, 1947, p. 73

১০১. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১১০

১০২. Khosla, Sarla, *Axvaghosa and his Times*, Intellectual Publishing House, New Delhi, 1st edition, 1986, p. 15

১০৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Dasgupta, S.N. and S. K. De, *A History of Sanskrit Literature: Classical Period*, vol. 1, প্রাগুক্ত, p. 73 এবং ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

১০৪. অশ্বঘোষ, 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃ. ১১০

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

১০৭. Khosla, Sarla, *Axvaghosa and his Times*, প্রাগুক্ত, p. 22

১০৮. অশ্বঘোষ, 'সৌন্দরনন্দম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. শারিপুত্রপ্রকরণ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেণিবিভাজনে প্রকরণ শ্রেণির অন্তর্গত। প্রকরণ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১০. অশ্বঘোষ, 'শারিপুত্রপ্রকরণম্,' *সংস্কৃত সাহিতসম্ভার*, ১১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ভাসের নাট্যসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

৪.১ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যকার ভাস ও তাঁর নাট্যসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ভাস একজন পূর্ণাঙ্গ নাট্যকার। কারণ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেণিকরণে যে বিভিন্ন বিভাগ তুলে ধরা হয়েছে — ভাসই একমাত্র এসব শাখাতে পদচারণা করেছেন, তাঁর হাতের স্পর্শে প্রতিটি শাখাই জীবন্তরূপ লাভ করেছে এবং কালের পরিক্রমায় আজও তা পাঠক হৃদয়ে স্থান করে নিচ্ছে। একারণে ভাসের নাট্যসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখনো বিদ্যমান। ভাসের নাট্যসাহিত্য পূর্ণাঙ্গভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাঁর প্রতিটি নাটকের (রূপকের) অনুপুঙ্খিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন বিধায় আমরা বর্তমান অধ্যায়ে তাঁর শ্রেণিবিভাজিত নাটকগুলোর একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। তাই আমরা এ অধ্যায়ে ভাস বিরচিত প্রতিটি নাটকের অঙ্কভিত্তিক বিষয়বস্তু, পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও উপস্থাপনার আলোচনা করব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ভাসের নাটককে আমরা রামায়ণ-আশ্রিত, মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত, ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত এবং পৌরাণিক ও কবির মনোভূমিনিঃসৃত তথা কল্পনা-আশ্রিত ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের বিশ্লেষিত আলোচনায় মূল উৎস থেকে ভাসের নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, পরিবেশ-পরিস্থিতির পার্থক্য আলোচনা করে ভাস ও তাঁর নাটকের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে প্রয়াসী হব।

৪.২ রামায়ণ-আশ্রিত নাটক

ক. *প্রতিমানাটকম্* : *প্রতিমানাটকম্*-এর চরিত্রগুলোর মধ্যে ষোলটি পুরুষচরিত্র এবং এগারটি নারীচরিত্র রয়েছে। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার –	নাটকের পরিচালক
রাজা –	অযোধ্যার অধিপতি দশরথ
রাম –	নাটকের নায়ক, রানি কৌশল্যার গর্ভজাত দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র
লক্ষ্মণ –	সুমিত্রার গর্ভজাত দশরথের অন্য এক পুত্র

ভরত – কৈকেয়ীর গর্ভজাত দশরথের অন্য এক পুত্র

শত্রুঘ্ন – সুমিত্রার গর্ভজাত দশরথের আরেক পুত্র

সুমন্ত্র – দশরথের মন্ত্রী

রাবণ – লঙ্কার অধিপতি, রাক্ষসদের রাজা

কাঞ্চুকীয় – অন্তঃপুরগামী বৃদ্ধ

সূত – ভরতের সারথি বা রথচালক

দেবকুলিক – প্রতিমাগৃহের রক্ষক

সুধাকর – ভবনশিল্পী

দুইজন বৃদ্ধ তাপস

নন্দিলক – তাপসসেবক

ভট – রাজার কর্মচারী

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

নটী – সূত্রধারের পত্নী, নাটক পরিচালনায় সহকারিণী

সীতা – নাটকের নায়িকা, রামচন্দ্রের পত্নী

কৌশল্যা – দশরথের প্রধানা রানি, রামচন্দ্রের মাতা

সুমিত্রা – দশরথের অন্য এক রানি, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা

কৈকেয়ী – দশরথের অন্য এক রানি, ভরতের মাতা

অবদাতিকা – সীতার সখী

চেটী – পরিচারিকা

প্রতিহারী – রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষিকা

বিজয়া – কৈকেয়ীর পরিচারিকা

নন্দিনিকা – কৈকেয়ীর অন্য এক পরিচারিকা

তাপসী

এছাড়া অন্যের সংলাপের মাধ্যমে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত নারীচরিত্রগুলো :

আর্যারেবা – নেপথপালিনী

আর্যবালা – অন্তঃপুরচারিকা

Dhaka University Institutional Repository

মন্থরা – ভরত-মাতা কৈকেয়ীর দাসী

সারসিকা – পরিচারিকা

নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখতে পাই নায়িকা সীতাকে বল্কল পরিহিতা অবস্থায়। কৌতূহলবশত সীতা সংগীতশালায় এসে বল্কল পরিধান করেন। সখীদের মতে, এতে অপরূপ রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী সীতার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। এদিকে অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়। কারণ রানি কৈকেয়ী তাঁর স্বামী রাজা দশরথের নিকট পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়ে স্বীয়পুত্র ভরতকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার প্রার্থনা করেন। কৈকেয়ীর প্রার্থনায় দশরথ ভীষণভাবে মর্মাহত হন। কিন্তু রামচন্দ্র একটুও দুঃখ পান না। তিনি পিতৃসত্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। সংগীতশালায় আভরণহীন দেহে বল্কল পরিহিতা সীতাকে দেখে তিনি নিজেও বল্কল পরিধান করে বনে গমনে প্রস্তুত হন। কঞ্চুকীর নিকট থেকে শোকে মুহ্যমান দশরথের করুণ অবস্থা জেনেও রাম বনবাসে গমন থেকে নিবৃত্ত হন না। রামের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সীতা আর লক্ষ্মণও তাঁর সহগামী হন।

দ্বিতীয় অঙ্কে I পুত্রশোকে কাতর রাজা দশরথ দৈহিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তৃতীয় অঙ্কে I অযোধ্যায় আগমনের উদ্দেশ্যে ভরত মাতুলালয় থেকে রওনা হয়ে পথিমধ্যে একটি মন্দিরে প্রবেশ করেন। মন্দিরে পাথরের কয়েকটি প্রতিমা পরপর সাজানো দেখেন এবং মন্দিররক্ষকের নিকট থেকে অবগত হন যে, প্রতিমাগুলো ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের প্রতিমূর্তি। তিনি আরো অবগত হন যে, সেখানে শুধু পরলোকগত রাজাদের প্রতিমূর্তিই স্থাপিতIজীবিতদের নয়। মন্দিরে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের (দিলীপ, রঘু, অজ) সঙ্গে দশরথের প্রতিমা দর্শন করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কারণ ভরত তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ জানতেন না। মন্দিররক্ষকের নিকট থেকে তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হন। ঠিক তখনই অমাত্য সুমন্ত্রের সঙ্গে দশরথের তিন রানি প্রতিমাগৃহে উপস্থিত হন। ভরত প্রকৃতস্থ হয়ে কৌশল্যা আর সুমিত্রাকে প্রণাম জানান; কিন্তু কৈকেয়ীকে তিরস্কার করেন। ভরত বলেন :

মম মাতুশ্চ মধ্যস্থা ত্বং ন শোভসে।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কুনদীব প্রবেশিতা ॥
প্রতিমানাটকম্, ৩/১৫[১]

অর্থাৎ, পবিত্র গঙ্গাযমুনার মধ্যে যেমন কোনো পঙ্কিল নদী প্রবেশ করতে পারে না, ঠিক তেমনি মহীয়সী রানিদ্বয় কৌশল্যা ও সুমিত্রার সাথে কুটিলস্বভাবা রানি কৈকেয়ীকে মানায় না।

এরপর ভরত কৈকেয়ীর পুত্ররূপে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে রামের অনুসন্ধানে ব্রতী হন।

চতুর্থ অঙ্কে Ï ভরত সুমন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রের নিকট গমন করেন এবং তাঁর নিকট অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাম তাঁকে অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্যপালনের মাধ্যমেই তাঁর (রাম) সেবা করা হবে বলেন। সুমন্ত্র রাজ্যাভিষেক সম্পর্কে জানতে চাইলে রাম মাতা কৈকেয়ীর আকাঙ্ক্ষাই শিরোধার্য বলেন। অর্থাৎ, ভরতই হবে অযোধ্যার রাজা। একথায় ভরত অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি রামকে পুনঃপুন ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাম কোনো ভাবেই ফিরতে রাজি হন না। তিনি পিতৃসত্য পালনে দৃঢ় সংকল্প। অতঃপর বনবাসজীবন সমাপ্ত হওয়ার পর রাম অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যভার গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিলে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা দুটি নিয়ে বলেন যে, এই পাদুকা দুটিতে অভিষেকের জল ঢেলে দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি রামের পাদুকার প্রতিনিধি হয়েই প্রজা প্রতিপালন করবেন।

পঞ্চম অঙ্কে Ï রামকে দেখা যায় বনে অবস্থান করে কিভাবে পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করবেন সে বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও মর্মাহত অবস্থায়। আর এ সময় আশ্রমে উপস্থিত হন অতিথির ছদ্মবেশে রাবণ। প্রসঙ্গক্রমে রাম রাবণের নিকট থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রকথা শ্রবণ করার এক পর্যায়ে অবগত হন যে, কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ কর্তৃক তর্পণ করলে পিতৃপুরুষের আত্মার শান্তি ও সদ্‌গতি লাভ হয়। ফলে রাম সেই মৃগের খোঁজে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে গমন করতে মনস্থ করেন। কিন্তু হঠাৎ সেখানেই কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগকে দেখে ধনুর্বাণ নিয়ে তার পশ্চাদানুসরণ করেন। তখন লক্ষ্মণ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। রামই তাঁকে তীর্থ থেকে আগত কুলপতিকে আনতে পাঠিয়েছিলেন। আর সেই সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করেন। জটায়ু রাবণকে বাধা দেন; কিন্তু রাবণ কর্তৃক জটায়ু নিহত হন।

ষষ্ঠ অঙ্কে Ï রামের নিকট থেকে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে সুমন্ত্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন ভরত সুমন্ত্রের নিকট সীতা হরণের ঘটনাটি শ্রবণ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞানলাভের পর ভরত সব কিছুর জন্য কৈকেয়ীকে দায়ী করেন। কিন্তু কৈকেয়ী সুমন্ত্রের মাধ্যমে অন্য এক কথা শোনান। তিনি বলেন, অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করার কারণে দশরথের পুত্রশোকের অভিশাপ প্রাপ্য ছিল। রামের বনবাস বিচ্ছেদের দুঃখের মাধ্যমেই কৈকেয়ী পুত্রশোকের শাপ থেকে দশরথকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং, রাজ্যের প্রতি তাঁর কোনো লোভ নেই। রাজ্যের মঙ্গল কামনায়ই তিনি একাজ করতে বাধ্য হয়ে তিরস্কৃত হন। তবে তিনি চৌদ্দ দিন বলতে গিয়ে আবেগে চৌদ্দ বছর বলে

Dhaka University Institutional Repository

ফেলেন। সে কারণে তিনি অত্যন্ত লজ্জিতা ও অনুতপ্ত। আর সমস্ত বিষয় কুলগুরুদের অনুমোদনেই ঘটেছে। সব কথা শুনে ভরত মায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মায়ের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। কৈকেয়ীও ভরতকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর ভরত বিপুল-সংখ্যক সৈন্যসমাবেশের প্রতিজ্ঞা করেন সীতাকে উদ্ধার করার জন্য।

সপ্তম অঙ্কে Í রাম সকলের সহায়তায় রাবণকে পরাজিত ও বধ করে সীতাকে উদ্ধার করার পর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। মায়েদের সঙ্গে নিয়ে ভরত সেখানে উপস্থিত হন। একে অপরের সঙ্গে মিলিত হন। ভরত রামকে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। এ প্রস্তাবে কৈকেয়ীও সম্মতিজ্ঞাপন করেন। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতির উপস্থিতিতে রামের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। রামচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে রাবণের পুষ্পক রথে করে সবাই অযোধ্যার উদ্দেশ্যে আশ্রম ত্যাগ করেন।

উপর্যুক্ত কাহিনিতে লক্ষণীয় যে, প্রতিমানাটকের কতিপয় বিষয় ভাসের একেবারেই নিজস্ব সৃষ্টি। যেমন, প্রথম অঙ্কের নাট্যশালার বল্কলবৃত্তান্ত, তৃতীয় অঙ্কের প্রতিমাগৃহের কাহিনি, চতুর্থ অঙ্কে ভরতের চেয়ে লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠতা, পঞ্চম অঙ্কে কাঞ্চনপার্শ্বের অবতারণা, ষষ্ঠ অঙ্কে কৈকেয়ীর দোষস্খালন ও শ্লাঘ্যপদ প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাস তাঁর সৃজনী প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। এসব ক্ষেত্রে ভাস বাল্মীকিকে অনুকরণ করেননি। বল্কলবৃত্তান্ত, প্রতিমাগৃহের কাহিনি এবং কাঞ্চনপার্শ্বের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ভাসেরই উদ্ভাবন। তৃতীয় অঙ্কে প্রতিমাগৃহের বিষয়টি নাটকের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন না নাট্যকার এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই নাটকের নামকরণ করেছেন এবং এই প্রতিমাগৃহে প্রবেশ করেই ভরত পিতার মৃত্যুসংবাদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের বনে গমন প্রভৃতি সকল বিষয় অবগত হন। আর ভরত উক্ত নাটকের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কারণ রামকে বনে পাঠানো এবং ভরতকে রাজা বানানোÍএই বিষয়কে কেন্দ্র করেই সমস্ত নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ভাসের বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় মেলে ধিক্কৃত স্ত্রী ও মাতা চরিত্র কৈকেয়ীকে শ্লাঘ্যপদ প্রদানের মাধ্যমে। রামায়ণে যিনি তিরস্কৃতা, ভাস তাঁকেই দিলেন শুভ্রতার আসন। আর তাই তো ভরত বলেন :

> "... অম্ব! যদ্ ভ্রাতৃস্নেহাৎ সমুৎপন্নমন্যুনা ময়া দূষিতাত্রভবতী তৎ সর্বং মর্ষয়িতব্যম্। অম্ব! অভিবাদয়ে।"
>
> *প্রতিমানাটকম্*, ৬ষ্ঠ অঙ্ক[২]

Dhaka University Institutional Repository

> অর্থাৎ, মা, ভাইয়ের প্রতি স্নেহবশত রাগান্বিত হয়ে আমি যে তোমাকে তিরস্কার করেছি–সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। মা, তুমি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ কর।

এক্ষেত্রে ভাসের বহু পরবর্তীকালের কবি মধুসূদন কর্তৃক *মেঘনাদবধ* কাব্যে রাবণকে সম্মান প্রদানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুতরাং, নাট্যবস্তু রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও প্রতিমানাটকের মূলীভূত বিষয়ের ক্ষেত্রেও নাট্যকার রামায়ণ থেকে সরে এসেছেন। রানি কৈকেয়ী কর্তৃক রাজা দশরথের শাপমুক্তির নিমিত্তে রামকে বনবাসে পাঠানো এবং এরই ধারাবাহিকতায় ভরতকে সিংহাসনে বসানোই আলোচ্য নাটকের মূলীভূত বিষয়। ফলশ্রুতিতে কৈকেয়ীর চরিত্রে নাট্যকার একজন মহীয়সী নারীচরিত্রের রূপ দিয়েছেন। সবশেষে বলা যায় যে, পতিপ্রেম, ভ্রাতৃবন্ধন, পিতৃসত্য রক্ষা, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি বিষয় ভাস তাঁর প্রতিমানাটকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

খ. *অভিষেকঃ :* *অভিষেকঃ* নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে ছাব্বিশটি পুরুষচরিত্র এবং তিনটি নারীচরিত্র বিদ্যমান।

পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার –	রঙ্গাধ্যক্ষ
পারিপার্শ্বিক –	
রাম –	দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র
লক্ষ্মণ –	রামচন্দ্রের অনুজ
সুগ্রীব –	বানরদের অধিপতি
নীল –	সুগ্রীবের অধীনস্থ এক বানর
রাবণ –	লঙ্কার অধিপতি, রাক্ষসরাজ
বিভীষণ –	রাবণের ভাই
বালী –	কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি
অঙ্গদ –	বালীর পুত্র
হনুমান –	বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
বলাধ্যক্ষ –	বানরদের সেনাপতি
বিদ্যুজ্জিহ্ব –	একজন রাক্ষস

Dhaka University Institutional Repository

শঙ্কুকর্ণ – রাবণের দূত

অক্ষ ও ইন্দ্রজিৎ– রাবণের পুত্রদ্বয়

শুক, সারণ – মায়াবী দুইজন রাক্ষস

বিসমুখ – সুগ্রীবের দূত

ককুভ – বানররাজের ভৃত্য

কাঞ্চুকীয় – রাজ-অন্তঃপুরবাসী বৃদ্ধ

প্রথম বিদ্যাধর–

দ্বিতীয় বিদ্যাধর–

তৃতীয় বিদ্যাধর–

অগ্নি –

বরুণ –

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

সীতা – রামচন্দ্রের পত্নী

তারা – বালীর পত্নী

রাক্ষসীগণ –

এছাড়া অন্যের সংলাপের মাধ্যমে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত নারী চরিত্রগুলো :

মন্দোদরী – রাবণ-মহিষী

দেবী পার্বতী – হিমালয় দুহিতা

কৈকেয়ী – অযোধ্যারাজ দশরথের মহিষী, ভরত-মাতা ও রামচন্দ্রের বিমাতা

অভিষেক নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখতে পাই রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তাকে কপিরাজ্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে আড়াল থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। বালীকে হত্যা করার জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করায় বালী রামচন্দ্রকে অধর্ম করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু রাম তাঁকে যুক্তি দিয়ে তাঁর প্রাপ্য শাস্তির (ভ্রাতৃবধূর শ্লীলতাহানির অপরাধে) কথা বুঝিয়ে দিলে বালী সেটা মনে নেন এবং ইহলোক ত্যাগের পূর্বে সুগ্রীবকে কপিরাজ্য, কুলরত্ন ও হেমমালা দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর দ্বিতীয় অঙ্কে Í হনুমান সীতার খোঁজে লঙ্কায় গিয়ে অশোকবনে সীতাকে চারদিকে রাক্ষসী পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পান। লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে নানা প্রক্রিয়ায় বশীভূত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিতে হনুমান সীতার নিকট গিয়ে নিজের পরিচয় দেন এবং সীতার সংবাদ সংগ্রহ করে বিদায় নেন।

তৃতীয় অঙ্কে Í লঙ্কায় হনুমান বন্দি হন। কিন্তু দূতকে বধ করা নিয়ম বিরুদ্ধ বিধায় হনুমান পুনরায় মুক্তিও পান। এরপর রাবণের ভাই বিভীষণ রাবণকে পরিত্যাগ করে রামচন্দ্রের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং রাম তাঁকে লঙ্কার অধিপতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

চতুর্থ অঙ্কে Í রামচন্দ্র বিভীষণের নিকট থেকে সাগর অতিক্রম করার কৌশল জেনে সাগরের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে উদ্যত হলে তৎক্ষণাৎ বরুণদেব উপস্থিত হন এবং তিনি সাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রামচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে লঙ্কা গমনের পথ প্রশস্ত করে দেন। অতঃপর রামচন্দ্রের নির্দেশে নীল প্রভৃতি সেনাপতি সুবেলপর্বতে সেনানিবেশ করে।

পঞ্চম অঙ্কে Í রাবণ পুনরায় সীতাকে বশীভূত করার নিমিত্তে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে তাঁর এক রাক্ষস অনুচরের মাধ্যমে রাম-লক্ষণের মায়ামুণ্ড সীতাকে দেখালে সীতা শোকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এদিকে রাবণ দূতের নিকট থেকে লক্ষণ কর্তৃক পুত্র ইন্দ্রজিৎ হত্যার সংবাদ জেনে শোকে মূর্ছা যান এবং সমস্ত কিছুর জন্য সীতাকে দায়ী করে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হন। কিন্তু স্ত্রী হত্যা নিয়ম বিরুদ্ধ বিধায় তিনি সেকাজ থেকে বিরত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে Í বিদ্যাধরদের কথোপকথনের মাধ্যমে রাম কর্তৃক রাবণবধের কাহিনি জানা যায়। এরপর বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্র সীতার উপস্থিতি জেনেও পরগৃহে বাস করার সুবাদে কলঙ্কিতা সীতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করতে চান। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ সব ব্যবস্থাই করে দেন। সীতা অগ্নিতে ঝাঁপ দিলে অগ্নিদেবতা সীতাকে রক্ষা করে রামের হাতে সমর্পণ করে বলেন যে, সীতা পবিত্র, তাই তিনি যেন তাঁকে (সীতাকে) গ্রহণ করেন। প্রত্যুত্তরে রামচন্দ্র বলেন যে, সীতার পবিত্রতার বিষয়ে তিনি সবই জানতেন, কিন্তু লোক অপবাদের ভয়েই তিনি সীতাকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করতে চাননি। পরিশেষে দিব্যগন্ধর্বদের সংগীত ও রামের রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিষেক নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যা ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি। যেমন, বালী বধের কারণ, অঙ্গদের বিলাপ, হনুমান কর্তৃক সীতাকে চিনতে পারার সময়, বরুণদেবের আবির্ভাব, বিভীষণের রামচন্দ্রের পক্ষে যোগদানের উদ্দেশ্য প্রভৃতি। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে, যুদ্ধে পরাজিত সুগ্রীবের কাতর অনুরোধে রাম বালীকে শরবিদ্ধ করেন।[৩] কিন্তু *অভিষেক* নাটকে রয়েছে, রামচন্দ্র সুগ্রীবের জীবনরক্ষায় হনুমানের অনুরোধে বালীকে বধ করেন। তাই তো রামকে উদ্দেশ্য করে হনুমানের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় :

> বলবান্ বানরেন্দ্রস্তু দুর্বলশ্চ পতির্মম।
> অবস্থা শপথশ্চৈব সর্বমার্যেণ চিন্ত্যতাম্ ॥
> *অভিষেকঃ*, ১/১৫[৪]

অর্থাৎ, বানরশ্রেষ্ঠ বালী শক্তিশালী, আর আমার প্রভু সুগ্রীব হীনবল। তাই প্রভুর বর্তমান পরিস্থিতি এবং আপনাদের দেওয়া কথা সবই এখন আপনার বিচারের অধীন।

প্রতি উত্তরে রাম বলেন :

> হনূমন্ ! অলমলং সম্ভ্রমেণ। এতদনুষ্ঠীয়তে। (শরং মুক্ত্বা) হন্ত পতিতো বালী।[৫]

অর্থাৎ, হনুমান উদ্বিগ্ন হয়ো না। কেন না, আমার যা করণীয় আমি করছি। (শর নিক্ষেপ করে) এই তো বালীর বধ অনিবার্য।

রামায়ণে বালীর মৃত্যুর পর বালীর পত্নী তারার দীর্ঘ বিলাপ লিপিবদ্ধ হয়েছে; কিন্তু *অভিষেক* নাটকে বালীর পুত্র অঙ্গদের এক মর্মস্পর্শী বিলাপ দৃষ্ট হয়। এখানে তারার কোনো বিলাপ স্থান পায়নি। এই অঙ্গদ-বিলাপ ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি। এছাড়া রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, হনুমান অশোকবনে রাবণ ও সীতার কথোপকথনের পূর্বেই সীতাকে চিনতে পেরেছিলেন। অথচ *অভিষেক* নাটকে বর্ণিত হয়েছে যে, হনুমান রাবণ-সীতার সংলাপ শোনার পর সীতাকে চিনতে পারেন। আবার রামায়ণের সমুদ্রবন্ধনের সঙ্গে *অভিষেক* নাটকের সাগর পাড়ির ঘটনারও পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রামায়ণে রামের সমুদ্রবন্ধনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় *অভিষেক* নাটকে সেরূপ বর্ণনার উল্লেখ দেখা যায় না। ভাস সাগর পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে বরুণদেবের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। নাটকে বরুণদেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করে রামচন্দ্র ও তাঁর সেনাবাহিনীকে পথ করে দেন। রামায়ণে বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের সঙ্গে থাকা। পক্ষান্তরে *অভিষেক* নাটকে দেখা যায়, বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দেন লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষসজাতিকে রক্ষা করার নিমিত্তে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনায় লক্ষ করা যায় যে, ভাস শুধুমাত্র নাটকের ঘটনা প্রবাহেরই পরিবর্তন ঘটাননি, কতিপয় বিখ্যাত চরিত্রেরও পরিবর্তন সাধন করেছেন, তদুপরি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বালীর চরিত্রকে ভাস নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। অন্যায় যুদ্ধে বালীর ধ্বংস দেখিয়ে ভাস তাঁকে ভাগ্যবিড়ম্বিত পুরুষশ্রেষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। যেমন, তিনি প্রতিমানাটকের কৈকেয়ীর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বরুণদেবের চরিত্র সৃষ্টি পুরোটাই ভাসের এক অভিনব সংযোজন। সর্বোপরি রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করার জন্য সুগ্রীবের সাহায্য গ্রহণের নিমিত্তে রাম কর্তৃক বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কপিরাজ্যে অভিষিক্ত, বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে এবং সবশেষে সীতাকে উদ্ধার করে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকই উক্ত নাটকের মূলীভূত বিষয়। আলোচ্য নাটকে তিনটি অভিষেকের কথা বলা হয়েছে : (১) সুগ্রীবের কপিরাজ্যে অভিষেক; (২) বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেক; এবং (৩) রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক। আর এই তিনটি অভিষেককে কেন্দ্র করেই নাটকটির নামকরণ *অভিষেকঃ* যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, নারীর অমর্যাদাকারী বালী ও রাবণের পতন তথা মৃত্যু এবং সতীসাধ্বী নারীর মূর্ত প্রতীক সীতাদেবীকে উচ্চাসনে আরোহণই *অভিষেক* নাটককে স্বকীয় মহিমায় অভিষিক্ত করেছে।

৪.৩ মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটক

ক. *দূতবাক্যম্* : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *দূতবাক্যম্*-এ কোনো নারীচরিত্র নেই। মাত্র ছয়টি পুরুষচরিত্র রয়েছে।

পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার – রঙ্গাধ্যক্ষ

কাঞ্চুকীয় – বাদরায়ণ, দুর্যোধনের ভৃত্য

দুর্যোধন – কৌরব প্রধান

বাসুদেব – শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব পক্ষের দূত

সুদর্শন – শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ

ধৃতরাষ্ট্র – দুর্যোধন-জনক

দূতবাক্যে প্রত্যক্ষভাবে কোনো নারীচরিত্র না থাকলেও অন্যের সংলাপের মাধ্যমে উল্লিখিত একটি নারীচরিত্র হলো :

দ্রৌপদী – পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী

Dhaka University Institutional Repository

দূতবাক্যম্-এর কাহিনিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাগত হলে কুরু ও পাণ্ডব দুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষিত হয়। ঠিক সেই সময় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে কৌরব সভায় উপস্থিত হন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার প্রয়াসে। তিনি পাণ্ডবদের সদিচ্ছার কথা জানান। কিন্তু দুর্যোধন অবজ্ঞাভরে এই শান্তিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তদুপরি আরো ঘোষণা করেন যে, সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গ যেন কৃষ্ণকে কোনো রকম শ্রদ্ধা না দেখান। এছাড়া দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃণ্যভাবে অপমান করার নিমিত্তে কাঞ্চুকীয়কে দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার চিত্র তুলে ধরতে আদেশ দেন। অতঃপর দুর্যোধন ও শ্রীকৃষ্ণের তীব্র বাদানুবাদ, কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তি ইত্যাদির এক পর্যায়ে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। ফলশ্রুতিতে দুর্যোধন দেখেন যে, দুর্যোধন কর্তৃক আদিষ্ট রাজাগণ কেশবকে বাঁধতে গিয়ে নিজেরাই পাশাবদ্ধ হয়ে যান। তিনি (দুর্যোধন) নিজেও অবশ, অক্ষম হয়ে পড়েন। সামনে পিছনে সর্বত্রই কেবল কেশব আর কেশব। এই ছোট, এই বড়, এই দেখা যায়, এই দেখা যায় না—এ যেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আলোচ্য একাঙ্কের শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকীর্তনের মানসে তাঁর প্রধান অস্ত্র সুদর্শনকে চরিত্র হিসেবে অবতীর্ণ হতে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অতিথি-পরায়ণতা, করুণ মিনতি ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে নাট্যকাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে।

আলোচ্য একাঙ্কের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূতরূপে কৌরসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের সদিচ্ছার কথা জানান। তাই উক্ত একাঙ্কের *দূতবাক্যম্* নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

দূতবাক্যম্-এর কাহিনি মহাভারত থেকে গৃহীত হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে ভাসের নিজস্ব উদ্ভাবন লক্ষণীয়। প্রথমেই ধরা যাক কৌরব সভায় আগত কৃষ্ণের সম্মুখে দুর্যোধনের আদেশে কাঞ্চুকীয় কর্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার চিত্র প্রদর্শন। এ ছাড়া দুর্যোধন কর্তৃক কৃষ্ণকে কটূক্তি, ভর্ৎসনা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অস্ত্র সুদর্শনকে চরিত্রে রূপায়ণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাসের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এসব ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় যথাক্রমে ভবভূতির *উত্তররামচরিতম্* নাটকের প্রথম অঙ্কের চিত্রদর্শনের কথা ও মহাকবি মাঘ রচিত *শিশুপালবধম্* মহাকাব্যের পঞ্চদশ সর্গে বর্ণিত শিশুপালের মুখে কৃষ্ণনিন্দার কথা।

প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগের দিন কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যেকার বিবাদ মিটিয়ে ফেলার মানসে দূতরূপে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আনীত শান্তিপ্রস্তাব দুর্যোধন কর্তৃক হেয় ভরে প্রত্যাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণকে অসম্মান, ভর্ৎসনা ও কটূক্তি করা এবং পরিণতিতে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনই দূতবাক্যের মূলীভূত বিষয়। সবশেষে বলা যায় যে, *দূতবাক্যে* দুর্যোধন দূতরূপী কৃষ্ণের শান্তিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও এ দৌত্যকর্মের সাফল্যের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে। পাণ্ডবসখা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বেশ্বর বিশ্বম্ভর কেশবের সাক্ষাতে তৃপ্ত হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে দুর্যোধনের জীবনও হয়েছে ধন্য।

খ. *কর্ণভারম্* : পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, *দূতবাক্যের* ন্যায় কর্ণভারেও কোনো নারীচরিত্র নেই এবং মাত্র পাঁচটি পুরুষচরিত্র বিদ্যমান। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার –	রঙ্গাধ্যক্ষ
ভট –	কর্ণের ভৃত্য
কর্ণ –	কৌরবপক্ষের অধিনায়ক
শল্য –	কর্ণের রথের সারথি
ইন্দ্র –	ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ

আলোচ্য নাটকেও প্রত্যক্ষভাবে কোনো নারীচরিত্র না থাকলেও অন্যের সংলাপে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত দুইটি নারীচরিত্র লক্ষণীয় :

কুন্তী –	কর্ণের গর্ভধারিণী মাতা
রাধা –	কর্ণের পালিতা মাতা

কর্ণভারে প্রথমেই দেখা যায়, যুদ্ধের সাজে সজ্জিত কর্ণ কৌরবপক্ষের অধিনায়ক হিসেবে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত। তাঁর রথের সারথি শল্যরাজের প্রতি কর্ণের নির্দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখেই যেন তাঁর রথের অবস্থান হয়। কথা প্রসঙ্গে কর্ণ শল্যকে তাঁর অস্ত্রশিক্ষার কাহিনি শোনান। তিনি বলেন যে, সে-সময়ে তিনি মিথ্যা বলার জন্য গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হন। এই অভিশাপের কারণেই যুদ্ধের সময় তাঁর অস্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকে। হঠাৎ পিছন থেকে ধীরগম্ভীর কণ্ঠে ব্রাহ্মণের বেশধারী ইন্দ্র বলেন, হে কর্ণ মহাভিক্ষা চাই। কর্ণ তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক একের পর এক অমৃততুল্য দুধের ধারা বর্ষণকারী সহস্র গাভী, অশ্ব, গজ, স্বর্ণ, পৃথিবী, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল, নিজের মস্তক, প্রভৃতি দান করতে চাইলেও যখন এসব কিছুই তাঁর কাম্য নয় বলেন, তখন কর্ণ তাঁর দেহরক্ষার উপকরণ জন্মগতভাবে প্রাপ্ত কবচকুণ্ডল দান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ উৎফুল্ল চিত্তে সেটা গ্রহণ করতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। কর্ণের মনে সন্দেহ হয় Í ঘটনাটা কৃষ্ণের চক্রান্ত কিনা! কিন্তু তিনি তাঁর সন্দেহকে প্রশ্রয় দেন না। যেহেতু তিনি কবচকুণ্ডল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই শল্য বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি সেটা দান করেন। অতঃপর একজন দেবদূত কর্ণকে জানান যে, ইন্দ্র অনুতপ্ত হয়ে কর্ণকে 'বিমলা' নামে একটি শক্তি অস্ত্র পাঠিয়েছেন যেটি প্রয়োগ করে তিনি পাণ্ডবদের

Dhaka University Institutional Repository

যেকোনো একজনকে বধ করতে সমর্থ হবেন। প্রথমত কর্ণ প্রতিদান গ্রহণ করতে সম্মত হন না। অবশেষে ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করতে না পেরে তা গ্রহণ করেন। কর্ণ যখনই অস্ত্রটি পেতে ইচ্ছুক হবেন, তখনই তিনি সেটি পাবেন।একথা বলে দেবদূত নিষ্ক্রান্ত হন। পরিশেষে কর্ণ রণক্ষেত্রে শল্যরাজকে রথচালনার আদেশ দেন এবং বুঝতে পারেন যে, রাগান্বিত অর্জুন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

আলোচ্য কাহিনিতে লক্ষ করা যায় যে, কর্ণভারের উৎস মহাভারত হলেও এতে মহাভারতের কাহিনি থেকে বেশকিছু পার্থক্য বিদ্যমান। মহাভারতে পাণ্ডবদের বনবাসে অবস্থানকালে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল প্রার্থনার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু ভাস উক্ত কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন কর্ণের যুদ্ধযাত্রার প্রারম্ভে। মহাভারতে স্বয়ং কর্ণই শক্তি অস্ত্র পেতে চেয়েছেন; আর ভাস এক্ষেত্রে ইন্দ্রের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইন্দ্র নিজেই অনুতপ্ত হয়ে দেবদূতের মাধ্যমে কর্ণকে শক্তি অস্ত্র প্রদান করেন। এছাড়া মহাভারতে দুটি অভিশাপের কাহিনি উল্লেখিত হয়েছে; পক্ষান্তরে ভাস উল্লেখ করেছেন একটি অভিশাপের কাহিনি : পরশুরামের অভিশাপ। তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপের বিষয়টি বাদ দিয়েছেন যেটি মহাভারতে বিদ্যমান। তদুপরি ঘটনার কালানুক্রমিতা, চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ভাস ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। যেমন, ভাস শল্য চরিত্রকে মহাভারত অপেক্ষা অধিক হৃদয়বান, বিশ্বস্ত ও কর্ণের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে অঙ্কিত করেছেন। এসবই নাট্যকার ভাসের সৃজনী প্রতিভার পরিচায়ক।

প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের প্রখ্যাত কর্ণচরিত্রের বীরত্বগাথা, ঔদার্য, সৌজন্য, বদান্যতা, শ্রদ্ধা ও আত্মত্যাগের মহিমাই আলোচ্য একাঙ্কিকার মূলীভূত বিষয়। পরিশেষে বলা যায় যে, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কর্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল প্রদানের প্রতিশ্রুতির পূর্ব পর্যন্ত এটা ছিল কর্ণের নিকট ভারস্বরূপ। আবার যুদ্ধযাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কর্ণের দুঃশ্চিন্তার ভারও ভাসকে সমভাবে প্রভাবিত করেছে। আর এসব কারণেই উক্ত রূপকের *কর্ণভারম্* নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

গ. পঞ্চরাত্রম্ : পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, *পঞ্চরাত্রম্*-এ কোনো নারীচরিত্র নেই এবং এতে মোট বিশটি পুরুষচরিত্র বিদ্যমান। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার	–	রঙ্গাধ্যক্ষ
ভীষ্ম	–	কুরু-পাণ্ডবদের পিতামহ
দ্রোণ	–	কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু
কর্ণ	–	অঙ্গরাজ, দুর্যোধনের মিত্র

Dhaka University Institutional Repository

শকুনি – গান্ধাররাজ, দুর্যোধনের মাতুল

দুর্যোধন – নাটকের নায়ক, হস্তিনার অধিপতি এবং কুরুরাজ

অভিমন্যু – অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র

ভগবান – ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির

ভীমসেন – মধ্যম পাণ্ডব

বৃহন্নলা – ছদ্মবেশী অর্জুন

রাজা – বিরাটরাজ

সূত – সারথি

উত্তর – বিরাট-রাজপুত্র

ভট – জয়সেন নামে এক সৈনিক প্রহরী

বৃদ্ধ গোপালক – জনৈক গোপালক

গোমিত্রক – অন্য এক গোপালক

কাঞ্চুকীয় – অন্তঃপুরগামী বৃদ্ধ

প্রথম ব্রাহ্মণ

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

আলোচ্য নাটকে প্রত্যক্ষভাবে কোনো নারীচরিত্র না থাকলেও প্রসঙ্গক্রমে অন্যদের সংলাপের মাধ্যমে উল্লিখিত নারীচরিত্রগুলো হলো :

অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ

স্ত্রীলোক ও সন্তানহারা জননী

দ্রৌপদী – দ্রুপদ-রাজতনয়া, পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী, ও অভিমন্যুর বিমাতা

সীতা – রাবণ কর্তৃক অপহৃতা রামচন্দ্রের সহধর্মিণী

গোপমায়েরা

গোপ বালিকারা

গোরক্ষাণিকা – গোপ বালিকা

উত্তরা – বিরাট-রাজকন্যা

ভীমসেন-মাতা – কুন্তী

Dhaka University Institutional Repository

সুভদ্রা – অর্জুন-পত্নী ও অভিমন্যু-জননী

স্ত্রীলোকগণ

পঞ্চরাত্রম্-এর কাহিনিতে প্রথমাঙ্কে হস্তিনাধিপতি দুর্যোধনকৃত অনুষ্ঠিত যজ্ঞ এবং যজ্ঞাগ্নির মনোমুগ্ধকর বর্ণনা তিনজন ব্রাহ্মণের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, শকুনি, কর্ণ ও দুর্যোধন প্রমুখের উপস্থিতি যজ্ঞস্থলের শোভাবর্ধন করে। তদুপরি যজ্ঞোৎসবে আগত রাজমণ্ডলীর মধুর বাক্যে দুর্যোধনের জয় ঘোষিত হয়। যজ্ঞশেষে সকলেই দুর্যোধনকে অভিনন্দন জানায়। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য তাঁর ধর্মকার্যের প্রশংসা করেন। দুর্যোধনের হৃদয়ও শ্রদ্ধায় পরিতৃপ্ত হয়ে উঠে। তিনি গুরু দ্রোণাচার্যকে যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দ্রোণাচার্য প্রথমে দক্ষিণা গ্রহণে অনাগ্রহী হলেও পরবর্তীতে ভীষ্মের অনুরোধে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। দক্ষিণা হিসেবে তিনি পাণ্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কূটস্বভাব দুর্যোধন-মাতুল শকুনি এটাকে ধর্মবঞ্চনা হিসেবে ব্যাখ্যা করে তীব্র বিরোধিতা করেন। তবে দুর্যোধন দক্ষিণা প্রদানে বদ্ধপরিকর। অবশেষে শকুনির উপদেশ অনুযায়ী পাঁচরাত্রির মধ্যে অজ্ঞাতবাসী পাণ্ডবদের সংবাদ পাওয়া সাপেক্ষে রাজ্যার্ধ প্রদানে সম্মত হন। আর ঠিক তখনই দূতের মাধ্যমে জানা যায় যে, কীচকেরা শত ভাই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিতভাবে শুধু বাহুবলে নিহত হয়েছেন। আর এ কারণেই রাজা বিরাট দুর্যোধনের যজ্ঞোৎসবে উপস্থিত হতে পারেননি। প্রাজ্ঞ ভীষ্ম সঙ্গে সঙ্গে এ হত্যাযজ্ঞে ভীমসেনের ভূমিকা অনুধাবন করে দ্রোণাচার্যকে শর্ত মেনে নেওয়ার অনুরোধ করলে দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের শর্ত মেনে নেন। তদুপরি ভীষ্ম যুক্তিসহ বলেন যে, বিরাট রাজা দুর্যোধনের যজ্ঞোৎসবে না এসে মূলত তাঁকে (দুর্যোধন) অপমানই করেন। আর এ কারণে এবং পূর্বশত্রুতার জের ধরে ভীষ্ম বিশাল কৌরব বাহিনী নিয়ে বিরাট রাজার গোধন হরণের প্রস্তাব রাখেন। সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হলে দুর্যোধন বিরাট রাজার গোধন হরণের নিমিত্তে যুদ্ধযাত্রা করেন।

অতঃপর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই বিরাট রাজার গোপালকদের কথোপকথন ও আনন্দ-উৎফুল্লতা বর্ণিত হয়। এরই মধ্যে বৃদ্ধ গোপালক অশুভ ইঙ্গিত অনুধাবন করেন। অকস্মাৎ ধুলিবায়ু, যুদ্ধদুন্দুভির শব্দ ও গাভীদের ভয়ার্ত চিৎকারে সে-ইঙ্গিতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিরাট রাজাকে গোধন হরণের বিষয়টি জানানো হয়। বৃহন্নলাকে সারথি করে বিরাট-রাজপুত্র উত্তর আক্রমণকারী কৌরব বাহিনীকে প্রতি আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কৌরব বাহিনীকে পরাজিত করে গোধন উদ্ধার করা হয়। কৌরব পক্ষের কুমার অভিমন্যু রন্ধনশালার পাচক ছদ্মবেশী ভীম কর্তৃক ধৃত হন। তাঁকে বিরাট সভায় ছদ্মবেশী ভীম ও অর্জুনের সম্মুখে আনা হয়। কিন্তু অভিমন্যু ভীম, অর্জুন ও পাণ্ডবদের চিনতে পারেন না। ছদ্মবেশী ভীম

Dhaka University Institutional Repository

(পাচক) ও অর্জুনের (বৃহন্নলা) সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপের মাধ্যমে হাস্যরসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ক্ষত্রিয়তেজে দীপ্তিমান কুমার অভিমন্যুর বাক্যে পিতা ও পিতৃব্যের প্রতি তাঁর গৌরব শ্লাঘা প্রকাশিত হয়। নাম ধরে ডাকায় অভিমন্যু বিরক্ত হন। এ হেন পরিবেশের এক পর্যায়ে হঠাৎ বিরাট-কুমার উত্তর যুদ্ধে প্রকৃত কৃতিত্বের অধিকারী বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় সকলকে জানান। এ সময় ভগবানবেশী যুধিষ্ঠিরও তাঁদের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হওয়ায় আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন। ক্রমান্বয়ে অভিমন্যুর নিকট পিতা ও পিতৃব্যদের পরিচয় প্রকাশিত হয়। রাজা বিরাট বিজয়ের শুল্ক (পণ) হিসেবে অর্জুনের হাতে রাজকুমারী উত্তরাকে দান করতে চাইলে অর্জুন উত্তরাকে অভিমন্যুর বধূরূপে গ্রহণ করেন এবং সেদিনই শুভ নক্ষত্রে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবেIএই সংবাদ দিয়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট বিরাট-কুমার উত্তরকে পাঠান।

তৃতীয় অঙ্কে অভিমন্যু শত্রু কর্তৃক বন্দি হওয়ায় কৌরব শিবিরে একটি চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কৌরবদের জন্য এ ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক বলা হয়। বিভিন্ন কথাবার্তায় অভিমন্যুর প্রতি দুর্যোধন এবং কর্ণের মমতা ও স্নেহপরায়ণতা প্রকাশ পায়। কিন্তু শকুনির ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব প্রকাশিত হয়। এক পর্যায়ে ভীষ্মের রথের ধ্বজায় অর্জুনের নামাঙ্কিত বাণ আবিষ্কৃত হয়। তবুও যুধিষ্ঠিরের সন্ধান না পেলে পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করতে দুর্যোধন অস্বীকার করেন। এমন সময় যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রেরিত বিরাট-কুমার উত্তর ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন এবং অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ের শুভসংবাদ জানান। অতঃপর দ্রোণাচার্য শর্তানুযায়ী পঞ্চরাত্র অতিক্রম না করায় দুর্যোধনকে বলেন,

> ... ধর্মেণাবর্জিতা ভিক্ষা ধর্মেণৈব প্রদীয়তাম্।
>
> *পঞ্চরাত্রম্*, ৩/২৪[৬]

> অর্থাৎ, ধর্মকে ভিত্তি করে যে ভিক্ষা (দক্ষিণা) প্রার্থনা করেছি, ধর্মের মাধ্যমেই তা প্রদান করা হোক।

দুর্যোধনও সত্যে অবিচল থেকে পূর্বপ্রদত্ত বাক্যানুসারে পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করেন। এভাবে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হওয়ায় দ্রোণাচার্য অত্যন্ত আনন্দিত মনে কুরুবংশের মঙ্গলকামনা করেন।

উপরিউক্ত কাহিনিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পঞ্চরাত্রের কাহিনি মহাভারত থেকে গৃহীত হলেও আলোচ্য নাটকের (রূপকের) পরিসমাপ্তিতে নাট্যকার পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে মিত্রতা

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়ে মহাভারতের মূলবক্তব্য থেকে সরে এসেছেন। কারণ পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যদি শত্রুতাই বিরাজ না করত তাহলে তো আঠার দিন ব্যাপী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রশ্নই উঠত না। যা মহাভারতের মূলবক্তব্য বিষয়। এ ছাড়া দুর্যোধনের যজ্ঞে ব্রতী হওয়া, যজ্ঞ শেষে দুর্যোধনের দ্রোণাচার্যকে দক্ষিণাদানের ইচ্ছাপোষণ, দক্ষিণাস্বরূপ দ্রোণের বনবাসী পাণ্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা, মাতুল শকুনির বিরোধিতা, পাঁচরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ সংগ্রহের শর্তারোপ, দ্রোণাচার্য কর্তৃক শর্তে সম্মতিজ্ঞাপন ইত্যাদি ঘটনা একেবারেই ভাসের অভিনব ও মৌলিক সংযোজন। তদুপরি গুপ্ত আততায়ীর বাহুবলে শত কীচক নিহত হওয়ার সংবাদের মাধ্যমে ভীষ্ম পাঁচরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্তেই মূলত যজ্ঞে বিরাটরাজের অনুপস্থিতিকে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে দুর্যোধনকে বিরাট রাজ্যের গোহরণযুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। কেননা, ভীষ্ম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, বাহুবলে শত কীচক মৃত্যু মানেই দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের কাজ। আর গোহরণ ঘটনার সঙ্গে ভীষ্মের উদ্দেশ্যের যোগসূত্র স্থাপনও ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, শত কীচক বধ হয়েছে গন্ধর্বের আক্রমণের ফলে, ভীম কর্তৃক নয়। এছাড়া ছদ্মবেশী ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে অভিমন্যুর কথোপকথনের দৃশ্যও নাট্যকার ভাসের অভিনব সংযোজন।

চরিত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ভাস দুর্যোধনকে সত্যের অনুসারী দেখিয়ে মহৎ চরিত্রের অধিকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তাই তো পাঁচরাতের মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ জানার পর দ্রোণাচার্য যখন দুর্যোধনের নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁদের জন্য অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করেন, তখন দুর্যোধন বলেন :

> রাঢ়ং দত্তং ময়া রাজ্যং পাণ্ডবেভ্যো যথাপুরম্।
> মৃতেঽপি হি নরাঃ সর্বে সত্যে তিষ্ঠন্তি তিষ্ঠতি ॥
>
> *পঞ্চরাত্রম্*, ৩/২৫[৭]

> অর্থাৎ, অবশ্যই! আগে যেমন বলেছি ঠিক তেমনিভাবেই পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্যদান করলাম। কেন না মানুষ মরণশীল হলেও সত্যরক্ষার মাধ্যমেই বেঁচে থাকে।

পক্ষান্তরে, মহাভারতের দুর্যোধন ঠিক এর উল্টো। উরুভঙ্গের আলোচনায় সেটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে, ভাস দুর্যোধনকে যতই মহত্ত্বের আবরণে আচ্ছাদিত করুন না কেন, মূলে (মহাভারতে) বর্ণিত দুর্যোধনের যে প্রকৃতস্বভাব তার একটু হলেও উক্ত নাটকে (রূপকে) প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, পঞ্চরাত্রের কাহিনিতে লক্ষিত হয় যে, অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু কৌরব পক্ষের যোদ্ধা হয়েও যজ্ঞশেষে দুর্যোধনকে অভিনন্দন জানিয়ে কোনো প্রত্যুত্তর পাননি এবং দক্ষিণাদানের সিদ্ধান্তের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারেও দুর্যোধন ভীষ্ম, কর্ণ প্রমুখকে বাদ দিয়ে তাঁর কূটবুদ্ধি সম্পন্ন মাতুল শকুনির উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী হন। এ হেন মনোভাব তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবেরই কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ বলা যায়।

পাঁচরাতের মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ জানাতে পারলেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করবেন Í এই প্রতিশ্রুতির শর্তকে অবলম্বন করেই আলোচ্য নাটকের (রূপকের) নামকরণ *পঞ্চরাত্রম্* যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, দ্রোণাচার্য কর্তৃক দুর্যোধন প্রদত্ত যজ্ঞোৎসবের দক্ষিণা স্বরূপ বনবাসী পাণ্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজ্য উদ্ধার করাই আলোচ্য নাটকের (রূপকের) মূলীভূত বিষয়। সুতরাং, ন্যায় ও ধর্মের পক্ষে কৃতকর্মকেই সর্বকালে সর্বসময় সাফল্যে পর্যবসিত হতে দেখতে পাওয়া যায়।

ঘ. *দূতঘটোৎকচম্* : *দূতঘটোৎকচম্*-এর চরিত্রসমূহের মধ্যে পুরুষচরিত্র সাতটি এবং নারীচরিত্র তিনটি। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার – রঙ্গাধ্যক্ষ

ভট – জয়ত্রাত নামে সংবাদ বহনকারী সৈনিক

ধৃতরাষ্ট্র – দুর্যোধনের পিতা

দুর্যোধন – কৌরবদের অধিপতি

দুঃশাসন – দুর্যোধনের অনুজ

শকুনি – দুর্যোধনের মাতুল

ঘটোৎকচ – দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পুত্র

এবং নারীচরিত্রগুলো হল :

গান্ধারী – দুর্যোধন-মাতা

দুঃশলা – দুর্যোধনের ভগ্নী, জয়দ্রথের স্ত্রী

প্রতিহারী – দ্বাররক্ষিকা

এছাড়া অন্যদের সংলাপের মাধ্যমে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত নারীচরিত্র হলো :

বধূ উত্তরা – অভিমন্যু-পত্নী

দ্রৌপদী – পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী ও দুর্যোধনের ভ্রাতৃবধূ

Dhaka University Institutional Repository

দূতঘটোৎকের কাহিনিতে প্রথমেই অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বিপর্যস্ত ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি বুঝতে পারেন, অভিমন্যুর হত্যাকারী তাঁরই জামাতা জয়দ্রথের মৃত্যু আসন্ন। কন্যা দুঃশলাও নিজের বৈধব্যের কথা ভেবে কাঁদতে থাকেন। অন্যদিকে, অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে উল্লাসপূর্ণ হৃদয়ে দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হন। এঁরা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ক্ষুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাগে, দুঃখে বলেন :

সৌভদ্রে নিহতে বালে হৃদয়ে কৃষ্ণপার্থয়োঃ।
জীবিতে নিরপেক্ষাণাং কথমাশীঃ প্রযুজ্যতে?
দূতঘটোৎকচম্, ১৫[৮]

অর্থাৎ, কৃষ্ণ ও পার্থের জীবনতুল্য অভিমন্যুকে হত্যা করে যারা, তাদের তো নিজেদের পরিণতি সম্পর্কেই ধারণা নেই, তাদের আবার আশীর্বাদ করা কিসের?

তিনি আরো বলেন যে, এ ছাড়া তার শতপুত্রের মধ্যে একমাত্র যে কন্যা দুঃশলা তাকেও বৈধব্যবরণ করে মাসুল দিতে হবে। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের মধ্যে শুরু হয় তর্ক। দুঃশাসনও যুক্তি দেখায়। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের স্মৃতিতে ভেসে উঠে অর্জুনের অসাধারণ বীরত্ব ও ভবিষ্যতে তার প্রচণ্ড আক্রোশসহ আক্রমণের কথা। তিনি এ ঘটনার জন্য পুরোপুরি দায়ী করেন শকুনিকে। তিনি বলেন যে, অন্যায় পাশা খেলে যে আগুন শকুনি জ্বালিয়েছে তাতে তাঁর বংশের একজন শিশুও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। এরই মধ্যে হঠাৎ পাণ্ডবশিবির থেকে হর্ষধ্বনির আওয়াজ শোনা যায়। দুর্যোধন সৈনিক পাঠিয়ে জানতে পারেন যে, এ আওয়াজ ছিল অর্জুন কর্তৃক গৃহীত প্রতিজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে পাণ্ডবদের উৎফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ। প্রাণপ্রিয় পুত্রের হত্যাকারীকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে বলেন,

যেন মে নিহতঃ পুত্রস্তুষ্টিং যে চ হতে গতাঃ।
শ্বঃ সূর্যেঽস্তমসম্প্রাপ্তে নিহনিষ্যামি তানহম্ ॥
দূতঘটোৎকচম্, ২৯[৯]

অর্থাৎ, আমার পুত্রকে যে হত্যা করেছে এবং একারণে যারা আনন্দিত হয়েছেন তাদের সবাইকে আমি কাল সূর্যাস্তের পূর্বেই হত্যা করব।

অর্জুন আরো বলেন যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারলে তিনি গাণ্ডীবসহ চিতায় আরোহণ করবেন। এদিকে দুর্যোধনও অর্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফল করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিশ্বাসও করেন যে তিনি তাঁর সমস্ত মিলিতবাহিনীর দ্বারা জয়দ্রথকে আগলিয়ে রেখে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করে দিবেন। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

জয়দ্রথ আকাশে বা পাতালে যেখানেই থাক না কেন — অর্জুনের তীর সেখান থেকেই তাকে খুঁজে নিবে বলে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। এভাবে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকলে এক পর্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ নিয়ে ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের আগমন ঘটে কৌরবশিবিরে। ঘটোৎকচ তিনটি সংবাদ তিনজনকে জানানোর উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্য একটি, দুর্যোধনের জন্য একটি এবং কুরুবীরদের জন্য একটি।

প্রথমত ঘটোৎকচ ধৃতরাষ্ট্রকে জানান যে, একটিমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে অর্জুনের যে অবস্থা হয়েছে, তাহলে শতপুত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্রের যে কি পরিণতি হবেIসেটা চিন্তা করে তিনি যেন মানসিকভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তৈরি থাকেন। একথা শুনে সবাই তিরস্কারের হাসিতে মেতে উঠেন। এরপর ঘটোৎকচ দুর্যোধনকে জানান, তিনি যেন ভাল করে শুনে রাখেন যে, ক্ষত্রিয়বীরদের ধ্বংসের সময় আসন্ন। এর মাধ্যমে পৃথিবীর ভারও কমে যাবে। আর পুত্রের মৃত্যুতে যিনি অস্ত্র তুলে নিয়েছেনIসেই অর্জুনের নিকট অসাধ্য বলে কিছুই নেই। দুর্যোধন যুক্তিতে না পেরে ঘটোৎকচকে অপমান করার নিমিত্তে তাঁর রাক্ষস প্রকৃতি ও দৌত্যকর্মের প্রতি কটাক্ষ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঘটোৎকচও যুক্তিসহ প্রমাণ করেন যে, কৌরবেরা রাক্ষস অপেক্ষা অধিক নির্মম এবং দূত বলে তিনি একটুও হীনচিত্তের নন। এক পর্যায়ে ঘটোৎকচ ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে মুঠো তুলে দাঁড়িয়ে পড়েন। তখন ধৃতরাষ্ট্র ঘটোৎকচকে শান্ত করার জন্য উঠে দাঁড়ান। পিতামহের কথায় ঘটোৎকচ ক্রোধ সংযত করে শান্ত হয়ে কৃষ্ণের শেষবার্তা জানাতে সমস্ত কুরুশিবিরকে লক্ষ্য করে বলেন :

> ধর্মং সমাচর, কুরু স্বজন-ব্যপেক্ষাং
> যৎকাঙ্ক্ষিতং মনসি সর্বমিহানুতিষ্ঠ।
> জাত্যোপদেশ ইব পাণ্ডবরূপধারী
> সূর্যাংশুভিঃ সমমুপৈষ্যতি বঃ কৃতান্তঃ ॥
> *দূতঘটোৎকচম্*, ৫২[১০]

অর্থাৎ, ধর্ম আচরণ কর। স্বজনকে শ্রদ্ধা কর। মনের সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নাও। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের রূপ ধরে তোমাদের যম আসছেন।

এখানেই উক্ত নাটকের (রূপকের) পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপরিউক্ত কাহিনি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দূতরূপে ঘটোৎকচের কৌরবশিবিরে আগমনকে কেন্দ্র করে নাটকটির (রূপকটির) *দূতঘটোৎকচম্* নামকরণ যথার্থ হয়েছে। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত দূতরূপী ঘটোৎকচ—এ ধরনের ঘটনা মহাভারতের

Dhaka University Institutional Repository

কোথাও নেই। তদুপরি দুঃশলা ও গান্ধারীর বিলাপ, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধ, ঘটোৎকচ ও দুর্যোধনের জয়-পরাজয় সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদ ইত্যাদিও নাট্যকারের সংযোজন। কিন্তু অভিমন্যুবধ, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, দুর্যোধনের পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনাগুলো মহাভারত থেকেই নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, ঘটোৎকচ, গান্ধারী, দুঃশলা প্রভৃতি চরিত্রগুলোও মহাভারত থেকেই গৃহীত হয়েছে। শুধুমাত্র সূত্রধার, ভট ও প্রতিহারীর চরিত্র নাটকের প্রয়োজনে সংযোজিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দূতঘটোৎকচে নাট্যতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী ভরতবাক্য নেই। কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যকার ভাস তাঁর অসামান্য সৃজনীক্ষমতাবলে ভরতবাক্যের পরিবর্তে ঘটোৎকচের মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রশান্ত নির্দেশের মাধ্যমে আলোচ্য দৃশ্যকাব্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।যা ভরতবাক্যেরই তাৎপর্য বহন করে। সংস্কৃতসাহিত্যে এরকম উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার জানা নেই।

প্রকৃতপক্ষে দূতরূপে ঘটোৎকচ কর্তৃক সংবাদ পরিবেশন এবং দুর্যোধনের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদই উক্ত নাটকের (রূপকের) মূলীভূত বিষয়। পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ঘটোৎকচের মাধ্যমে কৌরবদের ভাবী অমঙ্গলের কথা জানানোই আলোচ্য নাটকের (রূপকের) উদ্দেশ্য। আর সেটা করতে গিয়েই অসামান্য প্রতিভাধর ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যকার ভাস মহাভারতের ঐতিহাসিক কাহিনিকে স্বীয় মেধার দ্বারা নাটকীয় কাহিনিতে পরিণত করেছেন।

৬. ***ঊরুভঙ্গম্*** **:** *ঊরুভঙ্গম্*-এর চরিত্রসমূহের মধ্যে দশটি পুরুষচরিত্র এবং তিনটি নারীচরিত্র। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার –	রঙ্গাধ্যক্ষ
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভট –	তিনজন সৈনিক
দুর্যোধন –	কৌরবদের অধিপতি
বলদেব –	বলরাম
ভীম –	দ্বিতীয় পাণ্ডব
দুর্জয় –	দুর্যোধনের পুত্র
ধৃতরাষ্ট্র –	দুর্যোধন-জনক
অশ্বত্থামা –	দ্রোণাচার্য-পুত্র

Dhaka University Institutional Repository

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

গান্ধারী – দুর্যোধন-মাতা

পৌরবী – দুর্যোধন-পত্নী

মালবী – দুর্যোধনের আরেক পত্নী

এছাড়া অন্যদের সংলাপে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত নারীচরিত্রগুলো হলো :

দ্রৌপদী – পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী

কুন্তী – পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী এবং যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন-মাতা

সুভদ্রা – অভিমন্যু জননী

উর্বশী – অপ্সরা

তিনজন সৈনিকের কথোপকথনের মাধ্যমে ঊরুভঙ্গের কাহিনি আরম্ভ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত কৌরব পক্ষের একমাত্র জীবিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধন এবং দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রতিশোধস্পৃহায় উদ্ভ্রান্ত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন গদাযুদ্ধে লিপ্ত। কুরুবংশ ও যদুবংশের পূজনীয় অভিভাবকদের সম্মুখেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন : ব্যাস, বলদেব, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখ। বীরদ্বয় প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৌশলে পরস্পরকে আঘাত করেন। একজনের কৌশল ও শক্তি অন্যজন অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নয়। গদার শব্দে চারদিক কেঁপে উঠে। তবে ভীম অপেক্ষা দুর্যোধন অধিক পারদর্শিতার পরিচয় দেন। এক সময় দুর্যোধনের তীব্র আঘাতে ভীমের মস্তক থেকে অজস্রধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। হাত-পা শিথিল হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু উক্ত পরিস্থিতিতে পাণ্ডব পক্ষ আতঙ্কিত হলেও দুর্যোধন কিন্তু ভীমকে কোনো প্রকার আঘাত না করে বরং তাঁকে অভয়বাণী শোনান। ভীমের এ হেন বিপন্ন অবস্থায় কৃষ্ণ কর্তৃক নিজ ঊরুতে আঘাতকৃত প্রদত্ত ইঙ্গিতে ভীম নব উদ্যমে যুদ্ধ করার প্রাণশক্তি লাভ করেন। তিনি শক্ত করে গদা ধরে পুনরায় সগর্জনে উঠে দাঁড়ান। নতুন করে পুনরায় গদাযুদ্ধ শুরু হলে অতর্কিতে ভীম কৃষ্ণের ইঙ্গিত অনুসারে যুদ্ধের নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে দুর্যোধনের লাফিয়ে ওঠার মুহূর্তে তাঁর দুই ঊরু গদা দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলেন। ফলে দুর্যোধন পড়ে যান। তাঁর এই পতন দেখে ব্যাসদেব আকাশে উঠেন এবং বলদেব এমন অবস্থায় দুর্যোধনকে দেখতে না পেয়ে চোখ বন্ধ করেন। আর এই সুযোগে ব্যাসদেবের নির্দেশ অনুযায়ী পাণ্ডবগণ চারদিক থেকে বাহুবেষ্টন করে ভীমকে সরিয়ে নিয়ে যান। এতে কৃষ্ণের হস্ত দুটিও ভীমকে সরে যেতে সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ভীম বলদেবের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে রণনীতি ভঙ্গ করে দুর্যোধনকে আঘাত করায় বলদেব তীব্র ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে দুর্যোধনের নিকট ভীমের রক্তাক্ত বুকে তাঁর (বলদেব) হল নিক্ষেপের প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু দূর থেকে প্রতিজ্ঞার কথা শুনতে পেয়ে দুর্যোধন বহু কষ্টে ভঙ্গ উরু নিয়ে দেহটাকে টেনে বলদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে অবনত মস্তকে তাঁকে ক্রোধ ত্যাগ করে প্রসন্ন হতে অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন যে, পাণ্ডবগণের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কেননা, দুর্যোধনদের তো সবই শেষ হয়ে গেছে। তাই কুরুবংশের পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণবারি প্রদানের জন্যেই পাণ্ডবদের বেঁচে থাকা অপরিহার্য। কিন্তু তবুও বলদেব তাঁর প্রতিজ্ঞায় অনড় দেখে দুর্যোধন বলেন যে, যুদ্ধ করে কোনো লাভই নেই—কেননা, ভীমের প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে। তাঁরও শত ভ্রাতা মৃত্যুবরণ করেছে। তদুপরি তাঁর নিজেরও করুণ পরিণতি। এছাড়া জগতের যিনি সর্বময় কর্তা সেই স্বয়ং হরিই তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন।তাই দুর্যোধন নিজেকে বঞ্চিত ভাবেন না।

অতঃপর দুর্যোধনের শিশুপুত্র দুর্জয় দুর্যোধনকে অনুসন্ধানের জন্য শোকগ্রস্ত পিতা ধৃতরাষ্ট্র, মাতা গান্ধারী এবং দুর্যোধনের দুই রানিকে পথ দেখিয়ে তাঁর নিকট নিয়ে আসেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্জয়কে পিতার কোলে বসতে বললে দুর্যোধন নিষেধ করে শোকবিহ্বল কণ্ঠে পুত্রকে বলেন :

> ত্যক্ত্বা পরিচিতং পুত্র! যত্র তত্র ত্বয়াস্যতাম্।
> অদ্যপ্রভৃতি নাস্তীদং পূর্বভুক্তং তবাসনম্ ॥
>
> *উরুভঙ্গম্*, ৪৪[১১]

> অর্থাৎ, তোমার পরিচিত এই আসনটি ব্যতীত আর যেকোনো জায়গায় তুমি বসতে পার পুত্র! আজ থেকে তোমার পূর্বের দখলকৃত সেই আসনটি আর থাকল না।

দুর্যোধন আরো বলেন যে, তিনি নিজেও আর থাকবেন না। তাঁর ভাইদের অনুগমন করবেন। একথা শুনে শিশু দুর্জয়ও তাঁর পিতার সঙ্গে যেতে ইচ্ছাপোষণ করে। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও দুই রানির সঙ্গে দুর্যোধনের সাক্ষাৎ ঘটলে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে দুঃখভারাক্রান্ত বিভিন্ন উক্তি-প্রত্যুক্তি হয়। দুর্যোধনের উক্তিতে বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। তিনি যে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হননি।সেটাও তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। সর্বোপরি তিনি পরজন্মে মাতা গান্ধারীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এবং পুত্র দুর্জয়কে পাণ্ডবদের সেবা করার আদেশ প্রদান করেন। তিনি পুত্রকে পূজনীয়া মাতা কুন্তীর আদেশ পালন করতে, অভিমন্যু-জননী (সুভদ্রা) ও দ্রৌপদীকে মাতৃরূপ শ্রদ্ধা করতে এবং দুর্যোধনের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের ক্ষৌমবস্ত্রে-আচ্ছাদিত ডান বাহু স্পর্শ করে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে তিল-জল দান প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতে আদেশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ হেন শোকাকুল যুদ্ধক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে অশ্বত্থামার আবির্ভাব ঘটে। তিনি পাণ্ডবগণসহ কৃষ্ণকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার ঘোষণা দিলে দুর্যোধন তাঁকে নিষ্ফল চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বলেন। এতে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের উরুর সঙ্গে সঙ্গে দর্পও ধ্বংস হয়েছে বললে দুর্যোধন বলেন যে, দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, যুদ্ধে বালক অভিমন্যুকে হত্যা, কপট পাশাখেলায় পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠানো প্রভৃতির তুলনায় তাঁর দর্পের পতন ঘটাতে পাণ্ডবগণ খুব সামান্যই করেছে। কিন্তু তবুও অশ্বত্থামা নিবৃত্ত হন না। তিনি নৈশযুদ্ধে পাণ্ডবদের দগ্ধ করার শপথ গ্রহণ করেন। তাঁকে সমর্থন করেন বলদেব। ইতোমধ্যে অশ্বত্থামা অভিষেক অনুষ্ঠান ব্যতীতই শুধুমাত্র ব্রাহ্মণবাক্যবলে দুর্যোধন-পুত্র দুর্জয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এ দৃশ্য দেখে দুর্যোধনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় "হন্ত! কৃতং মে হৃদয়ানুজ্ঞাতম্।"[১২] অর্থাৎ, ওহে আমার মনমতো কার্য সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর দুর্যোধন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের মোহে আবিষ্ট হয়ে স্বর্গে গমনের বিভিন্ন রকম সুখময় দৃশ্য অবলোকন করতে করতে চিরদিনের জন্য পৃথিবী ত্যাগ করেন। আর তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রহীন রাজ্যকে ধিক্কার দিয়ে সৎলোকদের নিকট নিরাপদ ও আকর্ষণীয় আবাসভূমি তপোবনে গমনের সিদ্ধান্ত নেন। অশ্বত্থামাও তীর-ধনুক হস্তে সেই রাতেই সৌপ্তিকবধের নিমিত্তে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন। এরপর ভরতবাক্যের মাধ্যমে নাটকটির (রূপকটির) সমাপ্তি ঘটে।

উপরিউক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে সংঘটিত গদাযুদ্ধে ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের ঘটনাই আলোচ্য একাঙ্কিকার মূলীভূত বিষয়। তাই এর ঊরুভঙ্গম্ নামকরণ যথার্থই সার্থক হয়েছে। ঊরুভঙ্গের উৎস মহাভারত হলেও নাট্যকার ভাস অনেক ক্ষেত্রেই মূল থেকে সরে এসেছেন। যেমন, ঊরুভঙ্গে কৃষ্ণ নিজে তাঁর ঊরুতে আঘাত করে ভীমকে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, সভায় দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের যে প্রতিজ্ঞা ভীম করেছিলেন তা কৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিলে অর্জুন তখন ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম ঊরুতে আঘাত করে ইঙ্গিত প্রদান করেন। ঊরুভঙ্গে গদাযুদ্ধের সময় ব্যাস, বলদেব, কৃষ্ণ ও বিদুরের উপস্থিতি দেখান হয়েছে। আর মহাভারতে শুধু কৃষ্ণ ও বলদেবের উপস্থিতি বিদ্যমান। আলোচ্য একাঙ্কিকায় দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের পর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সন্ধানে পিতা ধৃতরাষ্ট্র, মাতা গান্ধারী, দুই রানি ও পুত্র দুর্জয়কে আনা হয়েছে; কিন্তু মহাভারতে ঊরুভঙ্গের পর দুর্যোধনকে দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রে কারো আগমনের উল্লেখ নেই। ভাস এখানে অত্যন্ত চমৎকার সৃজনী প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরেছেন। ঊরুভঙ্গের পর দুর্যোধনের জীবনের শেষমুহূর্তে তার আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে শোকবিহ্বল ও অন্তরঙ্গ বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ দিক ভাস অতীব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া উরুভঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যে, অশ্বত্থামা কর্তৃক দুর্যোধন-পুত্র দুর্জয় দুর্যোধনের সম্মুখে ব্রাহ্মণবাক্য অনুসারে রাজপদে অভিষিক্ত হন; অন্যদিকে উক্ত পরিস্থিতিতে মহাভারতে দ্রোণাচার্য কর্তৃক অশ্বত্থামা সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হন। সেখানে রাজপদে অভিষেকের কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। মহাভারতে কৃষ্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের তীব্র বাদানুবাদের উল্লেখ বিদ্যমান। কিন্তু ভাস এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়েছেন। ঊরুভঙ্গে ক্রুদ্ধ বলদেবের ভীমের প্রতি আক্রমণাত্মক ব্যবহারের নিবৃত্তি করার জন্য দুর্যোধন নিজেই সচেষ্ট হন। পক্ষান্তরে, মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে যে, কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ বলদেবকে অনুনয়-বিনয় করে নিবৃত্ত করেন। ভাস ঊরুভঙ্গে সৌপ্তিকবধের বিষয়ে দুর্যোধনের অসম্মতিসহ দুর্যোধন কর্তৃক অশ্বত্থামাকে ধনুক পরিত্যাগের অনুরোধ দেখিয়েছেন। পক্ষান্তরে, মহাভারতে দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে যুদ্ধ পরিচালনার ভার প্রদানে আগ্রহী হয়ে কৃপাচার্যকে অনুরোধ করেন। সর্বোপরি *ঊরুভঙ্গম্*-এ ভাস সৌপ্তিকবধের পূর্বেই দুর্যোধনের মৃত্যু দেখিয়েছেন। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, সৌপ্তিকবধের জন্য অশ্বত্থামাকে অভিনন্দন জানানোর পর দুর্যোধন দেহত্যাগ করেন।

চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় যে, ভাস তাঁর ঊরুভঙ্গে দুর্যোধনের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। মহাভারতের দুর্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষাপ্রবণ, হঠকারী, পরশ্রীকাতরIএককথায় কদর্য মানসিকতার অধিকারী। দিবানিশি তিনি কেবল পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তাই করেন। তিনি কারো কল্যাণ সহ্য করতে পারেন না। বিশেষ করে পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেননি। তিনি তাঁদেরকে চিরশত্রু মনে করেন। গুরুজনদের প্রতিও তাঁর ব্যবহার খুবই কদর্য। পিতার উপদেশ দুর্যোধনকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। পিতার উপদেশের প্রেক্ষিতে ক্রুদ্ধ দুর্যোধনকে বলতে শোনা যায়:

> যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
> ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপরসানিব ॥
>
> . . . ন সন্তীমে ধার্ত্তরাষ্ট্রা যেষাং ত্বমনুশাসিতা।
> . . . প্রতিপন্নান্ স্বকার্য্যেষু সম্মোহয়সি নো ভৃশম্ ॥
>
> . . . শত্রুশ্চৈব হি মিত্রঞ্চ ন লেখ্যং ন চ মাতৃকা।
> যো যং সন্তাপয়তি চ স শত্রুর্নেতরো জনঃ ॥
>
> . . . নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাংপতে!
> যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ॥
>
> . . . নাপ্রাপ্য পাণ্ডবৈশ্বর্য্যং সংশয়ো মে ভবিষ্যতি।
> অবাপ্স্যে বা শ্রিয়ং তাং হি শয়িষ্যে বা হতো যুধি ॥
>
> *মহাভারতম্*, সভাপর্ব্ব, ৫৩ তম অধ্যায় [১৩]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, তরকারির মধ্যে ডুবে থেকেও হাতা যেমন তরকারির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, তদ্রূপ বুদ্ধিহীন ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। আপনি যাদের অভিভাবক সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বাঁচার আশা নেই। আমি আপন কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত হলে আপনি আমাকে মোহগ্রস্ত করেন। কে শত্রু, আর কে মিত্র।এরূপ কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। যে যাকে সন্তপ্ত বা আঘাত করে সেই তার শত্রু, অন্য কেউ নয়। হে রাজন! জাতি অনুসারে কারো কোনো শত্রু নেই। যাদের জীবিকা একই ধরনের তারাই পরস্পরের শত্রু, অন্য কেউ নয়। পাণ্ডবদের সম্পদ অধিকার করতে না পারলে আমি আমার জীবন রাখব কিনা সন্দেহ আছে। হয় পাণ্ডবদের সম্পদ অধিকার করব, না হয় যুদ্ধে জীবন দিয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করব।

এছাড়াও ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বাক্যও তাঁকে অবজ্ঞা করতে দেখা যায়। কিন্তু ঊরুভঙ্গের দুর্যোধন মহাভারতের ন্যায় দুর্বৃত্ত নন। তিনি পিতা-মাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তদুপরি গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন। তাইতো মৃত্যুশয্যায় শোকবিহ্বল দুর্যোধন তাঁর মাতৃদেবীকে বলেন :

নমস্কৃত্য বদামি ত্বাং যদি পুণ্যং ময়া কৃতম্।
অন্যস্যামপি জাত্যাং মে ত্বমেব জননী ভব ॥

ঊরুভঙ্গম্, ৫০[১৪]

অর্থাৎ, আপনাকে নমস্কার করে আমি প্রার্থনা করছি যে, আমার যদি কোনো পুণ্য থেকে থাকে, তবে অন্যজন্মেও যেন আপনিই আমার গর্ভধারিণী মা হোন।

এছাড়াও ঊরুভঙ্গের দুর্যোধন পুত্র-দুর্জয়কে পাণ্ডবদের প্রতি যে আন্তরিকতাসহ সেবামূলক আচরণের নির্দেশ দেন, তাতেও তাঁর অত্যন্ত মহান ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাবেরই পরিচয় ফুটে উঠে। সর্বোপরি ঊরুভঙ্গের দুর্যোধন গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পর্যন্ত পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ধনুকত্যাগের অনুরোধ করে তাঁকে নিবৃত্ত হতে বলেন। এথেকেও পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার মনোভাব প্রকাশ পায়। সুতরাং, ভাস সর্বদিকেই দুর্যোধনকে নতুনরূপে রূপায়িত করেছেন। এতে ভাসের অসামান্য প্রতিভা প্রস্ফুটিত হয়েছে। ঊরুভঙ্গের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ঠ্য হলো।এটি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সবশেষে বলা যায় যে, সভায় দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করার পরিপ্রেক্ষিতে ভীম দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার-ই প্রেক্ষাপটে ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের ঘটনাই আলোচ্য নাটকের (রূপকের) মূলীভূত বিষয়।যাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই বলিষ্ঠ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং, এটাই উপলব্ধ বিষয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দুর্বৃত্তকে দমন করার নিমিত্তে নিয়ম ভঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আর তাইতো দুর্যোধনের ন্যায় বলিষ্ঠ যোদ্ধার কণ্ঠেও শোনা যায় যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য।

চ. *মধ্যমব্যায়োগঃ* : মধ্যমব্যায়োগের চরিত্রগুলোর মধ্যে সাতটি পুরুষচরিত্র এবং দুটি নারীচরিত্র বিদ্যমান। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার	–	রঙ্গাধ্যক্ষ
বৃদ্ধ	–	কেশবদাস নামে এক ব্রাহ্মণ
প্রথম	–	কেশবদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র
দ্বিতীয়	–	কেশবদাসের মধ্যম পুত্র
তৃতীয়	–	কেশবদাসের কনিষ্ঠ পুত্র
ঘটোৎকচ	–	ভীমসেন ও হিড়িম্বার পুত্র
ভীমসেন	–	দ্বিতীয় পাণ্ডব, কুন্তীর পুত্র

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

ব্রাহ্মণী	–	কেশবদাসের পত্নী
হিড়িম্বা	–	ভীমসেনের রাক্ষসী পত্নী, ঘটোৎকচ-জননী

কুরুদেশের অন্তর্গত যূপগ্রামের অধিবাসী কেশবদাস নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর তিনপুত্র ও স্ত্রীসহ উত্তরদেশের উদ্যামক গ্রামে মাতুলালয়ে অনুষ্ঠিত মামাতো ভাইয়ের উপনয়ন অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে বনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় রাক্ষস ঘটোৎকচের মুখোমুখি হন। ঘটোৎকচ তাঁর রাক্ষসী মাতা হিড়িম্বার খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্তে তাঁদের বাঁধা প্রদান করে। এ পরিস্থিতিতে তাঁরা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করেন। কিন্তু জনশূন্য অরণ্যে কার চিৎকার কে শোনে? হঠাৎ অরণ্যবাসী পাণ্ডবদের কথা ব্রাহ্মণের স্মরণে আসে। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর প্রথম পুত্রের নিকট থেকে জানতে পারেন যে, একমাত্র মধ্যম পাণ্ডব ব্যতীত পাণ্ডবদের অন্য সকলে যজ্ঞ করার জন্য ঋষি ধৌম্যের আশ্রমে গিয়েছেন। শুধু মধ্যম পাণ্ডব আশ্রম রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তবে মধ্যম পাণ্ডবও উক্ত সময়ে শরীরচর্চার জন্য আশ্রম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। ব্রাহ্মণ কোনো উপায় না দেখে ঘটোৎকচের নিকটই তাঁদের ছেড়ে দিতে বিনীতভাবে অনুরোধ করেন। ঘটোৎকচ তখন ব্রাহ্মণের একজন পুত্রকে তার মাতৃদেবীর ভোজের জন্য রেখে অন্য সবাইকে ছেড়ে দিতে রাজি হন। ব্রাহ্মণ ঘটোৎকচের প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করলে ঘটোৎকচ তাঁদের সপরিবারে মেরে ফেলার হুমকি দেন। তখন ব্রাহ্মণ-

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের প্রত্যেকেই নিজেকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে ঘটোৎকচ গ্রহণ করতে রাজি নন। কারণ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ আর স্ত্রীলোক তার মায়ের ইপ্সিত নয়। এছাড়া তিনপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অত্যন্ত প্রিয় বিধায় তাকে তিনি ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন। আবার কনিষ্ঠ পুত্রকে ব্রাহ্মণী ছাড়তে রাজি নন। তাহলে থাকে দ্বিতীয় পুত্র। সে তখন তার পিতামাতা ও ভাইদের জীবনরক্ষার বিনিময়ে নিজের জীবন সমর্পণ করে ধন্য হয় এবং পিতামাতা ও ভাইদের নিকট থেকে আশীর্বাদ ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। আর ঘটোৎকচও তাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ঘটোৎকচের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে জীবনের শেষতৃষ্ণা মেটানোর জন্য বনের মধ্যে জলাশয়ের দিকে গমন করেন। আর পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বিলাপ করতে থাকেন।

এদিকে ব্রাহ্মণপুত্রের জলাশয় থেকে ফিরতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ঘটোৎকচের মায়ের ভোজের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় ঘটোৎকচ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তিনি ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্রের নাম জেনে তাকে 'মধ্যম', 'মধ্যম' বলে ডাকতে থাকেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের নামও 'মধ্যম'। 'মধ্যম' ডাক তাঁর কানে পৌঁছায়। অর্জুন তাঁকে ডাকছে মনে করে তিনি শরীরচর্চা বাদ দিয়ে চলে আসেন এবং ঘটোৎকচকে দর্শন করে অভিভূত হন। কিন্তু ঘটোৎকচের প্রত্যাশা ব্রাহ্মণ কুমার। তাই সে পুনরায় 'মধ্যম' 'মধ্যম' বলে ডাকতে থাকেন। ভীম তখন নিজেকে প্রকৃত 'মধ্যম' বলে জানান। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন ভীমকে চিনে ফেলেন। আর ঠিক তখনই ব্রাহ্মণ কুমার মধ্যমের আগমন ঘটে। এই সুযোগে ব্রাহ্মণ ভীমসেনের নিকট বিস্তারিতভাবে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়ে এ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের প্রার্থনা জানান। ভীম ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়ে ঘটোৎকচকে 'রাহু' বলে তিরস্কার করে ব্রাহ্মণপুত্রকে ছেড়ে দিতে আদেশ করলে ঘটোৎকচের দাম্ভিক উক্তিতে ভীম হতবাক হয়ে যান। ঘটোৎকচ ভীমের আদেশ অমান্য করে বলেন :

> ন মুচ্যতে।
> মুচ্যতামিতি বিস্রব্ধং ব্রবীতি যদি মে পিতা।
> ন মুচ্যতে তথা হ্যেষ গৃহীতো মাতুরাজ্ঞয়া ॥
>
> *মধ্যমব্যায়োগঃ*, ৩৬[১৫]

অর্থাৎ, ছাড়ব না। যদি আমার পিতা স্বয়ং একে ছেড়ে দিতে জোর করেন, তবুও একে ছাড়া যাবে না। কারণ একে ধরা হয়েছে আমার মাতৃদেবীর নির্দেশে।

অতঃপর ভীম ঘটোৎকচের মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে তার মায়ের নাম জানতে চাইলে ঘটোৎকচ তার মাতা ও পিতার পরিচয় তুলে ধরেন। পরিচয় জেনে ভীম বিস্মিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, ঘটোৎকচ তাঁর নিজেরই সন্তান। তদুপরি পুত্রকে নিজের বংশের তুল্য দম্ভ ও পৌরুষের অধিকারী দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন। কিন্তু প্রজাদের প্রতি এরূপ হৃদয়হীন কঠোর আচরণে তিনি খুবই মর্মাহত হন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা।একথা মনে করে তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে ব্রাহ্মণপুত্রকে মুক্ত করার নিমিত্তে নিজেকে সমর্পণ করেন। এতে ব্রাহ্মণপুত্র আপত্তি করলে তিনি তা উপেক্ষা করেন এবং ঘটোৎকচও তাতে রাজি হন। ঘটোৎকচ কিন্তু ভীমের পরিচয় বিষয়ে অজ্ঞ। তবে ভীম জানান যে, তিনি নিজে থেকে ঘটোৎকচের সঙ্গে যাবেন না, তাঁকে ক্ষমতা দিয়ে জোর করে নিয়ে যেতে হবে। এরূপ অবস্থায় ভীম ও ঘটোৎকচের মধ্যে বিভিন্ন বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি-প্রত্যুক্তির এক পর্যায়ে ভীম তাঁর ডান হাতখানাই তাঁর অস্ত্র বললে ঘটোৎকচ বলেন যে, কথাটা কেবলমাত্র তার পিতা ভীমসেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভীম তখন বিভিন্ন রসিকতা করেন। ঘটোৎকচের উক্তিতে পিতার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ পায়। তিনি ভীমকে নানাভাবে আক্রমণ করেন। কখনো পর্বতশৃঙ্গ তুলে প্রহার করেন, কখনো বাহুপাশে আবদ্ধ করেন, আবার কখনো মায়াপাশে আবদ্ধ করেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই ভীম মুক্ত হয়ে যান। এসবই তাঁর নিকট তুচ্ছ। পরিশেষে পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভীম নিজেই ঘটোৎকচের অনুগামী হন। ব্রাহ্মণও পরিজনসহ তাদের অনুসরণ করেন। অতঃপর ঘটোৎকচ তাদের গৃহে পৌঁছে মা হিড়িম্বাকে শৌর্য-বীর্যে একজন অতিমানবকে আনার কথা বললে হিড়িম্বা তাঁকে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছাপোষণ করেন এবং প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে ধিক্কার দিয়ে বলেন :

উন্মত্তঅ দব্বদং খু অম্হাঅং (উন্মত্তক দৈবতং খল্বস্মাকম্)।
মধ্যমব্যায়োগঃ[১৬]

অর্থাৎ, উম্মত্ত কোথাকার, ইনি তো দেবতা আমাদের।

অনেকদিন পর হিড়িম্বাকে দেখে ভীমসেনও হতবাক হয়ে যান। কিন্তু মা-ছেলের ঘটনায় তিনি দুঃখিত হলে হিড়িম্বা ভীমকে কানে কানে বলেন যে, নরমাংস ভোজনের উছিলায় মানুষ ধরে আনার আদেশের পিছনে তার অন্য অভিসন্ধি ছিল এবং সেটা পূরণও হয়েছে। মায়ের নির্দেশমতো ঘটোৎকচ ভীমসেনকে প্রণাম করেন। পিতার পরিচয় না জেনে তাঁকে অভিবাদন না করায় এবং তাঁর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করায় নিজেকে অপরাধী বোধ করলে ভীম পুত্রকে ক্ষমা করে দেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করেন। ভীমের নির্দেশমতো ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণ কেশবদাসকে প্রণাম জানালে ব্রাহ্মণ তাকে আশীর্বাদ করে বলেন যে, সংঘটিত ঘটনার মাধ্যমেই সপরিবারে তিনি রক্ষা পেয়েছেন এবং ভীমও ফিরে পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে। ভীম সবকিছুই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে ঘটেছে

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্য করে তাদেরকে পাণ্ডবদের আশ্রমে যাওয়ার অনুরোধ করলে ব্রাহ্মণ বিনীতভাবে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করেন। পরিশেষে ভীম তাঁদের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে স্ত্রী-পুত্রসহ আশ্রমে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত তাঁদের অনুগামী হন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে), মধ্যমব্যায়োগের উৎস মহাভারত হলেও এরকম কোনো কাহিনি মহাভারতের কোথাও দেখা যায় না। উক্ত নাটকের (রূপকের) কাহিনি সম্পূর্ণভাবে নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। নাট্যকার শুধু তিনটি চরিত্র— ভীম, হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচকে মহাভারত থেকে তাঁর নাট্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবদের বনবাসের সময় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণপুত্রের জীবন রক্ষাকে কেন্দ্র করে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের তাঁর পত্নী হিড়িম্বা ও পুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে মিলিত হওয়াই উক্ত নাটকের মূলীভূত বিষয়। এ নাটকের (রূপকের) মাধ্যমে ভীমের পরোপকারিতা, আত্মত্যাগ ও পুত্রবাৎসল্যগুণ নাট্যকার ভাস অতীব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীমই আলোচ্য নাটকের (রূপকের) কেন্দ্রীয় চরিত্র। এছাড়া 'মধ্যম' শব্দে ভীম ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণপুত্র উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। তদুপরি 'মধ্যম' শব্দটির মাধ্যমেই নাটকে ভীমের প্রবেশ ঘটেছে। আর 'ব্যায়োগ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংযোগ বা মিলন। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের তাঁর পত্নী ও পুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্রের জীবনরক্ষা পেয়ে তার পিতামাতা ও ভাইদের সঙ্গে মিলিত হওয়াই 'মধ্যমব্যায়োগে'র বর্ণিত বিষয়। সুতরাং, উক্ত নাটকের (রূপকের) *মধ্যমব্যায়োগঃ* নামকরণ যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, *মধ্যমব্যায়োগ*ও *ঊরুভঙ্গে*র ন্যায় মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

ছ. *বালচরিতম্* : বালচরিতম্ নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে সাতাশটি পুরুষচরিত্র এবং নয়টি নারীচরিত্র বিদ্যমান। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার	–	নাটকের পরিচালক (রঙ্গাধ্যক্ষ)
নারদ	–	ব্রহ্মলোকে বাসকারী দেবর্ষি
বসুদেব	–	কৃষ্ণের পিতা
নন্দগোপ	–	গোকুলের অধিপতি, বসুদেবের বন্ধু এবং কৃষ্ণের পালকপিতা
উগ্রসেন	–	কংসের পিতা
দামোদর, সঙ্কর্ষণ	–	বসুদেবের দুইপুত্র
গরুড়	–	বিষ্ণুর বাহন

Dhaka University Institutional Repository

চক্র, শার্ঙ্গ, শঙ্খ, নন্দক	–	নারায়ণের অস্ত্রসমূহ
রাজা	–	মথুরার অধিপতি কংস
চাণূর, মুষ্টিক	–	কংসের বেতনভোগী দুইজন মল্লযোদ্ধা
ভট	–	ধ্রুবসেন নামে কংসের ভৃত্য
কাঞ্চুকীয়	–	বালাকি নামে কংসের অন্তঃপুরচারী ভৃত্য
শাপ	–	বজ্রবাহু নামে শাপের অধিদেবতা
রক্ষিপুরুষগণ		
কুণ্ডোদর, শূল, নীল, মনোজব	–	কাত্যায়নীর অস্ত্রসমূহ
বৃদ্ধ গোপালক	–	জনৈক গোপালক
দামক	–	অন্য এক গোপালক
অরিষ্টর্ষভ	–	অসুরবিশেষ
কালিয়	–	যমুনা হ্রদেবাসকারী মহানাগ

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

দেবকী	–	কৃষ্ণ-জননী
প্রতিহারী	–	মধুরিকা নামে প্রাসাদের দ্বাররক্ষিকা
ধাত্রী	–	কাত্যায়নীর উপমাতা
চণ্ডালযুবতীগণ		
কাত্যায়নী	–	আকাশস্থিতা দেবী, যোগমায়া
ঘোষসুন্দরীগণ		
রাজশ্রী	–	কংসের রাজলক্ষ্মী
প্রতিহারী	–	যশোধরা নামে কংসের দ্বাররক্ষিকা
কৌমোদকী	–	নারায়ণের অস্ত্রবিশেষ

এছাড়া অন্যদের সংলাপে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত নারীচরিত্রগুলো হলো :

যশোদা	–	নন্দগোপের পত্নী ও কৃষ্ণের পালিতা মাতা
পুতনা	–	রাক্ষসী
গোপিনীগণ		
রোহিণী	–	বসুদেব-পত্নী ও সঙ্কর্ষণ-মাতা

Dhaka University Institutional Repository

অপ্সরাগণ

মদনিকা – কুঁজী, কংসের দাসী

বালচরিতম্ নাটকের প্রথমেই সূত্রধার ভগবান বিষ্ণুর চারযুগের প্রশস্তি পরিবেশন করেন। অতঃপর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন দেবর্ষি নারদ। কলহপ্রিয় নারদ জনগণের কল্যাণসাধনের নিমিত্তে মথুরাধিপতি কংসকে বধ করার জন্য বৃষ্ণিকুলে শিশুরূপে জন্মগ্রহণকৃত নারায়ণকে দর্শন করতে ব্রহ্মালোক থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেন। দেবকীর কোলে শিশুরূপী নারায়ণকে দর্শন করে নারদ তাঁকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ব্রহ্মালোকে চলে যান। দেবকীর ছয় পুত্রের হত্যাকারী কংসের হাত থেকে তাঁর সপ্তম গর্ভের সদ্যজাত পুত্রকে রক্ষার নিমিত্তে স্বামী বসুদেব গভীর রাতে দৈবের উপর নির্ভর করে শিশুপুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। চারদিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শিশুটির দেহ থেকে বেরিয়ে আসা উজ্জ্বল আলোতেই বসুদেব পথ চলেন। কিন্তু পথে পড়ে বর্ষার জলে কানায় কানায় ভরা যমুনা নদী। বসুদেব জলে পা রাখতেই যমুনার জল দুভাগে ভাগ হয়ে মাঝখান দিয়ে পথ দেখা দেয়। আর বসুদেবও অতি আয়াসে যমুনা পার হন। অতঃপর ভোরের আলোর অপেক্ষায় ঘোষপল্লির অদূরে অবস্থিত একটি বটগাছের তলায় বসে বন্ধু নন্দগোপের কথা ভাবতে থাকেন। ঠিক তখনই দৈববশত নন্দগোপকেই বিলাপ করতে করতে আসতে দেখেন। দুজনের মধ্যে কুশল বিনিময়ের পর বসুদেব নন্দগোপকে বিলাপের কারণ জিজ্ঞেস করলে নন্দগোপ জানায় যে, ঐ দিনই মধ্যরাতে যশোদা একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করে অজ্ঞান হয়ে যান। কিন্তু পরের দিনই ঘোষপল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আনন্দ যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য সে সকলের অজ্ঞাতে মৃতকন্যাকে নিয়ে চলে আসেন। অতঃপর বসুদেবের পরামর্শে শোকগ্রস্ত নন্দগোপ মৃতকন্যাকে ফেলে দিয়ে তাঁরই (বসুদেব) অনুরোধে বসুদেবের কথা স্মরণ করে তাঁর শিশুপুত্রকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করতে রাজি হন। এদিকে বসুদেবের শিশুপুত্রটি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বিধায় তাঁর প্রভাবে অলৌকিক জলধারা প্রবাহিত হয়। যার মাধ্যমে অশুচি নন্দগোপ নিজেকে শুদ্ধ করেন। মন্দর পর্বতের ন্যায় প্রচণ্ড ভারী বলে নন্দগোপ শিশুটিকে হাতে ধরতেই পারেন না। এ শিশুর স্বরূপ উদ্ঘাটনে তাই শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি ও ধনু। এই পাঁচটি দৈবাস্ত্র শরীর ধারণ করে গরুড়ের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়। তারা শিশুটির বন্দনা গান গান এবং ভগবান বিষ্ণুর বাল্যলীলা দর্শনাকাঙ্ক্ষায় গোকুলে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নন্দগোপও শিশুটির বন্দনা করেন। আর শিশুটির শরীরও হালকা হয়ে যায়। রাত ভোর হতেই অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশুটিকে লালন-পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নন্দগোপ চলে গেলে বসুদেবও

Dhaka University Institutional Repository

মথুরায় প্রত্যাবর্তনে প্রস্তুত হন। ঠিক তখনই নন্দগোপের মৃতকন্যা কেঁদে উঠলে সেই কন্যাকে নিয়ে বসুদেব দেবকীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য কারাগারে ফিরে আসেন।

দ্বিতীয়াঙ্কে রাজা কংস তাঁর চারদিকে বিভিন্ন অশুভ কার্যকলাপ সংঘটিত হতে দেখেন। যেমন, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, উল্কাপাত, চণ্ডাল যুবতী মেয়েদের সঙ্গে কংসের বিয়ের প্রস্তাব, রাজলক্ষ্মীকে তাড়িয়ে শরীরধারী বজ্রবাহু শাপের কংসের শরীরে প্রবেশ ইত্যাদি। ঘুমের মধ্যেও কংস ঐসব অশুভ ঘটনা দেখতে পান। অতঃপর তিনি কাঞ্চুকীয় বালাকি ও জ্যোতিষীদের নিকট থেকে জানতে পারেন যে, কোনো এক দেবতার মানবজন্ম নিয়ে মর্ত্যলোকে অবতরণের কারণেই এরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়। অতঃপর কংস বসুদেবের নিকট থেকে দেবকীর কন্যাসন্তান প্রসবের সংবাদ যাচাই করেন এবং দেবকীর অনুনয় ও নিষেধ অগ্রাহ্য করে সেই কন্যাকে হত্যার আদেশ দেন। এর প্রেক্ষিতে তিনি ঐ শিশুকন্যাকে কংসশিলায় আছাড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির শরীর দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে একভাগ মাটিতে এবং অন্য ভাগ শূন্যে উঠে দেবী কাত্যায়নীর রূপধারণ করে। এরপর দেবী কাত্যায়নী তাঁর দেহধারী অস্ত্রসমূহ নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে জানান যে, তাঁরা সকলেই বিষ্ণুর বাল্যলীলা দর্শনার্থে গোপালকের বেশে ঘোষপল্লিতে অবতীর্ণ হবেন। এ দৃশ্য অবলোকন করে কংস সমস্ত অশুভ শক্তির প্রভাব বিনাশকল্পে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তৃতীয় অঙ্কে গোপালকদের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, বালক কৃষ্ণ অনেক অসাধ্যকে সাধন করেন। তিনি অশুভ শক্তি ধ্বংসের নিমিত্তে পুতনা নামক রাক্ষসীকে বধ করেন। এছাড়াও তিনি শকটাসুর, বৃক্ষরূপী যমলার্জুন নামক দুই দৈত্য এবং ধেনুক ও কেশী নামক দুই দানবকেও বধ করেন। তদুপরি গোকুলে তাঁর অবস্থানের ফলে সেখানকার সমৃদ্ধি সাধিত হয় এবং সেখানকার অধিবাসীদের রোগ-বালাই দূরীভূত হয়ে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়। সেখানকার বৃক্ষরাজিও ফুলে-ফলে শোভিত হয়ে এক অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। এসব কারণে বালক কৃষ্ণকে গোপালকেরা দামোদর নাম দেয়। অতঃপর গোপালকদের সঙ্গে দামোদর ও সঙ্কর্ষণ পরম আনন্দে হল্লীসক নৃত্যে মেতে উঠেন। তখন বৃষরূপধারী অরিষ্টর্ষভ নামে এক দানবের আগমনের সংবাদ পেয়ে দামোদর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সঙ্কর্ষণের সঙ্গে গোপালকেরা অদূরবর্তী এক পর্বতের চূড়ায় আশ্রয় নেয় এবং দামোদরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্য বিনিময়ের পর উভয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এক পায়ে দণ্ডায়নকৃত দামোদরকে অরিষ্টর্ষভ একতিলও সড়াতে না পেরে বুঝতে পারল যে, এ বালক নিশ্চয়ই স্বয়ং বিষ্ণুদেব। আর বিষ্ণুর হাতে মৃত্যু মানেই হলো স্বর্গলাভ করা।একথা চিন্তা করে অরিষ্টর্ষভ দামোদরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দামোদরও অতি সহজেই তাকে বিনাশ করেন। ঠিক তখনই দামকের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

যমুনা হ্রদে কালিয়নাগের উপস্থিতির সংবাদে সঙ্কর্ষণের সেখানে গমনের কথা অবগত হয়ে দামোদরও কালিয়নাগকে বিনাশের লক্ষ্যে যমুনহ্রদে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

চতুর্থ অঙ্কে দামোদরের কালিয়ের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগে গোপকন্যাগণ ভয় পেয়ে দামোদরকে যমুনা হ্রদে নামতে নিষেধ করে সঙ্কর্ষণকে অনুরোধ করলে সঙ্কর্ষণ তাদের অভয় দিয়ে বলেন যে, দামোদরের তো কোনো বিপদ হবেই না, বরং কালিয়ই দামোদরকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর দামোদর যমুনা হ্রদে নেমে অল্পক্ষণের মধ্যেই কালিয়কে পরাজিত করে তার ফণার উপরে হল্লীসক নৃত্য করতে করতে গাছ থেকে ফুল তুলতে থাকেন। এদিকে কালিয় যখন বিষক্রিয়ায়ও দামোদরের প্রাণনাশে ব্যর্থ হয় তখন তাঁকে নারায়ণ ভেবে তাঁর কাছে ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করে এবং কালিয়ের মস্তকে বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হওয়ায় সে গরুড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবেIএই বর দামোদরের নিকট থেকে আদায় করে সপরিবারে যমুনা হ্রদ ত্যাগ করে। অতঃপর কংস দূত কর্তৃক মথুরায় অনুষ্ঠিতব্য ধনুর্মহ নামক মহোৎসবে অংশগ্রহণের জন্য দামোদরকে পরিজনসহ আমন্ত্রণ জানালে দামোদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সঙ্কর্ষণকে নিয়ে মথুরায় যেতে রাজি হন।

পঞ্চমাঙ্কে কংস তাঁর মল্লবীরদের নিয়ে দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে মোকাবিলা করতে তাঁদের আগমনের অপেক্ষায় থাকার এক পর্যায়ে ধ্রুবসেন নামক তাঁর এক সৈন্যের নিকট থেকে মথুরায় দামোদর ও সঙ্কর্ষণ কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন অঘটনের সংবাদ পান। সেখানে তাঁরা ধোপাদের নিকট থেকে বস্ত্র কেড়ে নেওয়ায় উৎপলাপীড় নামে এক গন্ধগজকে পাঠানো হয় তাঁদের হত্যা করার জন্য। কিন্তু গন্ধগজই তাঁদের দ্বারা নিহত হয়। এছাড়া হাত বুলিয়ে মদনিকা নামক কুঁজীর কুব্জাভাব দূর করা, প্রহরীকে প্রহার করে ধনুশালায় ঢুকে সেখানে রক্ষিত ধনুক ভেঙে দুখণ্ড করা ইত্যাদি ঘটনার কথা শুনে কংস ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চাণুর ও মুষ্টিক নামক দুজন মল্লযোদ্ধাকে আনান এবং যুদ্ধ পরিদর্শন করতে নিজে প্রাসাদের উপরে যান। মল্লবীর দুজনকে কংস দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে মেরে ফেলার আদেশ দেন। এরপর দামোদর ও সঙ্কর্ষণকে ডাকা হলে দামোদরের সঙ্গে চাণুর ও সঙ্কর্ষণের সঙ্গে মুষ্টিকের মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। মল্লবীরদ্বয় দুই বালকের হস্তেই প্রাণ হারায়। অবশেষে দামোদর প্রাসাদে আরোহণ করে কংসের মস্তক ধরে আছাড় দিলে কংসের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। আর কংসের সৈন্যদের মোকাবিলা করেন সঙ্কর্ষণ। ঠিক তখনই বসুদেব জানান যে, উক্ত বালকদ্বয় তাঁরই পুত্র। দামোদর ও সঙ্কর্ষণ পিতাকে প্রণাম জানালে বসুদেব তাঁদের আশীর্বাদ করে মৃতদেহগুলোকে সরানোর আদেশ দেন। অতঃপর কংসের পিতা উগ্রসেনকে কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। এদিকে কংসরূপ দুষ্টের দমন হওয়ায় দৈববাদ্য বেজে উঠে। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়। এরপরই রঙ্গমঞ্চে

Dhaka University Institutional Repository

আগমন ঘটে দেবর্ষি নারদের। দামোদর তাঁকে পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করলে নারদ দামোদরকে স্বয়ং নারায়ণ বলে প্রচার করে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। আর নারদের স্বর্গে গমনের মাধ্যমেই নাটকটির সমাপ্তি ঘটে।

আলোচ্য কাহিনিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বালচরিতমে নাট্যকার ভাস তাঁর সৃজনী প্রতিভার যথেষ্ট সাক্ষ্য রেখেছেন। যেমন, শিশু কৃষ্ণের শরীর থেকে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হওয়া, যমুনা নদীর জল দুভাগে বিভক্ত হওয়া, নন্দগোপের শুচিতার জন্য মাটি ভেদ করে জলধারা প্রবাহিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনা মূল উৎসে দৃষ্ট হয় না। এ সমস্তই ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি। তদুপরি প্রথম অঙ্কে নারায়ণের ও দ্বিতীয় অঙ্কে কাত্যায়নীর শরীরধারী অস্ত্রসমূহের গোপালকদের বেশে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনের মধ্যেও ভাসের অভিনব নাট্যকৌশল বিদ্যমান। উক্ত নাটকে কৃষ্ণকে দেবকীর সপ্তমগর্ভের সন্তান বলা হয়েছে; অপরপক্ষে মূলে রয়েছে, কৃষ্ণ দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান। মূলগ্রন্থে নন্দগোপের কন্যা জীবিতই জন্মগ্রহণ করে এবং বসুদেব তাকে জীবিতভাবেই নন্দগোপের নিকট থেকে নিয়ে দেবকীকে প্রদান করেন। কিন্তু বালচরিতে বর্ণিত হয় যে, নন্দগোপের কন্যা মৃতভাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃতকন্যাকেই বসুদেবের নিকট আনা হয়। তবে ধারণা করা হয় যে, নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসের প্রয়োজনেই হয়তো নাট্যকার এরূপ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। কারণ নন্দগোপের কন্যা জীবিত জন্ম নিলে নন্দগোপ গভীর রাতে বের হতো না। আর বসুদেবের সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ হতেন না। সুতরাং, নাটকের ঘটনাপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতেই ভাসকৃত এ হেন পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত ও সংগতিপূর্ণ হয়েছে। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন বালচরিতে লক্ষিত হয় না। নাট্যকাহিনির প্রয়োজনে শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দু-একটি নতুন সংলাপ নাট্যকার কর্তৃক যুক্ত হয়েছে মাত্র। চরিত্রসমূহের আদর্শগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে নাটকটিতে অনেকগুলো নারীচরিত্র বিদ্যমান থাকলেও কোনো নায়িকাচরিত্র নেই। বলতে গেলে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নায়িকাবিহীন নাটক একটি বিরল ঘটনা। আর বহুমাতৃক নাট্যকার ভাসের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েছে।

বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই উক্ত নাটকের নামকরণ করা হয়েছে। নাটকটির প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের নানারকম অলৌকিক, অসাধারণ ও দুঃসাহসিক ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। তাই নাট্যতত্ত্বের আলোকে নামকরণের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী নাটকের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে উক্ত নাটকের নামকরণ যথার্থ ও সার্থক বলা যেতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও জর্জরিত জীবকুলকে রক্ষার নিমিত্তে ভগবান বিষ্ণুর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে নানারকম অলৌকিক ও দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কংসকে বধ করে জনগণের জীবন কন্টকমুক্ত ও রক্ষা করাই আলোচ্য

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের মূলীভূত বিষয়। সুতরাং, সবশেষে এটা অনুধাবিত হয় যে, জীবের কল্যাণে; দুষ্টের দমনের নিমিত্তে ভগবান সর্বদাই জীবের সঙ্গে বিরাজমান।

৪.৪ ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত নাটক

ক. *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* : প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের চরিত্রগুলোর মধ্যে সতেরটি পুরুষচরিত্র এবং তিনটি নারীচরিত্র রয়েছে। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার	–	রঙ্গাধ্যক্ষ
যৌগন্ধরায়ণ	–	বৎসরাজ উদয়নের প্রধানমন্ত্রী
রুমণ্বান্	–	বৎসরাজ উদয়নের অন্য এক মন্ত্রী
বসন্তক	–	বৎসরাজ উদয়নের বিদূষক, ছদ্মবেশী ভিক্ষুক
মহাসেন	–	অবন্তিরাজ মহাসেন প্রদ্যোত, বাসবদত্তার পিতা
ভরতরোহক	–	মহাসেনের প্রধানমন্ত্রী
সালক, নির্মুণ্ডক	–	যৌগন্ধরায়ণের পরিচারকদ্বয়
হংসক	–	উদয়নের ভৃত্য
কাঞ্চুকীয়	–	বাদরায়ণ নামে মহাসেনের অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ
দ্বৈপায়ন	–	যৌগন্ধরায়ণের সুহৃদ ব্রাহ্মণ
ভট	–	মহাসেনের ভৃত্য
গাত্রসেবক	–	যৌগন্ধরায়ণের গুপ্তচর, রাজকুমারী বাসবদত্তার ভদ্রবতী নামক হস্তীর ছদ্মবেশী পরিচারক
প্রথম, দ্বিতীয়	–	মহাসেনের ভৃত্যদ্বয়
উন্মত্তক	–	উন্মাদের ছদ্মবেশে যৌগন্ধরায়ণ
শ্রমণক	–	বৌদ্ধভিক্ষুর ছদ্মবেশে রুমণ্বান্

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

নটী	–	সূত্রধার-পত্নী
অঙ্গারবতী	–	মহাসেনের মহিষী
বিজয়া	–	বৎসরাজ উদয়নের দ্বাররক্ষিকা (প্রতিহারী)

এছাড়া অন্যদের সংলাপে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত নারীচরিত্রগুলো হলো :

Dhaka University Institutional Repository

রাজমাতা	–	রাজা উদয়নের মাতা
রাজমহিষীগণ		
বাসবদত্তা	–	অবন্তিরাজকন্যা
ধাত্রী	–	বাসবদত্তার উপমাতা
দাসী	–	বাসবদত্তার পরিচারিকা
বৈতালিকী উত্তরা	–	গান্ধর্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞা নারী

আলোচ্য নাটিকার প্রথমেই বৎসরাজ্যের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও তাঁর একান্ত অনুরক্ত সেবক সালকের মধ্যে বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদে আলোচিত বিষয় থেকে জানা যায় যে, বিন্ধ্য-অরণ্যে শিকারে রত বৎসরাজ উদয়ন পরের দিন বেনুবন থেকে নাগবনে হস্তী শিকারের নিমিত্তে যাত্রা করবেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ গুপ্তচরের মাধ্যমে অবগত হন যে, অবন্তীরাজ মহাসেন নাগবনে একদল হস্তীর সঙ্গে একটি কৃত্রিম নীল রং এর হস্তীকে লুকিয়ে রাখবেন।যাতে উদয়ন সেই অভূতপূর্ব হস্তীকে বশীভূত করার লক্ষ্যে তার পশ্চাদ্‌গমন করেন এবং গুপ্তভাবে অবস্থানরত সৈন্যরা উদয়নকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বন্দি করতে পারেন। সুতরাং, এই আসন্ন বিপদের কপটতা সম্বন্ধে রাজাকে সাবধান করার জন্য যৌগন্ধরায়ণ সালককে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও যৌগন্ধরায়ণ মহাসেনের সৈন্যদের একতা, আনুগত্য, চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে জ্ঞাত, তবুও শত্রুর এ হেন কুটনৈতিক কৌশলে তেমন বিচলিত নন। সালক যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক লিখিত পত্র এবং আপদ-বিপদ দূরীকরণের রক্ষা-মাদুলি নিয়ে উদয়নের নিকট গমনে প্রস্তুত হন। ঠিক তখনই উদয়নের ভৃত্য হংসক একা মহারাজের নিকট থেকে প্রাসাদে ফিরে জানায় যে, আগের দিনই উদয়ন মহাসেনের ছলনায় তাঁরই একজন গুপ্তচর কর্তৃক সংবাদ পেয়ে বিশজন সৈন্য নিয়ে সেই কৃত্রিম নীল হাতিকে বশে আনতে গিয়ে মহাসেনের সৈন্যদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শেষপর্যন্ত মন্ত্রী শালঙ্কায়নের নেতৃত্বে বন্দি হন। যৌগন্ধরায়ণ দ্বাররক্ষিকা বিজয়া কর্তৃক অন্তঃপুরে রাজমাতাকে উক্ত দুঃসংবাদ জানালে রাজমাতা দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্রকে উদ্ধারের সর্বময় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট আবেগপ্রবণ প্রার্থনা পাঠান। আর কর্তব্য অবহেলার অপরাধবোধে আবিষ্ট মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রতিজ্ঞা করে বলেন :

> যদি শত্রুবলগ্রস্তো রাহুণা চন্দ্রমা ইব।
> মোচয়ামি ন রাজানং নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ॥
>
> *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*, ১/১৬[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যদি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো শত্রুসৈন্য কর্তৃক আবৃত মহারাজকে আমি উদ্ধার করতে না পারি, তাহলে আমরা যৌগন্ধরায়ণ নামের কোনো মূল্য নেই।

এদিকে যৌগন্ধরায়ণের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন রাজবাড়ির ভোজসভায় পাগলের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে পাগলের পোশাকটা ইচ্ছা করে ফেলে রেখে যান। যৌগন্ধরায়ণ উপলব্ধি করেন যে, এটা তাঁরই ছদ্মবেশ ধারণের ইঙ্গিত। তাই তিনি 'শান্তিনিবাসে' দ্বৈপায়নের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করার ইচ্ছায় রাজমাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্তঃপুরে যান।

দ্বিতীয় অঙ্কে কাঞ্চুকীয়ের কথা থেকে জানা যায় যে, অবন্তিরাজ মহাসেন রাজকন্যা বাসবদত্তাকে তাঁর উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ বিষয়ে ভীষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। বহু গুণবান বীর ক্ষত্রিয় অধিপতি দূত প্রেরণ করেন বাসবদত্তার পাণিপ্রার্থী হয়ে। এছাড়া বেশিরভাগ সামন্ত রাজাই মহাসেনের অধীনতা মেনে নেওয়ায় তিনি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আর বৎসরাজ উদয়ন স্বীয় বংশ, গন্ধর্ববিদ্যা, রূপ, যশ, পতিপত্তি প্রভৃতি কারণে মহাসেনের আনুগত্যকে অস্বীকার করায় মহাসেন তাঁর প্রতি ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় বিদুষী কন্যাকে বৎসরাজ উদয়নের ন্যায় যোগ্য ও উপযুক্ত পাত্রের হাতেই সম্প্রদান করার বাসনা পোষণ করেন। যদিও উদয়নের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে একটু একটু করে বেড়েই চলে। আর তাই উক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে মহাসেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং দ্বিধাগ্রস্ত। এদিকে কাশিরাজ বাসবদত্তার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে জৈবন্তিকে দূতরূপে পাঠালে মহাসেনের উদয়নকে বন্দি করতে শালঙ্কায়নকে পাঠানোর কথা মনে পড়ে যায়। তবে এ ব্যাপারে তিনি লক্ষ্য অর্জনে নিশ্চিত নন। অতঃপর রাজকুমারী বাসবদত্তার বীণাশিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ এবং সে কারণে তার জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত গুরুর সন্ধানের বিষয় মহাসেন ও রানির আলাপচারিতা থেকে জানা যায়। এ সময় কাঞ্চুকীয়ের নিকট থেকে বৎসরাজের বন্দি হওয়ার সংবাদ পেয়ে মহাসেন আনন্দ ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তিনি উদয়নকে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলেও মূলত তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মতো পরাজিত শত্রুর প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি না করে যথাসম্ভব তাঁর সর্বময় আরাম আয়াসের ব্যবস্থাই করেন। এদিকে উদয়নের হাতেই যেন কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়।এরকম সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত রাজমহিষী মহাসেনের নিকট প্রকাশ করলে মহাসেন বাস্তবতার নিরিখে নিরুৎসাহিত হন। যদিও রানির মতো তিনিও উক্ত মনোভাবই মনের ভিতরে পোষণ করেন। কাঞ্চুকীয়ের নিকট থেকে আরো জানা যায় যে, শালঙ্কায়ন 'ঘোষবতী' নামক পুরুবংশের প্রসিদ্ধ বীণাটি উদয়নের নিকট থেকে দখল করে মহাসেনকে প্রদান করলে মহাসেন সেই বীণাটি গান্ধর্ববিদ্যায় আকৃষ্টা কন্যা বাসবদত্তাকে উপহার দেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অঙ্ক আলোচ্য নাটিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই অংশে যৌগন্ধরায়ণ পাগলের ছদ্মবেশে, রুমণ্বান্ বৌদ্ধভিক্ষুর ছদ্মবেশে এবং বসন্তক ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে অবন্তিদেশের রাজধানী উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন। ইতোমধ্যে তাঁরা গুপ্তচর পাঠিয়ে বন্দি উদয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। যৌগন্ধরায়ণ, রুমণ্বান ও বসন্তক উজ্জয়িনীর এক জনশূন্য মন্দিরে একত্রিত হয়ে উদয়নকে উদ্ধারের পরিকল্পনায় সচেষ্ট হন এবং সাধারণ মানুষের যাতে বোধগম্য না হয় সেই জন্যে তাঁরা সাংকেতিক ভাষায় আলাপ করেন। আর উক্ত দৃশ্যেই দর্শকগণ ছদ্মবেশীদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন। অতঃপর তাঁরা পুনরায় এক জনহীন যজ্ঞগৃহে (মন্ত্রণাকক্ষ) মিলিত হয়ে উদয়নকে উদ্ধারের ব্যাপারে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরিকল্পনা করতে খোলামেলা আলোচনা করেন। এদিকে বিদূষক বসন্তক গোপনে মহারাজ উদয়নের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বন্দি অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করেন। বিদূষক অবগত হন যে, রাজকুমারী বাসবদত্তা পালকিতে করে কারাগৃহের বিপরীত রাস্তা দিয়ে ভগবতী যক্ষিণীর মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার সময় কারাগারের দ্বারপ্রান্তে অবস্থানরত মহারাজ উদয়ন পালকির খোলা দরজা দিয়ে বাসবদত্তাকে দর্শন করেন এবং প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। আর তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও পরিকল্পনা করেন যে, মণিমন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ করে, আগুন জ্বালিয়ে ও শঙ্খ-ঘন্টা বাজিয়ে মহাসেনের নলাগিরি নামক হাতিকে খেপিয়ে তোলা হবে এবং তখন মহাসেন সেই পাগলা হাতিকে বশে আনতে উদয়নের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে উদয়নকে কারামুক্ত করলে উদয়ন ঘোষবতী বীণার সুরে তাকে বশ করে তারই পিঠে আরোহণ করে নিজরাজ্যে গমন করবেন। ইতোমধ্যে রাজকুমারী বাসবদত্তার সঙ্গে বৎসরাজ উদয়ন প্রেমে আবদ্ধ হওয়ায় তিনি বিদূষকের নিকট যৌগন্ধরায়ণের সমগ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব প্রকাশ করেন। ফলে বিদূষকও উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নন। তাই তিনি যৌগন্ধরায়ণকে বাসবদত্তাসহ উদয়নকে উদ্ধার করতে অনুরোধ করলে যৌগন্ধরায়ণ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন এবং যৌগন্ধরায়ণ তাঁর দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করে বলেন :

> সুভদ্রামিব গাণ্ডীবী নাগঃ পদ্মলতামিব।
> যদি তাং ন হরেদ্ রাজা নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ ॥
> *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*, ৩/৮[১৮]

অর্থাৎ, অর্জুন যেরূপ সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন, হাতি যেরূপ পদ্মের ডাটা হরণ করে, তদ্রূপ রাজা উদয়ন যদি সেই রাজকন্যাকে হরণ করতে না পারেন, তাহলে আমার যৌগন্ধরায়ণ নামই অর্থহীন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও যৌগন্ধরায়ণ আরেকটি প্রতিজ্ঞা করেন। যাকে আমরা তাঁর তৃতীয় প্রতিজ্ঞা বলে অভিহিত করতে পারি। তিনি বলেন :

যদি তাং চৈব তং চৈব তাং চৈবায়তলোচনাম্।
নাহরামি নৃপং চৈব নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ॥

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্, ৩/৯[১৯]

অর্থাৎ, যদি আমি সেই ঘোষবতী নামক বীণা, নলাগিরি নামক হস্তী, আয়তলোচনা (বাসবদত্তা) এবং রাজা উদয়নকে একত্রে উদ্ধার করতে সক্ষম না হই, তাহলে আমার যৌগন্ধরায়ণ নামই মিথ্যা।

অতঃপর চতুর্থাঙ্কে উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদের এক কর্মচারীকে ভদ্রবতী নামক হস্তীর পরিচারককে খুঁজতে দেখা যায়। যার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করে রাজকুমারী বাসবদত্তা উদকক্রীড়া করেন। মূলত পরিচারক ছেলেটি হলো যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক নিযুক্ত একজন গুপ্তচর। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে বাসবদত্তার ভৃত্যরূপে কর্মে নিযুক্ত হন। মদ খেয়ে মাতাল হওয়ায় তিনি কাজের কথা ভুলে যান। বাসবদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে উদয়নের পালানোর পর মহাসেনের সৈন্যদের সঙ্গে যৌগন্ধরায়ণ তাঁর গুপ্তচরদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কৌশাম্বীর সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছালে মহাসেনের সৈন্যরা উদয়নের পশ্চাদানুসরণ করতে ব্যর্থ হন। তবে দুর্ভাগ্যবশত যৌগন্ধরায়ণ বন্দি হন। কিন্তু তিনি তাঁর রাজনৈতিক কূটকৌশলে মহারাজ উদয়নকে উদ্ধার করার আনন্দে গর্বিত হয়ে স্বীয় বন্দিদশাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এরপর মহাসেনের মন্ত্রী ভরতরোহক ও উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের দেখা হয় এবং ভরতরোহক যৌগন্ধরায়ণের চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনাকে কটাক্ষ করায় যৌগন্ধরায়ণও তাঁর প্রত্যুত্তরে মহাসেনের কপটতার কথা উল্লেখ করে নিজের কৃতকর্মকে যৌক্তিক বলে প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তাঁদের কথোপকথন শুনে মহাসেনের বৃদ্ধ অন্তঃপুর-রক্ষী সেখানে উপস্থিত হন এবং যৌগন্ধরায়ণের কর্ম ও কর্তব্যের প্রতি প্রশংসাপূর্বক সম্মান দেখিয়ে তিনি তাঁকে একটি দামি পানপাত্র উপহার হিসেবে প্রদান করেন। উক্ত দৃশ্য অবলোকন করে ভরতরোহক আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনিও বন্দিকৃত শত্রুর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এদিকে বাসবদত্তার অপহরণের সংবাদে রাজমহিষী শোকে-দুঃখে আকুল হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিলে মহাসেন তাঁকে বহু কষ্টে শান্ত করেন এবং উদয়নকে জামাতারূপে স্বীকৃতি দিয়ে কন্যা ও জামাতার গোপন বিয়ে অনুমোদন করেন। পরিশেষে অন্তঃপুরে বর-কনের ছবিকে সাজিয়ে বিয়ের মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য বিষয়বস্তুকে পর্যালোচনা করলে প্রাচীন কাহিনি থেকে উক্ত নাটিকার কাহিনিতে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন, প্রাচীন কাহিনিতে নায়ক-নায়িকা পরস্পর দর্শনের পূর্বেই নাম ও গুণাবলিতে আকৃষ্ট হয়ে একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়। আর উক্ত নাটিকায় বর্ণিত হয়েছে যে, বন্দি উদয়ন কারাগৃহের দ্বারদেশ থেকে পালকিতে অবস্থিত বাসবদত্তাকে দর্শন করার পর পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সৃষ্টি হয়। এই নাটিকায় বাসবদত্তার বীণাশিক্ষার শিক্ষক হিসেবে উদয়নের নিযুক্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। অথচ প্রাচীন কাহিনিতে দূতের মাধ্যমে বাসবদত্তার বীণাশিক্ষা প্রসঙ্গে মহাসেন ও উদয়নের মধ্যে কথোপকথন উল্লেখ আছে। প্রাচীন কাহিনিতে উদয়নের কর্মচারীরাই তাঁকে মহাসেনের কৃত্রিম হাতির বিষয়ে অবগত করেন। কিন্তু আলোচ্য নাটিকায় মহাসেনেরই কোনো এক গুপ্তচর উদয়নকে কৃত্রিম নীল হাতি সম্পর্কে প্রথম জানান। প্রাচীন কাহিনিতে যৌগন্ধরায়ণ তাঁর অলৌকিক ও বিস্ময়কর ক্ষমতার মাধ্যমে তাঁর নিজের ও বসন্তকের চেহারা পরিবর্তন করে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন এবং রুমণ্বান্ রাজ্যরক্ষার জন্য কৌশাম্বীতেই অবস্থান করেন। কিন্তু উক্ত নাটিকায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যৌগন্ধরায়ণ, বসন্তক ও রুমণ্বান্‌Iএরা তিনজনই ছদ্মবেশ ধারণ করে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন। এছাড়া বসন্তক একাই গোপনে বন্দি উদয়নের সঙ্গে দেখা করে সংবাদ আদান-প্রদান ও সংগ্রহ করেন। অথচ প্রাচীন কাহিনিতে বসন্তক ছাড়াও যৌগন্ধরায়ণ নিজে সকলের অজান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বাসবদত্তা ও উদয়নের সঙ্গে দেখা করে উজ্জয়িনী ত্যাগের বিষয়ে পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রাচীন কাহিনির নায়ক উদয়ন হলেও আলোচ্য নাটিকার নায়ক যৌগন্ধরায়ণ। এমন কি এখানে নায়িকা বাসবদত্তার নাম বহুবার উল্লিখিত হলেও ভাস চরিত্র হিসেবে বাসবদত্তাকে দৃশ্যে উপস্থাপন করেননি।

সুতরাং, দেখা যায় যে, নাট্যকার ভাস প্রকৃতপক্ষে লোকপ্রসিদ্ধ প্রণয়-কাহিনিকে অন্তরালে রেখে রাজনৈতিক কাহিনিকেই সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন আলোচ্য নাটিকায়। চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে ভাস সার্বিকভাবে প্রাচীন কাহিনিকেই অনুসরণ করেছেন দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্ নামক নাটিকার নায়ক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। বন্দি বৎসরাজ উদয়নকে সস্ত্রীক উদ্ধারের নিমিত্তে তাঁর দ্বারা গৃহীত তিনটি প্রতিজ্ঞাকে ঘিরেই মূলত উক্ত নাটিকার কাহিনি আবর্তিত হওয়ায় এর *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* নামকরণ যথার্থই সার্থক হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বন্দি বৎসরাজ উদয়নকে উদ্ধারের নিমিত্তে তাঁর বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক গৃহীত প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সৃষ্ট রাজনৈতিক কূটকৌশলসম্পন্ন পরিকল্পনাসমূহের সফলতাই আলোচ্য

Dhaka University Institutional Repository

নাটিকার মূলীভূত বিষয়। এর মাধ্যমে রাজার প্রতি তাঁর রাজকর্মচারীদের একনিষ্ঠতা, সততা, কর্তব্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা অত্যন্ত সুন্দরভাবে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতরাং, বলা যায় যে, যৌগন্ধরায়ণের ন্যায় কর্তব্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর নাম সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য তথা সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে স্বমহিমায় বিরাজমান।

খ. *স্বপ্নবাসবদত্তম্* : *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে নয়টি পুরুষচরিত্র এবং নয়টি নারীচরিত্র বিদ্যমান। পুরুষ চরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার –	নাটকের পরিচালক, রঙ্গাধ্যক্ষ
রাজা –	বৎসরাজ উদয়ন, নাটকের নায়ক
যৌগন্ধরায়ণ –	বৎসরাজ উদয়নের শুভাকাঙ্ক্ষী ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন মন্ত্রী
বিদূষক –	বসন্তক নামে রাজা উদয়নের প্রিয়বয়স্য
ব্রহ্মচারী –	লাবাণক গ্রামের বেদবিদ্যার্থী ছাত্র
কাঞ্চুকীয় –	মগধরাজ দর্শকের অন্তঃপুরগামী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
রৈভ্যের সগোত্র কাঞ্চুকীয় –	উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের অন্তঃপুরগামী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
সম্ভাষক –	মগধ-রাজকুমারী পদ্মাবতীর ভৃত্য
ভট –	মগধ-রাজকুমারী পদ্মাবতীর অপর ভৃত্য

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

বাসবদত্তা –	আবন্তিকার বেশধারিণী বৎসরাজ উদয়নের প্রথমা মহিষী
পদ্মাবতী –	মগধরাজ দর্শকের ভগ্নী, বৎসরাজ উদয়নের দ্বিতীয়া মহিষী
তাপসী –	মগধের আশ্রমবাসিনী তপস্বিনী
চেটী –	পদ্মাবতীর পরিচারিকা
পদ্মিনিকা, মধুকরিকা –	পদ্মাবতীর সখী ও সেবিকাদ্বয়
ধাত্রী –	পদ্মাবতীর উপমাতা
বসুন্ধরা –	বাসবদত্তার উপমাতা
বিজয়া –	মগধরাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষিকা (প্রতিহারী)

এছাড়া অন্যদের সংলাপে কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত নারীচরিত্রগুলো হলো :

আশ্রমবাসিনী মহাদেবী –	মগধরাজ-জননী
অঙ্গারবতী –	অবন্তিরাজ মহিষী

কুঞ্জরিকা	–	চেটী
অবন্তিসুন্দরী	–	যক্ষিণী
বিরচিকা	–	উদয়নের পূর্ব প্রেমিকা

স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের একটি পটভূমি রয়েছে। সেটি হলোImবৎসরাজ উদয়ন অবন্তি-রাজকন্যা বাসবদত্তাকে বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকলে বৎসরাজ উদয়ন তাঁর শত্রু আরুণি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে রাজ্যচ্যুত অবস্থায় পাত্র-মিত্রসহ রাজধানী পরিত্যাগ করে লাবাণক নামক এক গ্রামে অজ্ঞাতবাস করেন। ইতোপূর্বে দৈবজ্ঞরা গণনা করে বলেছিলেন যে, মগধরাজ-দর্শকের বোন পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজা উদয়নের বিয়ে হবে। দৈবজ্ঞদের এরূপ গণনায় বিশ্বাস করে উদয়নের বিচক্ষণ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রভুর হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনে রানি বাসবদত্তা, অমাত্য রুমণ্বান্, বিদূষক বসন্তক প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন উদয়ন মৃগয়ায় গেলে সে সময় গোপনে আগুন লাগিয়ে যৌগন্ধরায়ণ লাবাণকের বাসগৃহ পুড়িয়ে দেন এবং রটিয়ে দেন যে, বাসবদত্তা আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। আর তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও মারা গেছেন। অতঃপর নাটকের প্রথম অঙ্কের ঘটনা আরম্ভ হয়।

প্রথমেই পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে যৌগন্ধরায়ণ আবন্তিকার বেশধারিণী বাসবদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বোন পরিচয়ে মগধরাজ্যের এক তপোবনে উপস্থিত হন। ঘটনাক্রমে ঐ তপোবনে তাঁরা মগধরাজ দর্শকের ভগ্নী রাজকুমারী পদ্মাবতীর দেখা পান। পদ্মাবতীকে দেখে প্রথম থেকেই যৌগন্ধরায়ণ তাঁর প্রতি প্রভুপত্নীরূপে আত্মীয়তাবোধ অনুভব করেন এবং বাসবদত্তা অনুভব করেন তাঁর প্রতি ভগ্নীস্নেহ। পরিকল্পনা অনুসারে ভগ্নীরূপী আবন্তিকাবেশধারিণী বাসবদত্তাকে কিছুকালের জন্য 'ন্যাস' রূপে পদ্মাবতীর নিকট রাখার প্রার্থনা মঞ্জুর হলে যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যতে বাসবদত্তার চরিত্র সম্পর্কে কেউ যাতে প্রশ্ন উত্থাপন করতে না পারে — তারই সাক্ষ্য হিসেবে যৌগন্ধরায়ণ এরূপ ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হন। এমন সময় আশ্রমে লাবাণক গ্রাম থেকে আগত একজন ব্রহ্মচারীর প্রবেশ ঘটে। এই ব্রহ্মচারীর বক্তব্য থেকেই আলোচ্য নাটকের পটভূমি সম্পর্কে দর্শক শ্রোতা জানতে পারেনIযা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রহ্মচারীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ছদ্মবেশী যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তার স্বগতোক্তি থেকে দর্শক-শ্রোতা তাঁদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কেও জানতে পারেন। তদুপরি যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা উদয়নের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি রুমণ্বান্ ও অন্যান্য মন্ত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন সম্পর্কে জানতে পারেন। বাসবদত্তা উদয়নের অবস্থার কথা জেনে দুঃখ পেলেও তাঁর প্রতি স্বামীর প্রাণাধিক ভালোবাসার কথা জেনে তিনি মুগ্ধ হন। পদ্মাবতীও বিগত পত্নীর প্রতি উদয়নের অনুরাগের কথা শুনে তাঁর প্রতি সহমর্মিতা অনুভব করেন। এরপর ব্রহ্মচারী সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে যৌগন্ধরায়ণও ভগ্নীরূপী বাসবত্তাকে পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রেখে 'পুনরায় দেখা হবে'—এই আশা ব্যক্ত করে বিদায় গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে পদ্মাবতী ও বাসবদত্তার মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সখ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুদিন পর বৎসরাজ উদয়ন কোনো প্রয়োজনে মগধ রাজ্যের রাজধানীতে আগমন করেন। মগধরাজ দর্শক তাঁর উচ্চবংশ, জ্ঞান, রূপ ও বয়স দেখে মুগ্ধ হয়ে বোন পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিয়ের প্রস্তাব দিলে উদয়ন সম্মত হন এবং পদ্মাবতীও বৎসরাজ উদয়নের গুণোমুগ্ধ হয়ে তাঁকেই স্বামী হিসেবে পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে উদয়ন নিজে থেকে বিয়ের প্রস্তাব না দেওয়ায় বাসবদত্তা মনে কিছুটা হলেও স্বস্তি পান। চেটীর নিকট থেকে জানা যায় যে, শুভদিন হওয়ায় মহারানি পদ্মাবতীর বিয়ের কৌতুকমঙ্গলের দিন সেদিনই ধার্য করেন।

তৃতীয় অঙ্কে উদয়ন ও পদ্মাবতীর বিয়ে উপলক্ষে সমগ্র মগধরাজ্য আনন্দে ভরপুর দেখা যায়। শুধু বাসবদত্তাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একা একা প্রমোদবনে সময় অতিবাহিত করেন। তবে শত দুঃখ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আর্যপুত্রকে দেখার আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি দেহধারণ করে থাকেন। বাসবদত্তার এ হেন চিন্তার মাঝে মগধরাজ-মহিষীর নির্দেশমত একজন চেটী এসে বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর বিয়ের মালা গেঁথে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। বাসবদত্তা অত্যন্ত মনোকষ্টে নিঃশব্দে মালা গেঁথে দেন। তার মালা গাঁথার সময় তিনি অন্যান্য ফুলের সঙ্গে অবিধবাকরণ ঔষধ যুক্ত করেন; কিন্তু সপত্নীমর্দন নামক ঔষধটি সরিয়ে রাখেন। এরপর বিয়ের অনুষ্ঠানে জামাতাকে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে চেটী মালাটি নিয়ে দ্রুত চলে গেলে বাসবদত্তা দুঃখ বিনোদনের নিমিত্তে স্বশয্যায় আসীন হন।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম অংশে প্রমোদবনে আগতা বাসবদত্তা, পদ্মাবতী ও চেটীর কথোপকথনের এক পর্যায়ে বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে স্বামী তাঁর কাছে কতটুকু প্রিয় জিজ্ঞেস করলে পদ্মাবতী উত্তর দেন যে, উদয়নের বিরহে তিনি উৎকণ্ঠিতা হন। এছাড়া উদয়ন তাঁর কাছে যেমন প্রিয় বাসবদত্তার নিকটও তেমন প্রিয় ছিলেন কিনাIসে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলে বাসবদত্তা নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন যে, উদয়ন বাসবদত্তার নিকট আরো বেশি প্রিয় ছিলেন। কেননা, তা না হলে উদয়নের জন্য তিনি স্বজনদের ত্যাগ করতে পারতেন না। তাঁদের কথোপকথনের এক পর্যায়ে উদয়ন ও বিদূষক

প্রমোদবনে ঢুকে পড়লে পদ্মাবতী বাসবদত্তা পরপুরুষের সামনে অস্বস্তি বোধ করবেন মনে করে পাশের মাধবী লতামণ্ডপে বাসবদত্তা ও চেটীসহ আত্মগোপন করে অবস্থান করেন। ফলে তাঁরা উদয়ন ও বিদূষকের কথাবার্তা সবই শোনেন; কিন্তু উদয়ন ও বিদূষক তাঁদের অবস্থানের কথা কিছুই জানতে পারেন না। উদয়ন ও বিদূষকের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, উদয়ন পদ্মাবতীকে বিয়ে করলেও বাসবদত্তাকে কখনো ভুলতে পারেননি। উদয়নের মনের যতটা জুড়ে বাসবদত্তার স্থান ছিল তা একটুও কমেনি। তাই তো কথা প্রসঙ্গে বিদূষক যখন উদয়নের নিকট জানতে চান যে, পূর্বের বাসবদত্তা ও বর্তমানের পদ্মাবতীর মধ্যে তাঁর কাছে কে বেশি প্রিয়, তখন উত্তরে উদয়ন বলেন :

> পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈঃ।
> বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি ॥
> *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, ৪/৪[২০]

> অর্থাৎ, যদিও পদ্মাবতী সৌন্দর্য, স্বভাব ও মাধুর্যে আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়, তথাপি বাসবদত্তার প্রতি আবদ্ধ আমার মনকে তিনি হরণ করতে পারেননি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাসবদত্তার অদর্শন উদয়নকে শয়নে-স্বপনে পীড়া দেয় এবং তখনো তাঁকে পাওয়ার জন্য উদয়নের মন ব্যাকুল। আড়ালে অবস্থানকারিণী আবন্তিকারূপী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী উদয়নের সকল কথাই শুনতে পান। সব শুনেও পদ্মাবতীর মনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো না। বরং একদিন যে স্ত্রীকে অন্তর দিয়ে উদয়ন ভালোবেসেছিলেন।মৃত্যুতেও তাঁকে ভুলে যাননি বিধায় উদয়নের এই বড় মনের পরিচয় পদ্মাবতীকে মুগ্ধ করে। বাসবদত্তাও স্বামীর অন্তরে তাঁর স্থান অটুট রয়েছে জেনে খুশি হন। এরপর রাজা উদয়নও বিদূষকের নিকট অনুরূপ প্রশ্ন করলে বিদূষক বসন্তকও বিশেষভাবে বাসবদত্তারই গুণকীর্তন করেন। উত্তরে উদয়ন বাসবদত্তাকে সব বলবেন বললে বিদূষক বলেন যে, বাসবদত্তা তো মৃতা, তাই তাঁকে বলার কোনো অবকাশ নেই। বিদূষকের কথায় উদয়ন তাঁর ভ্রম বুঝতে পেরে বাসবদত্তার জন্য বিলাপ করে করে অশ্রুমোচন করেন। এদিকে বিদূষক রাজার মুখ ধোয়ার জল আনতে গেলে বাসবদত্তার অনুরোধে পদ্মাবতী নিজে জলপাত্র নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হন। ফলে উদয়ন অস্বস্তিতে পড়েন। ঠিক তখনই বিদূষক জল নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, বাতাসে কাশকুসুমের রেণু রাজার চোখে পড়ায় তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। উদয়নও অনুরূপ কথা বলে কোনো রকমে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পান। অতঃপর স্বজনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে বিদূষক রাজা উদয়নকে নিয়ে মহারাজ দর্শকের রাজসভার উদ্দেশ্যে গমন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অঙ্কে পদ্মিনিকা এবং মধুকরিকা নামে দুইজন পরিচারিকার কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, রাজকুমারী পদ্মাবতী মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে সমুদ্রগৃহে অবস্থান করছেন। বিদূষকের নিকট থেকে এ সংবাদ জেনে উদয়ন পদ্মাবতীকে দেখার জন্য সমুদ্রগৃহে যান; কিন্তু সেখানে পদ্মাবতীকে দেখতে না পেয়ে তিনি পদ্মাবতীর জন্য রচিত শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে বাসবদত্তাও পদ্মাবতীর অসুখ সংবাদ শুনে সমুদ্রগৃহে যান এবং আবছা আলোতে শয্যায় শায়িত ঘুমন্ত উদয়নকে পদ্মাবতী বলে ভুল করে তাঁর পাশে শুয়ে পড়েন। হঠাৎ উদয়ন স্বপ্নের ঘোরে বাসবদত্তার সঙ্গে অনেক কথা বলতে থাকেন। তাতে বাসবদত্তার বিরহ যে তাঁর কাছে অসহ্য তা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল বাসবদত্তা শয্যাত্যাগ করে দ্রুত চলে যান। স্বপ্নের ঘোরে উদয়ন শয়নাবস্থা থেকে উঠে বাসবদত্তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে চৌকাঠে আহত হয়ে ফিরে আসেন এবং ঠিক বুঝতে পারেন না যে, বাসবদত্তা কি সত্যি? না স্বপ্ন? এ সময় বিদূষক ফিরে এলে উদয়ন তাঁকে বাসবদত্তাকে দেখার কথা জানিয়ে বলেন যে, বাসবদত্তা জীবিত আছেন। উত্তরে বিদূষক বলেন যে, বাসবদত্তার কথা ভাবতে ভাবতে রাজা নিশ্চয়ই তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন। একথা শুনে উদয়ন বলেন :

> যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
> অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্ ॥
>
> *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, ৫/৯[২১]

> অর্থাৎ, এ যদি স্বপ্নই হয়, তাহলে আমার জেগে না উঠাই শ্রেয়। আর যদি এটা ভ্রম হয়, তবে সে ভ্রম যেন আমার সব সময়ই থাকে।

বিদূষক আরো বলেন যে, এখানে অবন্তিসুন্দরী নামে এক যক্ষিণী বাস করেন, রাজা হয়তো তাকেই দেখে থাকবেন। এমন সময় সংবাদ আসে, উদয়নের সেনাপতি রুমণ্বান্ সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজ্য গ্রাসকারী আরুণিকে আক্রমণ করতে উপস্থিত হয়েছেন এবং সাহায্য করার জন্য মগধরাজ দর্শকের সৈন্যসামন্তও প্রস্তুত। অতঃপর উদয়ন যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায়, মগধরাজের সহায়তায় আরুণিকে পরাজিত করে বৎসরাজ্য উদ্ধার করার পরও উদয়নের মন বাসবদত্তার জন্য সবসময়ই ব্যাকুল থাকে। একদিন বাসবদত্তার পিতা-মাতা উদয়নের রাজ্যোদ্ধারে খুশি হয়ে উদয়ন-পদ্মাবতীর নিকট লোক পাঠান। তাদের সঙ্গে উদয়ন ও বাসবদত্তার দুটি চিত্রপট এবং বাণী পাঠিয়ে জানান যে, উদয়ন গোপনে বাসবদত্তাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাওয়ায় তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে চিত্রশিল্পী দিয়ে দুজনের প্রতিকৃতি এঁকে

তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। বাসবদত্তা জীবিত নেই, তবে প্রেরিত ছবি দুটি বাসবদত্তার স্মৃতিস্বরূপ উদয়নের ভাল লাগতে পারে। ছবি দেখে উদয়ন বিমর্ষ হয়ে পড়েন। আর আবন্তিকার সঙ্গে বাসবদত্তার প্রতিকৃতির হুবহু মিল রয়েছে দেখে পদ্মাবতী বিস্মিত হন এবং উদয়নকে জানান যে, ঠিক এই আকৃতির এক রমণীকে জনৈক পরিব্রাজক তাঁর নিকট ন্যাসরূপে রেখে গেছেন। তিনি তখনো তাঁর নিকটই আছেন। এমন সময় পরিব্রাজকবেশধারী যৌগন্ধরায়ণ ভগ্নীরূপী আবন্তিকাকে (বাসবদত্তা) গ্রহণ করার ছলে পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত হন। এরপর উদয়নের নির্দেশে আবন্তিকাবেশিনী বাসবদত্তাকে রাজসভায় আনা হলে বাসবদত্তার পিতা-মাতা কর্তৃক প্রেরিত ধাত্রী তাঁকে দেখেই চিনে ফেলেন। পরিব্রাজকবেশধারী যৌগন্ধরায়ণ তখন সমস্ত কথা খুলে বলেন। সব শুনে উদয়ন অত্যন্ত খুশি হন। আর তাই তো তিনি তাঁর বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

> যৌগন্ধরায়ণো ভবান্ ননু।
> মিথ্যোন্মাদৈশ্চ যুদ্ধৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ মন্ত্রিতৈঃ।
> ভবদ্‌যত্নৈঃ খলু বয়ং মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ ॥
> *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, ৬/১৮[২২]

অর্থাৎ, আপনি তো যৌগন্ধরায়ণই বটে! পাগলের ছদ্মবেশে, যুদ্ধের মাধ্যমে, শাস্ত্রসম্মত মন্ত্রণার মাধ্যমে আপনি যে সেবা করেছেন, তার দ্বারাই বিপদগ্রস্ত আমরা সর্বতোভাবে রক্ষা পেয়েছি।

অতঃপর মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে সকলে বাসবদত্তার পিতা-মাতার সঙ্গে দেখা করার জন্য অবন্তিরাজ্যে যেতে মনস্থ করেন। এরপর ভরত বাক্যের মাধ্যমে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

স্বপ্নবাসবত্তম্ নাটকের আলোচ্য বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে ঐতিহাসিক ও লোকপ্রসিদ্ধ তথা প্রাচীন কাহিনির সঙ্গে কতিপয় ক্ষেত্রে এর গরমিল লক্ষ করা যায়। প্রাচীন কাহিনি অনুসারে মগধের রাজা ছিলেন প্রদ্যোত; কিন্তু নাট্যকার ভাস রচিত *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকে দর্শককে মগধের রাজা বলা হয়েছে। প্রাচীন কাহিনিতে পদ্মাবতীকে বলা হয়েছে মগধের রাজা প্রদ্যোতের কন্যা; কিন্তু আলোচ্য নাটকে পদ্মাবতীকে মগধরাজ-দর্শকের ভগ্নী বলা হয়েছে। প্রাচীন কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে যে, বৎসরাজ উদয়নের ব্যসনে আসক্তির কারণে রাজ্যবিস্তারের দিকে কোনো মন ছিল না। তাই মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অন্য রাজ্য জয় করার মানসে অমাত্য রুমণ্বানের সঙ্গে আলাপ করে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকে বর্ণিত হয়েছে যে, আরুণি কর্তৃক দখলকৃত রাজধানী

Dhaka University Institutional Repository

কৌশাম্বী পুনরুদ্ধারের জন্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রাচীন কাহিনিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, অসীম শক্তিধর মগধরাজ কর্তৃক উদয়নের নতুন রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির আশঙ্কায় যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজ্য এবং মগধরাজ্যের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকে বলা হয়েছে যে, উদয়নের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে শক্তিধর মগধরাজ দর্শকের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ও দৈবজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে মগধরাজকুমারী পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহবন্ধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রাচীন কাহিনি অনুসারে যৌগন্ধরায়ণ তাঁর ইন্দ্রজালবিদ্যার দ্বারা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করেন এবং বাসবদত্তা ও বিদূষককে এ বিদ্যা প্রদান করায় তার মাধ্যমে বাসবদত্তা ও বিদূষক যথাক্রমে ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে তিনজনেই ছদ্মবেশে মগধরাজ্যের রাজভবন সংলগ্ন বাগানে পদ্মাবতীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকে বর্ণিত হয়েছে যে, যৌগন্ধরায়ণ পরিব্রাজকের এবং বাসবদত্তা আবন্তিকার বেশে মগধরাজ্যের এক আশ্রমে মগধরাজ-দর্শকের ভগ্নী পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হন। তবে বিদূষক তাঁদের সঙ্গী ছিলেন না। প্রাচীন কাহিনিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী যৌগন্ধরায়ণ ব্রাহ্মণীর বেশধারিণী বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর নিকট কন্যা পরিচয় দেন এবং বিদূষককে বাসবদত্তার ভাই পরিচয় দিয়ে দুজনকেই তাঁর নিকট ন্যাস হিসেবে গচ্ছিত রাখেন। অন্যদিকে, *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিদূষক তো তাঁদের সঙ্গে ছিলেনই না; তদুপরি যৌগন্ধরায়ণ আবন্তিকার বেশধারিণী বাসবদত্তাকে নিজের ভগ্নী পরিচয় দিয়ে পদ্মাবতীর নিকট শুধু বাসবদত্তাকেই ন্যাসরূপে গচ্ছিত রাখেন। প্রাচীন কাহিনি অনুসারে আবন্তিকার স্বামী বিপথগামী হয়ে আবন্তিকাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় যৌগন্ধরায়ণ তাকেই অনুসন্ধান করতে দেশান্তরে যেতে মন স্থির করেন বিধায় তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত পুত্র-কন্যা দুজনকেই পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখতে ইচ্ছা করেন। অপরদিকে, *স্বপ্নবাসবদত্তম্* অনুসারে যৌগন্ধরায়ণের ভগ্নী পরিচয়ধারী আবন্তিকা প্রোষিতভর্তৃকা বিধায় কিছুদিনের জন্য তিনি পদ্মাবতীর নিকট আবন্তিকাকে গচ্ছিত রাখতে চান। প্রাচীন কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে যে, মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর নিকট বাসবদত্তাকে ন্যাসরূপে গচ্ছিত রেখে সেদিনই যৌগন্ধরায়ণ লাবাণকে ফিরে যান এবং তাঁদের সকলের সম্মুখেই উদয়ন বাসবদত্তার অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারেন। কিন্তু *স্বপ্নবাসবদত্তম্* অনুসারে উদয়ন মৃগয়া থেকে ফিরেই বাসবদত্তার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের সংবাদ জানতে পারেন এবং তিনি আরো জানেন যে, বাসবদত্তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও অগ্নিতে প্রাণ হারান। প্রাচীন কাহিনিতে বলা হয়েছে যে, বৎসরাজ উদয়ন তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণপ্রিয়া পত্নী বাসবদত্তার বিয়োগে বহু বিলাপ করলেও তিনি বাসবদত্তার মৃত্যুকে বিশ্বাস করতে পারেননি। কারণ তিনি পূর্বেই সন্ন্যাসীর নিকট থেকে জানতে পারেন যে, বাসবদত্তার গর্ভে তাঁর এক বিখ্যাত পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। অথচ *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকে বৎসরাজ উদয়নের পুত্র-সন্তানলাভ সম্পর্কিত সন্ন্যাসীর কোনো বাণীর উল্লেখ নেই এবং বাসবদত্তার জীবিত থাকা নিয়েও উদয়নের বিশ্বাসের উল্লেখ নেই। তবে পঞ্চম অঙ্কে স্বপ্নদর্শনের পর রাজার মনে বাসবদত্তা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে মাত্র।

আলোচ্য নাটকের চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে ভাস পূর্বে উল্লিখিত *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* নাটিকার ন্যায় প্রাচীন কাহিনিকে অনুসরণ করেই তাঁর নাটকের চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করেছেন দেখতে পাওয়া যায়। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র যৌগন্ধরায়ণ হলেও নায়ক বৎসরাজ উদয়ন এবং নায়িকা বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী। তবে মূলনায়িকা বাসবদত্তাকেই বলা হয়। কারণ নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাসবদত্তার উপস্থিতি বিদ্যমান এবং পঞ্চমাঙ্কে স্বপ্নে বাসবদত্তাকে দর্শন করার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাট্যকার নাটকটির নামকরণ করেছেন। পঞ্চমাঙ্কে সমুদ্রগৃহে উদয়ন ও বাসবদত্তার আকস্মিক মিলন বাসবদত্তার নিকট বাস্তব; কিন্তু উদয়নের নিকট স্বপ্ন। কেন না, নিদ্রা ভাঙার পর উদয়ন বাসবদত্তাকে দেখতে না দেখতেই তিনি স্বপ্নের ন্যায় মিলিয়ে যান। আবার লাবাণকে বাসবদত্তার আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা থেকে আরম্ভ করে শেষ অঙ্কে যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক প্রদত্ত বৎসরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্তে গৃহীত পরিকল্পনার বিস্তৃত বর্ণনা এবং বাসবদত্তার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন।সবই উদয়নের নিকট স্বপ্নরূপ প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, 'স্বপ্ন' এবং 'বাসবদত্তা'—এই দুটিই নাটকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে বিধায় উক্ত নাটকের *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। তবে কোনো কোনো সমালোচকের মতে, নাট্যতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকের নামকরণ যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক হয়নি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর যা বলেছেন তাকে ব্যাখ্যা করে বলা চলে যে, শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত পদ্মাবতীর জন্যই সমুদ্রগৃহে শয্যা রচিত হয়েছিল। তাঁকে দেখার জন্যই রাজা উদয়ন, বিদূষক, বাসবদত্তা ও চেটীর সেখানে যাওয়ার কথা নাট্যকার কুশীলবদের সংলাপের মধ্য দিয়ে জানান। কিন্তু সমুদ্রগৃহে পদ্মাবতীকে কখনো দেখা গেল না। সমুদ্রগৃহে পদ্মাবতীর কোনো সময়েই না আসার কারণ শত চিন্তা করেও খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজা উদয়ন যখন চৌকাঠে আঘাত পেয়ে ফিরে এসে বাসবদত্তার জীবিত থাকার বিষয়ে ইতিবাচক সন্দেহ প্রকাশ করে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন বিদূষক এক পর্যায়ে রাজাকে শান্ত করার জন্য বলেছেন যে, মগধরাজগৃহে অবন্তিসুন্দরী নামে

এক যক্ষিণী বাস করেন। সম্ভবত রাজা তাকেই দেখে থাকবেন। রাজার প্রতি বিদূষকের এ উক্তিতে এক একবার মনে হয়, বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের মিলনের জন্য বিদূষকই কোনো একজন চেটীর সাহায্যে এ চক্রান্ত করেন। আবার মনে হয়, উদয়নের রাজ্য উদ্ধার তখনো হয়নি বিধায় ঠিক এমন সময় হিতৈষী বিদূষকের পক্ষে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি নাটকের ঘটনা বিন্যাসে এমন সন্দেহ ও অস্পষ্টতা একান্তই অসংগত ও অস্বাভাবিক।[২৩] এ ছাড়া শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> অনেকের মতে– স্বপ্নবাসবদত্তম্ নামটি এই নাটকের পক্ষে যথাযথ হয় নি; কারণ, এ নাটকে স্বপ্নদৃশ্যের ঘটনাটি বাসবদত্তার পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও এটি নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা নয়। নাটকের প্রথমাংশের ঘটনার সঙ্গে স্বপ্নদৃশ্যের কোনো যোগ নেই। নাটকটি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রধান; বলবান শত্রুকর্তৃক অধিকৃত কৌশাম্বীরাজের রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তিশালী মগধরাজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যেই মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহের কথা ভেবেছিলেন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। পদ্মাবতী উদয়নের মহিষী হবেন।দৈবজ্ঞগণের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সঙ্কল্পকে দৃঢ় করেছিল এবং উদয়নের প্রথমা পত্নী বাসবদত্তার আত্মত্যাগ তাঁর পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলেছিল। এই সমস্ত ঘটনাই নাটকের আসল ঘটনা। স্বপ্নবাসবদত্তা নামকরণটি তাই নাটকের মূখ্যার্থসূচক নয়।[২৪]

প্রসঙ্গত সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের আলোকে নামকরণের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে চতুর্দশ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> নাম কার্য্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থ প্রকাশকম্।
> নায়িকানায়কাখ্যানাং সংজ্ঞা প্রকরণাদিষু ॥
> *সাহিত্যদর্পণঃ*, ৬/১৪২[২৫]

অর্থাৎ, নাটকে উল্লিখিত অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসারে নাটকের নামকরণ হবে এবং নায়িকা অথবা নায়কের নামানুসারে প্রকরণাদির নামকরণ হবে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় চরিত্র অথবা নায়ক-নায়িকার নাম, কাহিনি নিয়ন্ত্রণকারী কোনো বস্তু, বিষয়, ঘটনা অথবা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নামকরণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। কেন্দ্রীয় চরিত্র ও কাহিনি নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়কে অবলম্বন করে ভাস তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের নামকরণ করেন *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*। *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকের মূল কাহিনি রাজনৈতিক ঘটনা-প্রধান। সেখানে নামকরণটি মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে পঞ্চম অঙ্কে এসে রাজা উদয়নের একটি স্বপ্ন এবং

Dhaka University Institutional Repository

তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি শাখা কাহিনিকে অবলম্বন করে নামকরণ করা নামকরণ সংক্রান্ত নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে ধরলে ভুল বলা হবে না।[২৬]

পরিশেষে বলা যায় যে, আলোচ্য নাটকের নায়িকা বাসবদত্তা যে আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। স্বামীর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে, স্বামীকে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত করতে নিজের সম্মুখে প্রাণপ্রিয় স্বামীকে অন্য নারীর সঙ্গে বিয়ে হতে দিয়ে বাসবদত্তা যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন Í তাতে একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক ও কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রী তথা নারীর পরিচয়ই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। সর্বোপরি মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনায় বাসবদত্তার সম্মতি ব্যতীত তা বাস্তবায়িত করা কোনো ক্রমেই সম্ভব হতো না। এ ক্ষেত্রে বাসবদত্তার সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে, পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিয়ের পরও তাঁর প্রথমা স্ত্রী বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ থাকা এবং উদয়নের প্রথমা স্ত্রী মৃত জেনে বিয়েতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও বাসবদত্তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে উদয়নের সঙ্গে পুনর্মিলনের ঘটনায় পদ্মাবতীর রাগান্বিত না হয়ে বরং স্বামীর প্রথমা স্ত্রী বাসবদত্তার প্রতি সহমর্মিতা ও বদান্যতা প্রকাশের মাধ্যমে পদ্মাবতী চরিত্রকে ভাস অতীব মহীয়সী করে তুলেছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, বৎসরাজ উদয়নের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে তাঁর বিচক্ষণ, সৎ, বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবে প্রতিফলিত করার মধ্যেমে মগধরাজ-দর্শকের সহায়তায় বৎসরাজ্য উদ্ধার এবং বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের পুনর্মিলনই *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকের মূলীভূত বিষয়। সবশেষে বলা যায় যে, যৌগন্ধরায়ণের ন্যায় বিচক্ষণ, সৎ, বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত মন্ত্রীর এবং বাসবদত্তার ন্যায় দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন আদর্শ পত্নীর সংস্পর্শে যেকোনো রাজাই দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনায় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

৪.৫ পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত নাটক

ক. *অবিমারকম্*: *অবিমারকের* চরিত্রগুলোর মধ্যে দশটি পুরুষচরিত্র এবং তেরটি নারীচরিত্র রয়েছে। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার	–	নাটকের পরিচালক বা রঙ্গাধ্যক্ষ
অবিমারক	–	নাটকের নায়ক; সৌবীররাজপুত্র বিষ্ণুসেন Í যিনি ব্রহ্মশাপে চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত হন
কুন্তিভোজ	–	কন্যাপুরের রাজা, নাটকের নায়িকা কুরঙ্গীর পিতা

কৌঞ্জায়ন, ভূতিক–		কুন্তিভোজের দুই মন্ত্রী
সৌবীররাজ	–	অবিমারকের পিতা
নারদ	–	দেবর্ষি
বিদ্যাধর	–	মেঘনাদ, অবিমারককে অঙ্গুরীয়ক প্রদানকারী
বিদূষক	–	সন্তুষ্ট নামে অবিমারকের প্রিয়বয়স্য
ভট	–	কুন্তিভোজের ভৃত্য

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

নটী	–	সূত্রধার পত্নী
কুরঙ্গী	–	নাটকের নায়িকা, রাজা কুন্তিভোজের কন্যা
দেবী	–	কুন্তিভোজের মহিষী
সুদর্শনা	–	কাশিরাজের মহিষী
ধাত্রী	–	জয়দা নামে রাজকুমারী কুরঙ্গীর উপমাতা
নলিনিকা, মাগধিকা, বিলাসিনী –		রাজকুমারী কুরঙ্গীর তিনজন পরিচারিকা
বসুমিত্রা, হরিণিকা –		দেবীর দুইজন পরিচারিকা
সৌদামিনী	–	বিদ্যাধরের প্রিয়তমা
কেতুমতী	–	কুন্তিভোজের দ্বাররক্ষিকা (প্রতিহারী)
চেটী	–	চন্দ্রিকা নামে কুরঙ্গীর পরিচারিকা

এছাড়া অন্যদের সংলাপে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত নারীচরিত্রগুলো হলো :

সুচেতনা	–	সৌবীররাজ-মহিষী
সুমিত্রা	–	কুরঙ্গীর কনিষ্ঠা ভগ্নী
সাধারণ গণিকা		

অবিমারকম্ নাটকের প্রথমেই লক্ষ করা যায় যে, কন্যাপুরের রাজা কুন্তিভোজ ও রানি তাঁদের কন্যার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করার এক পর্যায়ে মন্ত্রী কৌঞ্জায়নের নিকট থেকে জানতে পারেন যে, রাজকুমারী কুরঙ্গী খেলা শেষ করে বাগান থেকে ফেরার সময় যখন গাড়িতে উঠেন, তখন গাড়ির সম্মুখে মদমত্ত গজরাজ অঞ্জনগিরির আবির্ভাবে কোলাহলের সৃষ্টি হয়। এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক অভূতপূর্ব প্রক্রিয়ায় সেই গজরাজকে গাড়ির নিকট থেকে সরিয়ে নেয় এবং এর ফলে রাজকুমারী

নিরাপদেই রাজপ্রাসাদে ফিরতে সক্ষম হন। অমাত্য ভূতিক যুবকটির পরিচয় সম্পর্কে খোঁজ নিলে যুবকটি অন্ত্যজ বলে নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু ভূতিক যুবকটির কথা বিশ্বাস করতে না পেরে তিনি তাঁর সন্দেহের বিষয়টি রাজাকে জানান। রাজা ভূতিককে যুবকটির ব্যাপারে আরো অধিক খোঁজ-খবর করার আদেশ দেন এবং কাশিরাজের নিকট থেকে রাজকন্যা কুরঙ্গীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আগত দূত সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ প্রার্থনা করেন। এর প্রেক্ষিতে দুজন মন্ত্রীই জানান যে, ইতোপূর্বে সৌবীররাজের নিকট থেকেও রাজকন্যার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে দূতের আগমন ঘটেছে। এ ছাড়া কাশিরাজ ও সৌবীররাজ—দুজনই মহারাজের ভগ্নীপতি। অধিকন্তু সৌবীররাজ রাজমহিষীর ভ্রাতা। সুতরাং, সৌবীররাজের সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অধিক ঘনিষ্ঠ। মন্ত্রীদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজা সৌবীররাজ কর্তৃক পুনরায় দূত প্রেরিত না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে ভূতিক চরের মাধ্যমে সংগৃহীত সংবাদ রাজাকে জানান। তিনি বলেন, সৌবীররাজ ও তাঁর পুত্রকে বহুদিন ধরে রাজ্যে দেখা যায় না। মন্ত্রীরা রাজকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। একথা শুনে রাজা ভূতিককে সৌবীররাজ ও তাঁর পুত্রের নিখোঁজের কারণ অনুসন্ধানের আদেশ দেন এবং কাশিরাজের দূতকে আপাতত বিদায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্নান-আহারের উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে গমন করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় রাজকুমারী কুরঙ্গীর প্রেমে আপ্লুত নায়ক অবিমারককে। তিনি রাজকুমারীর স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত। এদিকে রাজকুমারীও অবিমারকের বিরহে কাতর। তাঁর অবস্থা দেখে ধাত্রী ও পরিচারিকা নলিনিকা অবিমারকের নিকট উপস্থিত হন। পথিমধ্যে দৈববাণীর মাধ্যমে তারা অবিমারকের বংশাভিজাত্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন। অবিমারকের নিকট তারা রাজকুমারীর করুণ অবস্থার কথা জানিয়ে সেদিন রাতেই ছদ্মবেশে অবিমারককে কন্যাপুরে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণে অবিমারক যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন। তিনি তাদের নিকট থেকে কন্যাপুরের সমস্ত সংবাদ জেনে নেন এবং মাঝরাতে রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের বিদায় দেন। অতঃপর সন্ধ্যাবেলায় বিদূষকের নিকট অতি আগ্রহে এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে অবিমারক সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তার নিকট থেকে এ কাজ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিদূষক এ হেন দুঃসাহসিক অভিযানে অবিমারককে একা ছাড়তে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত এক শর্তে তাকে রাজি হতেই হলো। শর্তটি হলো : রাতে নির্দিষ্ট সময়ের আগ পর্যন্ত তারা দুজনে নগরে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকবেন। আর এ কারণেই রাতের খাবার শেষ করে শোবার ঘর থেকে তারা গোপনে চলে যাবেন বন্ধুর বাড়িতে। অতঃপর পরামর্শ শেষে অবিমারক সন্ধ্যাকালীন স্নান ও আহারের জন্য অভ্যন্তরে গমন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, সন্ধ্যারাতে মাগধিকা ও বিলাসিনী নামের দুইজন পরিচারিকার সঙ্গে রাজকুমারী কুরঙ্গী রাজপ্রাসাদের ছাদে বসে আছেন। কুরঙ্গী ঘুমের ভান করে পরিচারিকাদের আলাপচারিতার মাধ্যমে জানেন যে, কাশিরাজের পুত্র জয়বর্মার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কাশিরাজের নিকট থেকে আগত দূতকে সসম্মানে বিদায় দিতে কন্যাপুরের অন্যতম মন্ত্রী ভূতিককে পাঠানো হয়েছে বিধায় কন্যাপুর তখন অরক্ষিত। এমন সময় নলিনিকা নামের পরিচারিকা এসে রাজকুমারীর কানে কানে মধ্যরাতে অবিমারকের কন্যাপুরে আগমনের সংবাদ জানিয়ে রাজকুমারীর সেবায় রত হলে অন্য পরিচারিকাদ্বয় চলে যায়। অতঃপর মাঝরাতে খড়্গ আর রজ্জু হাতে নিয়ে চোরের ছদ্মবেশে অবিমারক রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে চলার পথে নগরের রাত্রিবেলার অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করে এক নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। কখনো বীণার সুরে নারীকণ্ঠের গান ভেসে আসেন। কোথাও চোখে পড়ে অভিমানিনী প্রেমিকার মানভঞ্জন; আবার কখনো কানে আসে পেঁচার বিকট চীৎকার; কখনো বা চোখে পড়ে কামার্তদের আওয়াজসমন্বিত অভিসার। এ ছাড়া রাতের নগরীতে একদিকে তস্কর আর অন্যদিকে একান্ত চিত্তে পাহারায়রত প্রহরীদেরও অভাব নেই। পরিশেষে অবিমারক রাজপ্রাসাদের সম্মুখে পৌঁছে রজ্জুর মাধ্যমে প্রাসাদের প্রাচীর পার হয়ে কন্যাপুরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে রাজকুমারী কুরঙ্গীকে দেখতে পান। তাঁকে দেখামাত্র নলিনিকা স্বাগত জানিয়ে রাজকুমারীকে জাগাতে চাইলে অবিমারক বাধা দেন। ঘুমের ঘোরে রাজকুমারী নলিনিকাকে আলিঙ্গন করতে বললে নলিনিকার কথায় অবিমারক নিজেই তাঁকে আলিঙ্গন করেন। একথা জানতে পেরে রাজকুমারী ভীতসন্ত্রস্ত ও লজ্জিত হওয়ায় অবিমারক রাজকুমারীর ভয় ভেঙ্গে দেন। এরপর ধাত্রীর আদেশে নলিনিকা দুজনকেই অন্দরমহলে নিয়ে গেলে উৎফুল্লচিত্তে অবিমারক বলে উঠেন :

... যদ্যেষা ক্ষণদা ভবেদ্ যুগশতং ধন্যো মদন্যঃ কুতঃ ॥

অবিমারকম্, ৩/২০[২৭]

অর্থাৎ, এই সুখের রাত যদি শতযুগ ধরে চলত, তাহলে আমার চেয়ে কে বেশি ধন্য হতো?

চতুর্থাঙ্কে একবছর পরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবছর কন্যাপুরে অবিমারকের পরমানন্দে ও সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত হওয়ার পর একথা রাজার কর্ণগোচর হলে রাজা কন্যাপুরকে সুরক্ষিত করেন। কিন্তু এরই মধ্যে অবিমারক কন্যাপুর ত্যাগ করেন। কন্যাপুর ত্যাগ করে চলে আসার পর থেকে অবিমারকের মনে কোনো শান্তি নেই। তিনি বিষণ্নমনে বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাঘুরি করেন। এক পর্যায়ে কুরঙ্গীকে ছেড়ে থাকার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমত বনের দীঘিতে ডুবে আত্মহত্যা করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাতে অধর্ম হওয়ার কথা চিন্তা করে সেপথ ত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

করে বনের মধ্যে সংঘটিত দাবানলের আগুনে প্রাণত্যাগের নিমিত্তে ঝাঁপ দেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো যে, অগ্নি তাঁকে দগ্ধ না করে শীতল স্পর্শে আলিঙ্গন করে। অতঃপর পর্বতের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে প্রাণ বিসর্জনের প্রতিজ্ঞা করে পর্বতচূড়ায় উঠে মৃত্যুর পূর্বে একটু জপ করার পর লাফ দিতে প্রস্তুত হন। এমন সময় পাশে এক বিদ্যাধর দম্পতিকে দেখতে পান। বিদ্যাধরের নাম মেঘনাদ ও তাঁর স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। তাঁরা মলয় পর্বতে গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। এখানে তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিদ্যাধর অবিমারকের পরিচয় জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অবিমারক কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হতে না পেরে অলৌকিক বিদ্যার প্রভাবে তিনি নিজেই সমস্ত বিষয় জেনে নেন। এতে অবিমারকও প্রকৃত পরিচয় অস্বীকার না করে বিদ্যাধর কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। বিদ্যাধর অবিমারককে একটি অলৌকিক আংটি প্রদান করেন। আংটিটি ডানহাতে পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়, আর বাঁ হাতে পরলে পুনরায় দৃশ্য হওয়া যায়। অধিকন্তু অদৃশ্য হওয়ার সময় যে ব্যক্তি আংটি পরিহিত ব্যক্তিকে ছুঁয়ে থাকবে সেও অদৃশ্য হবে। আংটি প্রদানের পর প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাধর অবিমারককে পুনরায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর স্ত্রী সৌদামিনীকে নিয়ে চলে যান। এরপর অবিমারক কুন্তিভোজের রাজধানী বৈরন্ত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে ক্লান্ত হয়ে এক শিলাতলে বিশ্রাম নেন। সেখানে দৈবযোগে বিদূষক সন্তুষ্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। বিদূষকও অবিমারকের অনুসন্ধানেই বের হয়েছেন বলে জানান। অবিমারকও তাঁর লভ্য নতুন বস্তুর কথা জানান। অতঃপর উভয়েই কন্যাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

পঞ্চমাঙ্কে কামাসক্তা রাজকুমারী কুরঙ্গীকে দেখা যায় চিত্তবিনোদনের জন্য নলিনিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদের ছাদে বসে এক দৃষ্টিতে কালো মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। এদিকে অবিমারক বিদূষককে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে প্রবেশ করে কামাসক্তা কুরঙ্গীকে দেখতে পান। আর কুরঙ্গী স্নানের সামগ্রী নিয়ে মাগধিকাকে আসার জন্য নলিনিকাকে আদেশ করলে নলিনিকা কুরঙ্গীকে একা রেখে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এমন সময় রানি রাজকুমারীর শরীরের অবস্থা জানতে হরিণিকাকে পাঠালে নলিনিকা তখন যাওয়ার মনোভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কুরঙ্গী তাকে ডেকে আলিঙ্গন করে জীবনের শেষ কুশল বিনিময় করলে নলিনিকা প্রস্থান করেন। ইতোমধ্যে হরিণিকাকেও কুরঙ্গী নিজের কুশলবার্তা দিয়ে পাঠিয়ে দেন। তখন তিনি একদম একা। প্রাণত্যাগ করার বিরাট সুযোগ ঘটেছে তাঁর। তাই উত্তরীয় দিয়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চান তিনি। কিন্তু অকস্মাৎ মেঘের গর্জনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি চীৎকার করে উঠেন। আর তৎক্ষণাৎ অবিমারক বাঁ হাতে আংটি পরে অদৃশ্য থেকে দৃশ্য হয়ে প্রিয়তমা রাজকুমারী কুরঙ্গীকে আলিঙ্গন করেন। আর

Dhaka University Institutional Repository

রাজকুমারীও আনন্দের আতিশয্যে অভিভূত হওয়ায় তাঁর চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হয়। অতঃপর নলিনিকা ফিরে এসে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে ভয় পেয়ে যান। অবিমারকের নির্দেশে সন্তুষ্ট দরজা খুলে দিলে নলিনিকা অবিমারককে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। এরপর অবিমারক সন্তুষ্টের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। নলিনিকার সঙ্গে সন্তুষ্টের হাস্যকৌতুক জমে উঠলে অবিমারক সুকৌশলে তাদের সেই স্থান থেকে সরিয়ে দেন। ইতোমধ্যে বর্ষণ শুরু হলে অবিমারক প্রিয়তমা রাজকুমারী কুরঙ্গীকে নিয়ে অন্তঃপুরে গমন করেন এবং পুনরায় প্রেম-সম্ভোগে আবদ্ধ হন।

অবিমারক নাটকের শেষাঙ্ক তথা ষষ্ঠাঙ্কে দেখা যায়, কুন্তিভোজের অমাত্য ভূতিক কাশিরাজের রাজধানী থেকে কাশিরাজ-মহিষী ও তাঁর পুত্র জয়বর্মাকে সঙ্গে নিয়ে কন্যাপুরে বৈরন্ত্যনগরে প্রত্যাবর্তন করে বিয়ের জন্য উপযুক্ত দিন ও শুভ নক্ষত্রের কথা জানান। এদিকে সৌবীররাজের মন্ত্রীরা দূত পাঠিয়ে জানান যে, সৌবীররাজ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে গোপনে বৈরন্ত্যনগরেই বসবাস করছেন। উক্ত সংবাদ শুনে মহারাজ কুন্তিভোজ অমাত্য ভূতিককে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের অনুসন্ধানে বের হন। অবশেষে সৌবীররাজের সন্ধান পাওয়া গেলে তিনি রাজপ্রাসাদে এসে কুন্তিভোজের সঙ্গে আলিঙ্গন করে কুশলবিনিময় করেন। উল্লেখ্য যে, কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজ উভয়েই উভয়ের শ্যালক, আবার ভগ্নীপতিও। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও সৌবীররাজের মনে কোনো সুখ নেই। কেননা, গত একবছর যাবৎ তাঁর পুত্র সৌবীর রাজকুমারের কোনো খোঁজ নেই। তাই পুত্রশোক তাঁর মনকে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ হেন পরিস্থিতিকে দূর করার নিমিত্তে অমাত্য ভূতিক প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সৌবীররাজকে গোপনে চণ্ডাল-জীবনযাপন গ্রহণের কারণ জিজ্ঞেস করলে সৌবীররাজ অতিশয় রাগী ব্রহ্মর্ষি চণ্ডভার্গব কর্তৃক প্রদত্ত অভিশাপই এর কারণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, ঐ দিনই তিনি শাপমুক্ত হয়েছেন। অতঃপর মহারাজ কুন্তিভোজ সৌবীররাজপুত্র বিষ্ণুসেনের নাম অবিমারক হওয়ার কারণ জানতে চাইলে উত্তরে অমাত্য ভূতিক জানান যে, ধূমকেতু নামক এক অসুরকে বধ করায় বিষ্ণুসেনের নাম দেওয়া হয়েছে অবিমারক। সৌবীররাজ কুন্তিভোজের সুদক্ষ চরেদের মাধ্যমে তাঁর পুত্র অবিমারককে অনুসন্ধানের অনুরোধ জানালে অমাত্য ভূতিক বলেন যে, ইতোমধ্যে চরেরা অনুসন্ধান করেও কুমারের কোনো সন্ধান দিতে পারেনি। তিনি অনুমান করেন যে, কুমার হয়তো মায়ার মাধ্যমে নিজেকে গোপন করে রেখেছেন। এমন সময় সকল সংকটের মুক্তিদাতা এবং সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত দেবর্ষি নারদের আগমন ঘটে রাজপ্রাসাদে। কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজ উভয়েই দেবর্ষিকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। দেবর্ষির আদেশে ভূতিক কাশিরাজমহিষী সুদর্শনাকে আনয়ন করার পর সকলের সম্মুখে দেবর্ষি অবিমারক ও কুরঙ্গীর প্রেম ও পরিণয়ের কথা প্রকাশ করে দেন।

কুন্তিভোজ অগ্নিসাক্ষী করে কন্যার বিয়ে দিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলে দেবর্ষির অনুমতি নিয়ে ভূতিক বর ও বধূকে নিয়ে আসার জন্য প্রস্থান করেন। এ সময় দেবর্ষি সুদর্শনাকে একান্তে অবিমারকের জন্ম থেকে কন্যাপুরে অবস্থান করা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। ব্রহ্মর্ষির বর্ণনা থেকে সুদর্শনা (সৌবীররাজমহিষীর ভগ্নী) জানতে পারেন, অবিমারক প্রকৃতপক্ষে তারই গর্ভজাত অগ্নির সন্তান এবং ভগ্নী সৌবীররাজমহিষীর পুত্র প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলে তিনি তখন অগ্নিদেবের ঔরসজাত তাঁর প্রথম সন্তান ভগ্নীকে দান করেছিলেন। দেবর্ষির নির্দেশে কুরঙ্গীর কনিষ্ঠা ভগ্নী সুমিত্রার সঙ্গে কাশিরাজপুত্র জয়বর্মার বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর কুরঙ্গী ও অমাত্য ভূতিকের সঙ্গে বরবেশে অবিমারকের আগমন ঘটলে গুরুজনেরা সকলে তাঁকে অভিবাদন ও প্রাণভরা আশীর্বাদ করেন। এ সময় সকলের শুভকামনার প্রার্থনার মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপরিউক্ত বিষয়বস্তুকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্বে উল্লিখিত উপাখ্যানসমূহ অবিমারক নাটকের উৎস হলেও বেশ কিছু অমিল নাটকে পরিলক্ষিত হয়।যা নাট্যকার ভাস কর্তৃক সংযোজিত-বিয়োজিত তথা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। যেমন, অবিমারকের দুঃসাহসিক যাত্রা, রাত্রিকালীন নগরের মাধুর্যপূর্ণ সৌন্দর্যের বর্ণনা, চোরের ছদ্মবেশে অবিমারকের কন্যাপুরে গমন, শেষ অঙ্কে নারদের উপস্থিতি ইত্যাদি ঘটনা একেবারেই ভাসের মৌলিক সংযোজন। এছাড়াও বিদ্যাধর ও অলৌকিক আংটির অবতারণাও ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি। চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয় যে, *অবিমারক* নাটকের সন্তুষ্ট নামের বিদূষক চরিত্রটি ভাস কর্তৃক সংযোজিত—যা প্রাচীন উপাখ্যানে অদৃষ্ট। আর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে বিদূষক চরিত্রের উপস্থিতি অপরিহার্য। তাই *অবিমারক* নাটকে বিদূষক চরিত্রটি সংযোজন করে ভাস অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন করেন। *অবিমারক* নাটকের নায়কের প্রকৃত নাম বিষ্ণুসেন। কিশোর বয়সে অবিরূপধারী ধূমকেতু নামক এক অসুরকে বধ করায় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে অবিমারক। সুতরাং, নায়কের নামানুসারে নাটকের *অবিমারক* নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, সৌবীর রাজপুত্র অবিমারক ও কুন্তিভোজের কন্যা রাজকুমারী কুরঙ্গীর অনাবিল প্রেম ও পরিণয়ের কাহিনি আলোচ্য নাটকের মূলীভূত বিষয়। আর এ কাহিনি থেকে এটাই উপলব্ধি হয় যে, সত্যিকারের নিঃস্বার্থ প্রেম কখনো বৃথা হবার নয়। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা মানুষকে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ভালোবাসার মানুষের সান্নিধ্যলাভের জন্য সাহস জোগাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।যার প্রতিফলন অবিমারক নাটকের পরতে পরতে পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ***চারুদত্তম্* :** *চারুদত্তের* চরিত্রগুলোর মধ্যে নয়টি পুরুষচরিত্র এবং সাতটি নারীচরিত্র রয়েছে। পুরুষচরিত্রগুলো হলো :

সূত্রধার	–	রঙ্গাধ্যক্ষ
নায়ক	–	চারুদত্ত, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সার্থবাহ-পুত্র
বিদূষক	–	মৈত্রেয় নামে চারুদত্তের মিত্র বা প্রিয়বয়স্য
শকার	–	রাজশ্যালক সংস্থানক
বিট	–	পণ্ডিত, শকারের সহকারী
সংবাহক	–	জুয়াড়ি, চারুদত্তের অঙ্গসংবাহনের কর্মে লিপ্ত থাকা এক সময়ের সেবক
চেট	–	বর্ধমানবক নামে চারুদত্তের ভৃত্য
চেট	–	কর্ণপুর নামে বসন্তসেনার ভৃত্য
সজ্জলক	–	মদনিকার প্রেমিক

এবং নারীচরিত্রগুলো হলো :

নটী	–	সূত্রধার-পত্নী
গণিকা	–	নায়িকা বসন্তসেনা
ব্রাহ্মণী	–	চারুদত্তের পত্নী
রদনিকা	–	চারুদত্তের পরিচারিকা
মদনিকা	–	বসন্তসেনার প্রিয় পরিচারিকা
চেটী	–	চতুরিকা নামে বসন্তসেনার অন্য এক পরিচারিকা
বিচ্ছিত্তিকা	–	বসন্তসেনার আরেক অন্যতমা পরিচারিকা

এছাড়া অন্যদের সংলাপে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত নারীচরিত্রগুলো হলো :

আর্যা মা	–	বসন্তসেনার মাতা
পরভৃতিকা	–	বসন্তসেনার পরিচারিকা
শারিকা	–	বসন্তসেনার পরিচারিকা

চারুদত্তের প্রথম অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে যে, উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠিপল্লিতে বসবাসরত এক সময়ের বিত্তশালী চারুদত্ত দান-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এই দারিদ্র্যদশার সব সময়ের সাক্ষী তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধু মৈত্রেয়। এ হেন পরিস্থিতিতে চারুদত্ত ও উজ্জয়িনীর নগরনটী বসন্তসেনা প্রথম দর্শনেই একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন। একদা সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজপথে পরিজনদের হারিয়ে বসন্তসেনা কামাসক্ত রাজশ্যালক শকার ও তার সহকারী বিটের দ্বারা তাড়িত হয়ে নিজেকে রক্ষা করার নিমিত্তে চারুদত্তের বাড়ির দরজার পাশে আশ্রয় নেন। এদিকে চারুদত্তের অনুরোধে বিদূষক মৈত্রেয় পরিচারিকা রদনিকাকে নিয়ে চৌরাস্তায় মাতৃদেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদনের নিমিত্তে বাড়ি থেকে বের হন। বেরোনোর সময় দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিদূষকের হস্তে রক্ষিত প্রদীপটা দরজার আড়ালে দণ্ডায়মান বসন্তসেনা তাঁর শাড়ির আঁচলের হাওয়ায় নিভিয়ে দেন। অতঃপর মৈত্রেয় রদনিকাকে চৌরাস্তায় চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে প্রদীপটা জ্বালানোর জন্য বাড়ির ভিতর প্রবেশ করেন। এই সুযোগে বসন্তসেনাও খোলা দ্বার দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েন। ওদিকে শকার ও বিট বসন্তসেনাকে খুঁজেই চলেছে। ফলে বিট সম্মুখের বাড়ি থেকে কোনো এক নারীকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাকে বসন্তসেনা ভেবে ঐ নারী অর্থাৎ চারুদত্তের পরিচারিকা রদনিকাকে ধরে ফেলে। ভয়ে আরুষ্ঠ রদনিকা কম্পনরত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান। আর অন্ধকারে বিট কর্তৃক ভ্রান্ত নির্দেশনায় শকার রদনিকাকে বসন্তসেনা ভেবে জোর করে তাকে আকৃষ্ট করলে রদনিকা চেঁচিয়ে উঠে। রদনিকার আর্ত কণ্ঠস্বরেই শকারের বোধোদয় হয় যে, সে বসন্তসেনা নয়। ইত্যবসরে বিদূষক প্রদীপ নিয়ে এসে শকার কর্তৃক রদনিকার লাঞ্ছনার কথা জানতে পেরে শকারকে ভীষণভাবে আঘাত করেন। বিট বিদূষকের নিকট শকারের হয়ে তাদের অপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং চারুদত্তের নিকট তাঁর পরিচারিকার লাঞ্ছিত হওয়ার কথা না বলতে অনুরোধ করে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন। এ সময় শকারও বিদূষকের মাধ্যমে চারুদত্তের নিকট সংবাদ জানায় যে, বসন্তসেনা তাঁরই (চারুদত্তের) বাড়িতে প্রবেশ করেছেন এবং চারুদত্ত যেন ভোর হলেই বসন্তসেনাকে শকারের নিকট পাঠিয়ে দেন। তা না হলে তারা দুজনেই পরস্পরের চরমশত্রুতে পরিণত হবে। একথা বলে শকার বিটকে দেখতে না পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন। আর বিদূষক ও রদনিকা দুজন্ইে পণ করেন যে, তারা কেউই চারুদত্তকে এ অবস্থার কথা জানাবেন না। অতঃপর দেবতার কাজ শেষ করে উভয়েই গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।এদিকে গণিকা বসন্তসেনাকে পরিচারিকা রদনিকা মনে করে চারুদত্ত তাঁর গায়ের চাদরটা তাঁকে (বসন্তসেনাকে) ভিতরে নিয়ে যেতে বলেন। পুনঃপুনঃ বলা সত্ত্বেও ভিতরে না যাওয়ায় চারুদত্ত ভীষণ বিরক্ত হন। এতে বসন্তসেনাও খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। ঠিক তখনই সেখানে বিদূষক মৈত্রেয় ও রদনিকা হাজির হন। ফলে চারুদত্ত নিজের ভুল অনুধাবন করে অপরিচিত একজন মহিলাকে গায়ের চাদর রেখে আসার নির্দেশ দেওয়ায় অনুতপ্ত হন। বিদূষক শকারের বক্তব্য চারুদত্তকে জানালে

Dhaka University Institutional Repository

চারুদত্ত বসন্তসেনাকে চিনতে পেরে তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং নিজের অনুচিত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চান। এদিকে বসন্তসেনাও বিনা অনুমতিতে চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করায় ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দুর্বৃত্তদের ভয়ে বসন্তসেনা তাঁর অলংকারগুলো চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখেন এবং চারুদত্তের আদেশে বিদূষক চাঁদের আলোতে বসন্তসেনাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে যান।

দ্বিতীয় অঙ্কে বসন্তসেনা ও তাঁর প্রিয় পরিচারিকা মদনিকার কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায় যে, বসন্তসেনার আলাপ-আচরণ ও উদাসীনতা থেকে চারুদত্তের প্রতি তাঁর অনুরাগের বিষয় মদনিকার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে। মদনিকা আরো বুঝতে পারে যে, বসন্তসেনা পুনরায় চারুদত্তের দর্শন পাওয়ার মানসেই চারুদত্তের নিকট তাঁর গহনা গচ্ছিত রেখে আসেন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে হঠাৎ কোনো এক ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। বসন্তসেনার নিকট থেকে আশ্বাস পেয়ে আগন্তুক তাঁর প্রশ্নের জবাবে জানান যে, আগন্তুকের ভীত হওয়ার কারণ জুয়াড়ি মহাজন। তিনি আরো জানান যে, আগন্তুক একজন বিদেশি বণিক। পর্যটকদের নিকট উজ্জয়িনীর অধিবাসীদের প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে তিনি উজ্জয়িনীতে বেড়াতে আসেন। এখানে এসে তার এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়Iযিনি অসামান্য গুণাবলির অধিকারী। তাই তিনি তাঁরই অঙ্গসংবাহনের কাজ নেন। তবে এটা তার নেশা হলেও বর্তমানে এটাই তার পেশা হয়ে গেছে। বসন্তসেনা ও মদনিকার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সেই মহান লোকটি আর্য চারুদত্ত। সংবাহক জানান যে, অন্যের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে গিয়ে চারুদত্ত যখন সম্পদহীন হয়ে পড়েন, তখন তিনি এক এক করে পরিচারকদের পাওনা মিটিয়ে বিদায় করে দেন। সুতরাং, তিনিও তখন কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে সেখান থেকে বেড়িয়ে হয়ে যান জুয়াড়ি। অতঃপর জুয়া খেলতে গিয়ে একদা তিনি দশ সুবর্ণে পরাজিত হয় এবং ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে পালিয়ে বেড়ান। পথিমধ্যে গণিকালয়ের নিকটে উত্তমর্ণের সম্মুখে পড়ায় ভয়ে বসন্তসেনার গৃহে ঢুকে পড়েন। সংবাহক কর্তৃক তার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বসন্তসেনা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঋণমুক্ত করে তাকে প্রিয়জনদের নিকট ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু সংবাহক সে-দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেIএমন সংকল্পের কথা জানিয়ে সেখান থেকে চলে যান। কিছুক্ষণ পর আবেগে উদ্ভ্রান্ত বসন্তসেনার অন্য এক পরিচারক কর্ণপুর এসে তিনি কীভাবে রাজপথে মদস্রাবী উন্মত্ত হস্তীর আক্রমণ থেকে গৈরিকধারী জনৈক সন্ন্যাসীকে রক্ষা করেন সেই বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি বসন্তসেনাকে শোনান। তিনি আরো জানান যে, তার এই বীরত্বের জন্য শুধু একজন ব্যতীত আর কেউই তাকে বাহবা ছাড়া কোনো পারিতোষিক দেননি। আর ঐ একজনের দেবার মতো শুধু উত্তরীয়খানিই ছিল। তিনি সেটিই তাকে প্রদান করেন। কর্ণপুরের বাক্য শুনে বসন্তসেনা অনুমান করেন যে, এমন উদারচিত্তের লোক আর কেউ নয়I তিনি

নিশ্চয়ই চারুদত্ত। চারুদত্তের এমন মহান ও ঔদার্যপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে বসন্তসেনার অনুরাগ তাঁর প্রতি আরো বৃদ্ধি পায় এবং প্রাসাদ থেকে চারুদত্তকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তিনি প্রাণভরে দেখতে থাকেন।

তৃতীয়াঙ্কে চারুদত্ত ও বিদূষক মৈত্রেয় মাঝরাতে গানবাজনার আসর থেকে গৃহে ফিরে পা ধুয়ে যে যার শয্যায় শুয়ে পড়েন। এদিকে সেদিন অষ্টমী তিথির রাত হওয়ায় চেটী চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত স্বর্ণালংকার মৈত্রেয়ের নিকট রাখতে আসেন Í কেননা, অষ্টমী তিথির রাতে মৈত্রেয়েরই এটি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল। ফলে ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে গচ্ছিত দ্রব্য রাখতে হলো। অতঃপর তারা উভয়েই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই সুযোগে নিঝুমরাতে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে পড়ে সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশের বেকার যুবক সজ্জলক। তিনি বসন্তসেনার বিশিষ্ট পরিচারিকা তরুণী ক্রীতদাসী মদনিকার প্রেমে পড়ে মদনিকাকে ক্রীতদাস জীবন থেকে মুক্ত করার মুক্তিপণ জোগাড় করার নিমিত্তেই সিঁধ কাটার মতো দুঃসাহসিক অভিযান চালান। আর তাই তো সজ্জলকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় : ". . . কিং বা ন কারয়তি মন্মথঃ।"[২৮] অর্থাৎ, ভালোবাসার জন্য কিনা করা যায়। এমন সময় ঘুমের ঘোরে মৈত্রেয় সুবর্ণ-ভাণ্ডটা নিতে বললে সজ্জলক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মৈত্রেয়ের হাতে একটি পুরনো ছেঁড়া চাদরে মোড়া সোনার ভাণ্ড দেখতে পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ নিভেয়ে দেন। গভীর ঘুমে অচৈতন্য অবস্থাতেই মৈত্রেয় সুবর্ণ-ভাণ্ডটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন এবং গ্রহণ না করলে ব্রহ্মশাপের ভয় দেখান। শেষ পর্যন্ত সজ্জলক সুবর্ণ-ভাণ্ডটি গ্রহণ করে। আর মৈত্রেয়ও চারুদত্তকে গচ্ছিত স্বর্ণ ফিরিয়ে দিয়েছে ভেবে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে থাকেন। ভোর হওয়ার পূর্বেই সজ্জলক তার অভীষ্ট পূরণ করে সরে পড়েন। ভোর হওয়ার পর চেটীর চীৎকারে সবাই জানতে পারেন যে, বাড়িতে সিঁধ কেটে চোর ঢুকেছিল। মৈত্রেয় তখন তার ভুল বুঝতে পারেন। এ হেন সংকটময় পরিস্থিতিতে চারুদত্তের সহধর্মিণী ব্রাহ্মণীর উপস্থিত বুদ্ধি ও উদারতা চারুদত্তের সম্মান অক্ষুন্ন রাখে। ব্রাহ্মণী মৈত্রেয়ের মাধ্যমে ষষ্ঠীব্রতের উপবাসের দান হিসেবে তাঁর মুক্তাহার পাঠিয়ে দিলে যে বিশ্বাসের উপর ভর করে বসন্তসেনা চারুদত্তের নিকট অলংকার গচ্ছিত রাখেনÍ সেই অনাবিল বিশ্বাসের মূল্য দিতে গিয়েই চারুদত্ত তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তা গ্রহণ করেন।

চতুর্থাঙ্কে বসন্তসেনা কর্তৃক অঙ্কিত চারুদত্তের চিত্রফলকের সঙ্গে চারুদত্তের অবয়বের কতটা মিল সে সম্পর্কে চেটীর মনোভাব ব্যক্ত করার বিষয়ে বসন্তসেনা ও চেটীর কথোপকথন পরিলক্ষিত হয়। এদিকে বসন্তসেনার মাতৃদেবীর আদেশে এক পরিচারিকা জানায় যে, রাজশ্যালক সংস্থানক কর্তৃক প্রেরিত গহনা পরে সেজেগুজে খুব তাড়াতাড়ি বসন্তসেনাকে বেরোতে হবে। কেননা তাঁকে নিতে

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারদেশে গাড়ি অপেক্ষা করছে। একথা শুনে বসন্তসেনা প্রচণ্ড রেগে যান এবং মাকে বলে পাঠান যে, তিনি তখনই সাজবেন যখন চারুদত্তের নিকট অভিসারে যাবেন। ইত্যবসরে ভীতসন্ত্রস্ত সজ্জলক আসেন মদনিকার কাছে। তাই বসন্তসেনা মদনিকাকে চিত্রফলকটা শয়নকক্ষে রেখে আসতে বললে মদনিকা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করাতে বসন্তসেনার কৌতূহল হয়। তিনি লক্ষ করেন যে, মদনিকা তার এক অত্যন্ত কাছের কোনো এক পুরুষের সঙ্গে মধুর সংলাপে ব্যস্ত। বসন্তসেনা বুঝতে পারেন যে, এই যুবকই মদনিকাকে পণ দিয়ে ক্রয় করতে চান। তিনি আড়াল থেকে তাদের সকল কথাবার্তাই শুনতে পান। মদনিকা তার মুক্তির ব্যাপারে বসন্তসেনার বক্তব্যের কথা সজ্জলককে জানান। উত্তরে সজ্জলক তার আনীত গহনা মদনিকার মাধ্যমে বসন্তসেনাকে পরিধান করতে অনুরোধ করলে মদনিকা গহনাগুলো প্রথমে নিজে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গহনাগুলো মদনিকার নিকট খুব চেনা মনে হয়। আড়ালে অবস্থানরত বসন্তসেনারও তাঁর নিজের গহনার মতোই মনে হয় ঐ গহনাগুলোকে। অতঃপর মদনিকা সজ্জলককে প্রকৃত ঘটনা জানতে জোর করায় সে মদনিকাকে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলে মদনিকা তাকে এ সমস্ত গহনাই বসন্তসেনার বলে জানান। এ পরিস্থিতিতে সজ্জলক ভীষণ অস্বস্তি ও বিব্রত বোধ করেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মদনিকার নির্দেশ মতো সজ্জলক কামদেউলে মদনিকার মাধ্যমে বসন্তসেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অপেক্ষা করেন। এদিকে অন্য এক পরিচারিকা এসে বসন্তসেনাকে জানান যে, চারুদত্ত কর্তৃক প্রেরিত এক ব্রাহ্মণ তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়েছেন। বসন্তসেনা উক্ত ব্রাহ্মণের নিকট থেকে অবগত হন যে, চারুদত্ত জুয়া খেলে তাঁর গচ্ছিত গহনা খুইয়ে ফেলেছেন। তাই তারই মূল্য হিসেবে এই মুক্তাহার পাঠিয়েছেন। বসন্তসেনা অবাকবিস্ময়ে সে মুক্তাহার গ্রহণ করেন এবং অনুভব করেন যে, ভাগ্য চারুদত্তের নিকট থেকে ধনসম্পদ কেড়ে নিলেও আত্মসম্মানবোধ কেড়ে নিতে পারেনি। অতঃপর মদনিকা বসন্তসেনাকে জানান যে, চারুদত্তের নিকট থেকে একজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ব্যাপারটি খুবই কৌতূহলপূর্ণ মনে হলো বসন্তসেনার নিকট। তাঁরই নির্দেশে মদনিকা সজ্জলককে নিয়ে আসেন। সজ্জলক বসন্তসেনাকে জানান যে, চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত গহনা ফেরত দিতে তিনি এসেছেন। কারণ চারুদত্তের গৃহের ঘরগুলো গহনা রাখার জন্য যথেষ্ট নিরাপদ নয়; তাছাড়া বাড়িতে তেমন লোকজনও নেই। তাই তিনি তার মাধ্যমে গহনাগুলো ফেরত পাঠিয়েছেন। বসন্তসেনা যেন অনুগ্রহ করে সেগুলো গ্রহণ করেন। কিন্তু বসন্তসেনা সমস্তই বুঝতে পারেন এবং বলেন যে, আসলে গহনাগুলো চারুদত্তের গৃহ থেকে সিঁধ কেটে আনা হয়েছে। সজ্জলক অত্যন্ত অবাক হলেন। অতঃপর সজ্জলক তার কৃতকর্মের জন্য তিরস্কারের বদলে পেলেন পুরস্কার। কেননা, বসন্তসেনা নিজের গহনা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে মদনিকাকে মনের মতো করে সাজিয়ে দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত গাড়িতে বসিয়ে সজ্জলকের হাতে তাকে সঁপে দেন। এছাড়াও বসন্তসেনা সজ্জলককে বলেন : "গহ্নদু অয্যো (গৃহ্লাত্বার্যঃ)"।[২৯] অর্থাৎ, আর্য, আপনি একে গ্রহণ করুন। আর মদনিকাকে বলেন : "অয্যা খু সি দাণিং সংবুত্তা (আর্যা খল্বসীদানীং সংবৃত্তা)"।[৩০] অর্থাৎ, এখন থেকে আর্যা হলে তুমি। এরপর সজ্জলক মদনিকাকে নিয়ে নতুন জীবনের প্রত্যাশায় রওনা হন এবং অবাকবিস্ময়ে ভাবতে থাকেন যে, বসন্তসেনার ন্যায় এমন মহান মানুষের ঋণ কি তিনি কখনো শোধ করতে সক্ষম হবেন? এ সমস্ত ঘটনাই বসন্তসেনার নিকট স্বপ্নের মতো মনে হয়। তাই তো তিনি চেটী চতুরিকাকে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সব বলেন। সব শুনে চতুরিকার নিকটও নাটকের মতো লাগে। অবশেষে বসন্তসেনা মুক্তাহার পরে মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে চারুদত্তের নিকট যাবার উদ্দেশ্যে চেটীকে সঙ্গে নিয়ে অভিসারে বেরিয়ে পড়েন। এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, একটি অসম্পূর্ণ প্রেমের কাহিনি আলোচ্য নাটকের উপজীব্য বিষয়। নাট্যকার ভাস তাঁর অসামান্য নাট্যপ্রতিভা ও অতুলনীয় কল্পনাশক্তি দ্বারা মানবহৃদয়ের চিরকালীন প্রেমের কাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেন এবং অত্যন্ত ব্যতিক্রমভাবে সমাজের একেবারে নিচুস্তরের নগরনটীকে কেন্দ্রে রেখে ঘটনার ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছেন। আলোচ্য নাটকের নিচু-কুলোদ্ভব নায়িকাকে তিনি সর্বগুণে বিভূষিতা করে একজন মহান আদর্শ নারীচরিত্রে রূপ দান করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, নাট্যকার ভাস অভিজাত সম্প্রদায়ের নায়কের সঙ্গে এই নিচু-কুলোদ্ভব নায়িকার মিলন ঘটাতে সচেষ্ট হননি। হয়তো তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক প্রথাবিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিতে ভাস স্বয়ং রাজি ছিলেন না। ফলে নাটকের পরিণতি মিলনাত্মক না হয়ে বিয়োগান্তক রূপ ধারণ করেছে। আমরা তাই বিরহিণী বসন্তসেনার প্রতি সমবেদনা, দুঃখ ও একাত্মতা প্রকাশ করি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য নাট্যগ্রন্থে ভাস চিরাচরিত নাট্য বৈশিষ্ট্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। যেমন, চারুদত্তে কোনো মাঙ্গলিক শ্লোক, প্ররোচনা ও ভরতবাক্য নেই। এছাড়া স্থাপনাও সাদামাটা ধরনের। পরিশেষে বলা যায় যে, অর্থলোলুপ জননীর শত বাঁধাকে উপেক্ষা করে দুর্বৃত্ত ও কামাসক্ত রাজশ্যালক সংস্থানক, অর্থাৎ, শকারের লোলুপ দৃষ্টিকে অতিক্রম করে বারবণিতা ধনী বসন্তসেনা যে মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি এক অনাবিল নিঃস্বার্থ প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা যুগ যুগ ধরে বারবণিতাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারণের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

৪.৬ এ অধ্যায়ে আমরা ভাস বিরচিত বিভিন্ন নাটকের (রূপকের) বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আমরা এ আলোচনায় লক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

করেছি যে, ভাস পূর্বাশ্রিত কাহিনি অবলম্বনে যেমন নাটক রচনা করেছেন, আবার তেমনি নিজ কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েও সম্পূর্ণ নতুন কাহিনি অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই ভাস তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্ব কাহিনি অবলম্বনে রচিত যেমন, রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণকথা, ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি এবং পৌরাণিক কাহিনি-আশ্রিত নাটকে (রূপক) তিনি শুধুমাত্র কাহিনির পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে নিজ মনন ও মেধায় পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চরিত্র চিত্রায়ণে নতুন কিছু বিষয়ের সংযোজন-বিয়োজন করে এক নতুন ধারার ইতিহাস রচনা করেছেন—যা পাঠককে সহজভাবেই আকৃষ্ট করে এবং পাঠকের মনে চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। প্রাচীন মহাকাব্যের কাহিনিগুলো আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু ভাস এই কাহিনির ক্ষেত্রে নতুন উপাদান সংযোজন করে পুনরায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং নতুনত্বের স্বাদ প্রদান করেছেন। যেমন, রামায়ণের কৈকেয়ীর চরিত্রের দোষস্খালন করে তাঁর শ্লাঘ্যপদপ্রাপ্তির বিষয়টি সংযোজনে নাট্যকারের গভীর চিন্তার ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমন একটি উদ্যোগ যে গ্রহণ করা যায় এবং এই উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে প্রতিপাদ্য বিষয়কে আরো আকর্ষণীয়, পাঠযোগ্য ও পাঠকের মনে কৈকেয়ী সম্পর্কে এক নবচিন্তাধারার প্রবর্তন ভাসের মতো একজন চিন্তাশীল নাট্যকারের পক্ষেই সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। অনুরূপভাবে আমরা মহাভারত আশ্রিত *ঊরুভঙ্গম্*-এর দুর্যোধনের চরিত্রকে নবরূপে রূপায়ণের কথাও এখানে উল্লেখ করতে পারি। অধিকন্তু একথা বলা হয়তো অযৌক্তিক হবে না যে, পরবর্তীকালের নাট্যকার শূদ্রক, ভবভূতি এবং মহাকবি মাঘ বিরচিত (যথাক্রমে *মৃচ্ছকটিকম্* ও *উত্তররামচরিতম্* নাটক এবং *শিশুপালবধম্* মহাকাব্য) গ্রন্থে ভাসের *চারুদত্তম্* ও *দূতবাক্যম্*-এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় যা ভাসের সৃজনী প্রতিভারই পরিচয় বহন করে।

ভাস প্রতিভার আরেকটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে নাট্যতত্ত্বের প্রচলিত নিয়মবিরুদ্ধ বিয়োগান্তক নাটক রচনা (ঊরুভঙ্গম্)। এই নিয়মবিরুদ্ধের মধ্যে আরো লক্ষণীয় ভরতবাক্যবিহীন নাটক (দূতঘটোৎকচম্ ও চারুদত্তম্) এবং ভরতবাক্যের পরিবর্তে ঘটোৎকচের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রশান্ত নির্দেশের অবতারণা করে দৃশ্যকাব্যের সমাপ্তি ঘটান। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ একমাত্র ভাসের মতো প্রতিভাধর নাট্যকারের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই ব্যতিক্রমী নাটক রচনায় তাঁর চিন্তা, চেতনা, নাটকের উপস্থাপনা, চরিত্রচিত্র রূপায়ণ ইত্যাদিতে তিনি সফলতার পরিচয়ও দিয়েছেন। ভাসের নাটক (রূপক) বিশ্লেষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মহাভারতের চরিত্র অবলম্বন করে নিজ উদ্ভাবিত বিষয়বস্তু দিয়ে নাটক রচনা (মধ্যমব্যায়োগঃ)। এ প্রসঙ্গে ভাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নায়িকাবিহীন নাটক রচনা করা (বালচরিতম্)। সংস্কৃত

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ পদক্ষেপ তাঁর বহুমুখী প্রতিভারই পরিচয় বহন করে। মহাকবি ভাসের কাব্য প্রতিভার আরেকটি সুউজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাধারণ মানুষের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে এবং সাধারণ মানুষকে নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে নাটক (রূপক) রচনার এক দুর্লভ পদক্ষেপ (চারুদত্তম্)। একজন গণিকার প্রেমকাহিনি অবলম্বনে নাটকের আঙ্গিকে নাট্যগাথা রচনাও ভাসের অমর প্রতিভার আরেকটি অসামান্য উদাহরণ। কবি নিজ কল্পনায় যে সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, নায়ক চারুদত্তের যে চরিত্র রূপায়ণ করেছেন এবং বারবণিতা বসন্তসেনার যে ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নিঃস্বার্থ প্রেম অঙ্কন করেছেন তা যুগ যুগ ধরে পাঠক মনে অমর হয়ে থাকবে।

আমরা ভাসের উপর্যুক্ত নাটক (রূপক) এবং তার চরিত্র বিশ্লেষণে ভাসকে মানবজীবনের এক মহান রূপকার হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। ভাসের এই প্রতিভাদীপ্তি পরবর্তীকালের আরো অনেক নাট্যপ্রতিভাকে সমুজ্জ্বল করেছে। আর তাই সুদীর্ঘকাল পরেও ভাস আমাদের কাছে স্মরণীয়, বরণীয় এবং সর্বোপরি শ্রদ্ধা ও অনুকরণের পাত্র হিসেবে চিরস্থায়ী আসন লাভ করবে।

তথ্যনির্দেশ

১. ভাস, 'প্রতিমানাটকম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

৩. বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব। বালিনো মে মহাভাগ ভয়ার্ত্তস্যাভয়ং কুরু ॥
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ ভয়ং মে ন ভবেদ্ যথা। এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মবৎসলঃ ॥
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব। উপকারফলং মিত্রং বিদিতং মে মহাকপে ॥
বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্য্যাপহারিণম্। অমোঘাঃ সূর্যসঙ্কাশা মমেমে নিশিতাঃ শরাঃ ॥
তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে নিপতিষ্যন্তি বেগিতাঃ। কঙ্কপত্রপ্রতিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ ॥
রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্, ৫/২৩-২৭

অর্থাৎ, রাম, আমার সঙ্গে শত্রুতা করে বালি আমাকে বিতাড়িত করেছে। হে মহাভাগ, বালির কারণে আমি ভীতসন্ত্রস্ত। আপনিই পারেন আমার ভয় দূর করতে। আমার ভয় যাতে দূর হয়, আপনি সে ব্যবস্থাই করুন। এ কথার প্রেক্ষিতে তেজস্বী ধর্মবৎসল ও ধর্মজ্ঞ রাম হাসিমুখে সুগ্রীবকে বলেন যে, হে মহাবানর, আমি জানি যে, বন্ধু সবসময় উপকারের কথা স্মরণ রাখে। সূর্যের ন্যায় অব্যর্থ, কঙ্কপক্ষীর পক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত ও মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় আমার এই ধারালো বাণসমূহ দিয়ে আমি তোমার পত্নীর হরণকারী বালিকে বধ করব। আমার এই বাণগুলো প্রবলবেগে দুর্বৃত্ত বালিকে আঘাত করবে।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত *রামায়ণম্*, প্রথম খণ্ড, আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী (অনুবাদ, আলোচনা, সম্পাদনা), কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৬৮১

৪. ভাস, 'অভিষেকঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, কলিকাতা, অক্টোবর ১৯৮০, পৃ. ২২৯

৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬. ভাস, 'পঞ্চরাত্রম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪ এবং Professor Krishnagopal Goswami, *Bhāsa : Pañcarātram* (Critically Edited), Goswami Prakasani, Calcutta, 1977, p. 262

৭. ভাস, 'পঞ্চরাত্রম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, প্রাগুক্ত

৮. ভাস, 'দূতঘটোৎকচম্', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

১১. ভাস, 'উরুভঙ্গম্', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

১২. ভাস, 'উরুভঙ্গম্', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

১৩. মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস প্রণতি *মহাভারতম্*, ৫ খণ্ড, সভাপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৫০ ও ৪৫২

১৪. ভাস, 'উরুভঙ্গম্', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

১৫. ভাস, 'মধ্যমব্যায়োগঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৯৮১ পৃ. ১১০

১৬. ভাস, 'মধ্যমব্যায়োগঃ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১৭. ভাস, 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১৯. প্রাগুক্ত

২০. ভাস, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

২৩. ভাস, *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর (সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮১, পৃ. ১৯৫-১৯৬

২৪. ভাস, *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও অনুদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১১ সন, পৃ. ভূমিকা ২২

২৫. বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৪১০

২৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মালবিকা বিশ্বাস, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্ : নামকরণ প্রসঙ্গ পুনর্বিবেচনা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৬৯, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৪৮

২৭. ভাস, 'অবিমারকম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২, পৃ. ১০২

২৮. ভাস, 'চারুদত্তম্' *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৯৮১, পৃ. ১১০

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৩০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান

৫.১ আমরা দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ভাসের সময়কাল, পরিচয় এবং তাঁর নাট্যকর্মের একটি ধারাবাহিক রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এসব বিষয় আলোচনাকালে আমরা লক্ষ করেছি যে, সংস্কৃতসাহিত্যের বিশাল ক্যানভাসে ভাসের নাটকসমূহের বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বহুমুখী বিষয়বৈচিত্র্য, অতুলনীয় কলা-কৌশল এবং অপূর্ব শিল্পরীতিতে চরিত্রের উপস্থাপনা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ভাসের নাট্যসাহিত্যের যে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছি, তারই আলোকে বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ভাসের এই বিশাল নাট্যসাহিত্যের ক্যানভাসে নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একজন নারী শুধু নারীই নয়; একজন নারী কন্যা, বধূ ও মাতা। আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব কন্যা, বধূ ও মাতা হিসেবে পরিবারে এবং সমাজে, রাষ্ট্রে তথা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান। পাশাপাশি আমাদের এ আলোচনায় আমরা আরো দেখাতে চেষ্টা করব, শুধু একজন নারী হিসেবে নয়; নারীর স্ব-মর্যাদায় একজন মানুষ হিসেবেও তার প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ইতোপূর্বে বিভাজিত মহাকবি ভাসের রামায়ণ-আশ্রিত, মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত, ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত এবং পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত নাটকসমূহের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মুখ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরব।

৫.২ রামায়ণ-আশ্রিত নাটক :

ক. *প্রতিমানাটকম্* : আমরা দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ভাসের এই নাটকটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছি। প্রতিমানাটকের নারীচরিত্র এগারটি : নটী, সীতা, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, অবদাতিকা, চেটী, প্রতিহারী, বিজয়া, নন্দিনিকা ও তাপসী। এছাড়া অবদাতিকা ও চেটীর সংলাপের মধ্য দিয়ে আর্যারেবা ও আর্যবালা, রামচন্দ্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে মন্থরা এবং

প্রতিহারীর সংলাপের মধ্য দিয়ে সারসিকা ইত্যাদি নারীচরিত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আমরা এখন উক্ত নাটকের সমাজের বিভিন্ন স্তরের কয়েকটি নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরব :

সীতা : ভাসের প্রতিমানাটকের সীতা মহাকবি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণেরই সীতা। কিন্তু ভাস এ নাটকের সীতাকে তাঁর নিজস্ব উপস্থাপনা ও কলা-কৌশলে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে রামায়ণের সীতার অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করেছি। ভাসের প্রতিমানাটকের সীতার অবস্থা ও অবস্থান প্রায় অনুরূপ। সীতা এই নাটকের নায়িকা, রামচন্দ্রের সহধর্মিণী, অযোধ্যারাজ দশরথ ও রানি কৌশল্যার পুত্রবধূ এবং লক্ষ্মণ-ভরত প্রমুখের ভ্রাতৃজায়া। সীতা তৎকালীন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, এবং নারীজাতির সৌন্দর্যের প্রতীক।

ভাসের প্রতিমানাটকের সীতা ঔদার্য, মহত্ত্ব এবং বাৎসল্য প্রেমের অধিকারিণী, পতিপ্রেমী, দয়াবতী ও ক্ষমাশীলা। তৎকালীন সমাজের অভিজাত শ্রেণির নারীর এসব গুণের অধিকারিণী হওয়া ব্যতিক্রম কিছু নয়। তবে সীতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

স্বামীর আশু রাজ্যাভিষেকে বিঘ্ন সৃষ্টিকারিণী মাতৃতুল্যা শ্বশ্রূমাতা রানি কৈকেয়ীর প্রতি তাঁর কোনো বিরূপ মনোভাব নেই, নেই কোনো প্রতিশোধ স্পৃহা, নেই কোনো দুরভিসন্ধি। বরং আপন মাতৃশ্রদ্ধায় তিনি তাঁকে সাদরে ও সযত্নে গ্রহণ করেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বে পুত্রবধূর এরূপ আচরণ ও অবস্থান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। শুধু তাই নয়, এতে করে পারিবারিক ভারসাম্য এবং সমন্বয় বিধানে সীতার জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য মহান দৃষ্টান্তের উজ্জ্বল পথনির্দেশ হিসেবে চিরজাগরূক হয়ে থাকবে।

ভারতীয় সমাজে যৌথ পরিবার এবং যৌথ পরিবারে পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যপালন একটি সামাজিক ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। সীতা তাঁর জীবনের দুঃসময়েও তাঁর এই দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা ভোলেননি। একদিকে পতির নিঃসঙ্গ অবস্থায় বনবাস যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতার সেবা করা থেকে বঞ্চিতা হওয়া—এই দুই বিকল্পে যখন তাঁর চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত, তখন তিনি তার আপাত সমাধানে এসে পতির সঙ্গে বনবাসে গিয়ে পতিসেবা করেন এবং গুরুজনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যকে দেবতাদের হস্তে অর্পণ করেন। এতে যেমন তাঁর পতিসেবার দিকটি উন্মোচিত হয়,

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি তাঁর ধর্মের প্রতি অচলাভক্তির বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে তিনি দুকূলই রক্ষা করেন, যাতে তাঁর গভীর প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটে। রাম-সীতার কথোপকথনে উপর্যুক্ত বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

রামঃ – মৈথিলি! কিং ব্যবসিতম্?
সীতা – ণং সহধম্মআরিণা ক্খু অহং (ননু সহধর্মচারিণী খল্বহম্)।
রামঃ – ময়েকাকিনা কিল গন্তব্যম্।
সীতা – অদো ণু খু অণুগচ্ছামি (অতো নু খল্বনুগচ্ছামি)।
রামঃ – বনে খলু ব্যস্তব্যম্।
সীতা – তং খু মে পাসাদো (তৎ খলু মে প্রাসাদঃ)।
রামঃ – শ্বশ্রূশ্বশুর শুশ্রূষামপি চ তে নির্বতয়িতব্যা।
সীতা – ণং উদ্দিসিআ দেবদাণং পণামো করীঅদি (এনামুদ্দিশ্য দেবতানাং প্রণামঃ ক্রিয়তে)।

প্রতিমানাটকম্, ১ম অঙ্ক[১]

অর্থাৎ, "রাম – সীতা! তুমি কি ঠিক করলে?
সীতা – কেন আমি তো সহধর্মিণী।
রাম – আমাকে একাই যেতে হবে।
সীতা – এই জন্যেই তো আমি যাব।
রাম – বনে থাকতে হবে কিন্তু।
সীতা – সেই তো আমার প্রাসাদ।
রাম – শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাও তো তোমার করা উচিত!
সীতা – ও এজন্যে দেবতাদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করছি।"

ভ্রাতৃপ্রেম ও বাৎসল্য ভারতীয় পারিবারিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর সুগভীর স্নেহের সম্পর্ক। তাই বনবাস যাত্রাকালে রাম প্রথমে লক্ষ্মণকে সঙ্গী করতে না চাইলেও সীতার অনুরোধে তিনি রাজি হন। অনুরূপভাবে রাম-সীতাকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের বনে উপস্থিতি সীতার মনে কোনো ঈর্ষা বা দুঃখের সঞ্চার করেনি। বরং তিনি হৃষ্টচিত্তে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ভরতের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করেন।

পারিবারিক জীবনে সীতার এই ভূমিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর চারিত্রিক উদারতার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় দশরথের পুত্রশোকের অভিশাপের ঘটনা প্রকাশ করে রানি কৈকেয়ী যখন রাম-সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে যান তখন। সীতা সে সময় তাঁকে ভর্ৎসনা না করে বরং সশ্রদ্ধ চিত্তে অভিবাদন করেন। এখানেই সীতার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সীতা অযোধ্যার ভাবী রাজার সহধর্মিণী এবং রাজঅন্তঃপুরের মধ্যেই তাঁর বসবাস। তাই

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিকভাবেই রাজঅন্তঃপুরের পারিবারিক ঘটনা যেমন তাঁর অজানা নয়, তেমনি রাজা এবং রাজপ্রাসাদের বহু ঘটনা সম্পর্কেও তাঁর অনবগত থাকার কথা নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, স্বামীর রাজ্যাভিষেক চূড়ান্ত মুহূর্তে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে স্থগিত হওয়ার ঘটনায় অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করলেও এবং অনেকের কাছে তা রহস্যময় থাকলেও সীতা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তা গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, 'রাজপুরীতে কত-কীই না হয়ে থাকে।' রাজ্য পরিচালনার নানা ঘটনা প্রবাহের ক্ষেত্রে সীতার এই 'গূঢ় অর্থসূচক মন্তব্য' তাঁর প্রাসাদ-অভ্যন্তরে রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত থাকার বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে। পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে হয়ত তাঁরা (নারীরা) রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন না বা করতে দেওয়া হয় না; কিন্তু তাঁরা যে রাজনীতি সচেতন এবং সুযোগ পেলে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের উপর্যুক্ত মন্তব্যের সমর্থনে চেটীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন তুলে ধরা হলো :

চেটী – ভট্টিণি! পটহসদ্দো বিঅ (ভট্টিনি! পটহশব্দ ইব)।
সীতা – সো এব্ব (স এব)।
চেটী – এক্কপদে ওঘট্টিঅতুহ্নীও পটহসদ্দো সংবুত্তো (একপদে অবঘট্টিততূষ্ণীকঃ পটহশব্দঃ সংবৃত্তঃ)।
সীতা – কোণু খু উগ্‌ঘাদো অহিসেঅস্‌স (কোনু খলু উদ্ঘাতঃ অভিষেকস্য)।
চেটী – ভট্টিণি! এব্বং মএ সুদং––ভট্টিদারঅং অহিসিঞ্চঅ মহারাও বণং গমিস্‌দি ত্তি (ভট্টিনি! এবং ময়া শ্রুতং–ভর্তৃদারকম্‌-ভষিচ্য মহারাজো বনং গমিষ্যতীতি)।
সীতা – জই এব্বং ণ সো অহিসেওদঅং মুহোদঅং ণাম (যদ্যেবং ন তদভিষেকোদকং, মুখোদকং ণাম)।

প্রতিমানাটকম্, ১ম অঙ্ক[২]

অর্থাৎ, "চেটী –ভট্টিনী। পটহের ধ্বনি শুনলাম যেন?
সীতা – হ্যাঁ, তাই।
চেটী – পটহ যে একবার বেজে উঠেই থেমে গেল। ব্যাপার কী!
সীতা – অভিষেকের কোন একটা প্রতিবন্ধক কিছু ঘটল নাকি? রাজপুরীতে অবশ্য কত-কীই না হয়ে থাকে।
চেটী – ভট্টিনী! আমি শুনলাম কুমারের অভিষেকের পর মহারাজ বনে যাবেন।
সীতা – যদি তাই হয় তবে সে অভিষেকের জল নয়, ঐ জলই আমাদের অশ্রুভেজা মুখ ধোয়ার জল।"

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর জীবন এক দীর্ঘ ও জটিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ এক নারীর জীবনে করুণ পরিণতি। এখানে নারীর কোনো স্তরবিন্যাস নেই—তা সে অভিজাত শ্রেণিরই হোক, মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই হোক বা শ্রমজীবী শ্রেণিরই হোক। অথচ সমাজ-সংসারে নারীর ভূমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ ও স্থান ছিল। বাল্মীকি যেমন রানিকে সংসার ও পারিবারিক জীবনের বাইরে আনেননি; নাট্যকার

Dhaka University Institutional Repository

ভাসও তেমনি তাঁর কল্পনার জাদুশক্তি দ্বারা নারীর সেই সীমাবদ্ধ জীবন থেকে বের করে আনার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। রামায়ণের মূলকাহিনি থেকে তিনি কিছু কিছু জায়গায় সরে এসেছেন; কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তিনি তা করেননি বা করতে সাহস পাননি। তাই আমরা দেখি, রাজপুত্রবধূ কিংবা ভাবী রাজার রাজবধূ হওয়া সত্ত্বেও সীতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে কোনো ভূমিকা নেই। সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং পরাধীন থেকেই তাঁর জীবন পরিক্রমা আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে।

কৌশল্যা : ভাসের প্রতিমানাটকে রূপায়িত কৌশল্যার চরিত্র রামায়ণে চিত্রিত কৌশল্যার চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কৌশল্যা অযোধ্যারাজ দশরথের প্রধানা মহিষী, রামচন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা, সীতার শ্বশ্রূমাতা, রানি কৈকেয়ী ও সুমিত্রার সপত্নী এবং যুগপৎভাবে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিমাতা। পিতৃসত্যপালনে রামের বনবাস গমনের ফলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে যেমন কাতর হয়ে পড়েন, তেমনি অসুস্থও হয়ে পড়েন। স্বামীর এরূপ অবস্থায় প্রধানা মহিষী হিসেবে তিনি তাঁর যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন—স্বামীর সেবাযত্ন করেন, শোকে সান্ত্বনা দেন এবং সর্বদা পাশে থেকে তাঁকে সুস্থ করার সর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সবই স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর পতিপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাই আমরা বলতে পারি, কৌশল্যা একজন সার্থক স্ত্রীর ভূমিকা পালন করে পতিপ্রেমের আদর্শ হিসেবে আমাদের নিকট চিরজাগরূক হয়ে আছেন। অবশ্য ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে স্ত্রীজাতিকে এই শিক্ষাই দিয়ে আসছে। ফলে তাঁর পতিপ্রেম কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা নয়।

রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্রেরই সিংহাসনে আরোহণ করার প্রথা। কিন্তু পারিবারিক জটিলতায় কৌশল্যা-পুত্র রাম জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাজপদ থেকে বঞ্চিত হন। এতে মাতা হিসেবে কৌশল্যার মনোকষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং পারিবারিক শান্তির জন্য তিনি এ বিষয়টি উদার চিত্তে স্বীকার করে নেন। স্বামী দশরথ এতে তাঁর অন্য মহিষী কৈকেয়ীর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখালেও কৌশল্যা স্বামী রাজা দশরথের সেই বিরূপ মনোভাব দূর করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে স্বামীর মঙ্গলকামনা, সপত্নীদের মধ্যে কলহ এবং রাজ্য নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধ যেমন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মোকাবিলা করেন, তেমনি রাজ্যের প্রধানা মহিষী হিসেবে তাঁর মনের উদারতাও প্রকাশ করেন। এ সবের মধ্য দিয়ে কৌশল্যার যথার্থ মাতৃরূপের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। তিনি যে একই সঙ্গে রাজবধূ, রাজমাতা এবং প্রজাদের রক্ষক—এই দিকগুলোই তাঁর চরিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। ভাসের প্রতিমানাটকে উল্লিখিত কৌশল্যা-দশরথ সংলাপের মধ্য দিয়ে কৌশল্যা-চরিত্রের দু-একটি দিক তুলে ধরা হলো:

কৌশল্যা – (সরুদিতম্) অলং দাণি মহারাও অদিমত্তং সন্তপ্পিঅ পরবসং অত্তাণং কাদুং। ণং সা তে অ কুমারা মহারাঅস্‌স সমআবসাণে পেক্‌খিদব্বা ভবিস্‌সন্তি (অলমিদানীং মহারাজঃ অতিমাত্রং সন্তপ্য পরবশমাত্মানং কর্তুম্। ননু সা তৌ চ কুমারৌ মহারাজস্য সময়াবসানো প্রেক্ষিতব্যা ভবিষ্যন্তি)।

রাজা – কা ত্বং ভোঃ!

কৌশল্যা – অসিনিদ্ধপুত্তপ্পসবিণী খু অহং (অস্নিগ্ধপুত্রপ্রসবিনী খল্বহম্)।

রাজা – কিং কিং সর্বজনহৃদয়নয়নাভিরামস্য রামস্য জননী তমসি কৌলশ্যা?

কৌশল্যা – মহারাঅ! সা এব মন্দভাইণী খু অহং (মহারাজ! সৈব মন্দভাগিনী খল্বহম্)।

রাজা – কৌশল্যে! সারবতী খল্বসি। ত্বয়া হি খলু রামো গর্ভে ধৃতঃ।

প্রতিমানাটকম্, ২য় অঙ্ক[৩]

অর্থাৎ, "কৌশল্যা – (রোদন করতে করতে) মহারাজ! এত শোকাতুর হয়ে নিজেকে এমন করে পরবশ করো না। সত্যপালনের শেষে তাকে (বধূকে) আর কুমারদের তো আবার দেখতে পাবে।

রাজা – কে গো তুমি?

কৌশল্যা – আমি সেই স্নেহহীন পুত্রের প্রসবিনী।

রাজা – কী! কী! সর্বজনের হৃদয়-নয়নরঞ্জন রামের জননী কৌশল্যা তুমি?

কৌশল্যা – মহারাজ! আমিই সেই হতভাগিনী।

রাজা – কৌশল্যা! তুমিই সারবতী! তুমিই রামকে গর্ভে ধারণ করেছ।"

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বহুবিবাহযুক্ত সমাজব্যবস্থায় স্ত্রীদের মধ্যে পারিবারিক শান্তি এবং ভারসাম্য রক্ষার এক আদর্শ নারী হিসেবে কৌশল্যা তৎকালীন সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। নিজ পুত্রের রাজসিংহাসন থেকে বঞ্চিত হওয়া, পুত্রবধূসহ বনবাসে গমন এবং বনবাসে কষ্টকর জীবনযাপন ইত্যাদির পিছনে সপত্নী কৈকেয়ীর প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা জানা সত্ত্বেও কৌশল্যা অত্যন্ত শান্তচিত্তে এবং সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সপত্নী কৈকেয়ীর প্রতি আচরণ করেন যা অতীব ব্যতিক্রম। সপত্নী-পুত্র ভরতের নিজ মাতার প্রতি বিরূপ আচরণকে কৌশল্যা প্রশ্রয় তো দেনই নি; বরং ভরতকে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেন :

কৌশল্যা – জাদ! সব্বসমুদাআরমঙ্‌ঝত্থো কিং ণ বন্দসি মাদরং (জাত! সর্বসমুদাচারমধ্যস্থঃ কিং ন বন্দসে মাতরম্)।

Dhaka University Institutional Repository

ভরতঃ – মাতরমিতি। অম্ব! ত্বমেব মে মাতা। অম্ব! অভিবাদয়ে।

কৌশল্যা – ণহি ণহি। ইঅং দে জণণী (নহি নহি। ইয়ং তে জননী)।

প্রতিমানাটকম্, ৩য় অঙ্ক[৪]

এখানেও তাঁর সর্বজনীন মাতৃত্বের দিকটি উন্মোচিত হয়।

ভাসের প্রতিমানাটকের কৌশল্যার চরিত্র স্ত্রী হিসেবে, মাতা হিসেবে সার্থক ও অনুকরণীয়। তবে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, রামায়ণের কৌশল্যা এবং ভাসের প্রতিমানাটকের কৌশল্যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজমহিষী, রাজবধূ, রাজমাতা এবং বহুবিবাহ প্রথার সপত্নীর প্রতীকস্বরূপ। এই সমাজব্যবস্থায় পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই চাইবেন নারীরা বিশেষত প্রধানা রাজমহিষী রাষ্ট্র, সমাজ, সংসারের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবেন; বিরোধহীন সংসার প্রতিপালন করবেন এবং বিরোধপূর্ণ যেকোনো অবস্থায় শান্তি বজায় রাখার যথার্থ প্রচেষ্টা চালাবেন। কৌশল্যা ঠিক তাই করেছেন। তিনি স্থির, শান্ত, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনায় নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হলেও তা ত্যাগ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। এছাড়া স্বামীর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য তো রয়েই গেছে।

কৈকেয়ী : ভাস বিরচিত প্রতিমানাটকের কৈকেয়ীর চরিত্রটি মূল রামায়ণ থেকে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। চিরায়ত ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের প্রথাকে মেনে নিয়ে তিনি রাজা দশরথকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। দশরথের তিন রানির মধ্যে তিনি একজন প্রভাবশালিনী রানি এবং দশরথের ঔরসজাত ভরতের গর্ভধারিণী মাতা। একই সঙ্গে তিনি রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিমাতা। ভারতের আর অন্য দশজন নারীর মতোই কৈকেয়ী পতিব্রতা, পুত্র-স্নেহে অনুরক্তা হলেও তিনি সপত্নী-পুত্রের প্রতিও উদাসীন নন। বরং তাদেরও তিনি পুত্র-স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখেছেন। সপত্নীদের প্রতিও তাঁর কোনো বিরূপ মনোভাব এবং ঈর্ষা নেই। প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত না থাকলেও রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ মুহূর্তে কৈকেয়ীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। ভাস তাঁর নাটকে একটি বিশেষ পরিবেশে রামের বনবাসের পশ্চাৎ কাহিনিটি তুলে ধরে কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছাকে একটি যুক্তিসংগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ভাস তাই রাজা দশরথের পূর্ব অভিশাপ, অর্থাৎ, পুত্রশোক লাঘবের জন্য পুত্রের মৃত্যুর পরিবর্তে পুত্রের বনবাস গমনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এতে করে যেমন কৈকেয়ীর পতিপ্রেম, স্বামীর পুত্রশোকের দুঃখ লাঘবের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানা যায়, তেমনি সপত্নী-পুত্রের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার দিকটিও উন্মোচিত হয়। কৈকেয়ী অত্যন্ত সরল মন নিয়েই উদারচিত্তে স্বীকার করেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

রামের বনবাসের সময়কালটি মনের অস্থিরতায় তিনি চৌদ্দ দিনের পরিবর্তে চৌদ্দ বছর বলে ফেলায় অনুতপ্ত ও লজ্জিতা। তিনি আরো বলেন যে, রাজ্যলোভে, প্রতিহিংসা বা অন্যকোনো পার্থিব কারণে নয়, স্বামীকে অভিশপ্তজীবন (এই অভিশপ্তজীবনের ঘটনা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) থেকে মুক্ত করার প্রয়াসেই তিনি তিরস্কৃত ও ধিক্কৃত হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় এরূপ কাজে ব্রতী হয়েছেন :

কৈকেয়ী– জাদ! এদণ্ণিমিত্তং অবরাহে মং নিক্খিবিঅ পুত্তও রামো বণং পেসিদো, ণহু রজ্জ লোহেণ। অপরিহরণীও মহরিসিসাবো পুত্তবিপ্পবাসং বিণা ণ হোই। ... জাদ! চউদ্দস দিঅস ত্তি বত্তুকামাএ পয্যাউলহিঅআএ চউদ্দস বরিসাণি ত্তি উত্তং (জাত! এতন্নিমিত্তমপরাধে মাং নিক্ষিপ্য পুত্রকো রামো বনং প্রেষিতঃ, ন খলু, রাজ্যলোভেন। অপরিহরণীয়ো মহর্ষিশাপঃ পুত্রবিপ্রবাসং বিনা ন ভবতি। ... জাত! চতুর্দশ দিবসা ইতি বক্তুকাময়া পর্যাকুলহৃদয়য়া চতুর্দশ বর্ষাণীত্যুক্তম্)।

প্রতিমানাটকম্, ৬ষ্ঠ অঙ্ক[৫]

একজন রাজমহিষীর প্রকাশ্যে এরূপ স্বীকৃতি যেমন পুত্রের মনকে প্রভাবিত করে, তেমনি সত্যঘটনা উন্মোচনে তাঁর দৃঢ়চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস গবেষক ভি. বেঙ্কটাচলম্ বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন :

> এই চমকপ্রদ উদ্ঘাটন ভরতের পক্ষে এক অত্যন্ত সুখকর বিস্ময়স্বরূপ হয়েছিল। কৈকেয়ী শুধু যে দোষমুক্ত হলেন তাই না, মহিমার আসনে উন্নীত হলেন। এক আঁচড়ে ভাস তাঁকে নরকের গভীর তল থেকে স্বর্গের উর্ধ্ব স্তরে তুলে দিয়েছেন, যেন এক অলৌকিক ঘটনার বলে। এবার ভরত তাঁর পায়ে পড়লেন, তাঁর প্রতি তিনি যে অন্যায় নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ভাসের কৈকেয়ীর জীবনে এটি মহত্তম মুহূর্ত। সমগ্র বিশ্বের এবং নিজের পুত্রের চোখের সামনে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় দাঁড়ালেন। তিনি প্রবল আবেগে অভিভূত বোধ করলেন। মারাত্মক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মাতৃত্বের মহিমান্বিত বিজয়ের এ এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। তিনি ভরতকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "যে জননী পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না সেই তো নিষ্ঠুর।" ভাসের কৈকেয়ী জননীকুলে যথার্থই জননী।[৬]

মহামতি ভাস-কৃত প্রতিমানাটকে আমরা কৈকেয়ীকে প্রধানত বধূ এবং মাতা হিসেবেই জানতে পারি। কৈকেয়ী রাজপরিবার তথা অযোধ্যারাজ দশরথের অন্যতমা মহিষী। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় রাজমহিষীদের রাজকার্যে তথা রাজকার্যের সিদ্ধান্তে তেমন কোনো ভূমিকার কথা না জানা গেলেও কৈকেয়ীর ক্ষেত্রে এটি ছিল অনেকটাই ব্যতিক্রম। ভাস তাঁর নাটকে কৈকেয়ীর বিবাহবৃত্তান্ত উল্লেখ না করলেও মূল রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, অপরূপ রূপ-যৌবনের কারণে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিবাহিতজীবনে কৈকেয়ী অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বামীর সেবা-যত্ন করে স্ত্রীর যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। রাজা দশরথও স্ত্রীর রূপ-যৌবন

Dhaka University Institutional Repository

এবং আন্তরিকতায় মুগ্ধ ছিলেন। কৈকেয়ী শুধু একজন নারীই নন, সেই সঙ্গে একজন মানুষও বটে। সুতরাং, একজন মানুষ হিসেবে মানুষের যে কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, কৈকেয়ীও তার ব্যতিক্রম নন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজ পুত্রের প্রতি সহজাত দুর্বলতাবোধ করেন। একজন মাতা হিসেবে এই দুর্বলতা দোষের কিছু নয়। পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহ শাশ্বত এবং চিরন্তন। এদিক থেকে কৈকেয়ীকে আমরা একজন সার্থক মাতা হিসেবে অভিহিত করতে পারি। কিন্তু রাজশক্তির ঘূর্ণাবর্তে, সমাজ-সংসারের জটিলাবর্তে এবং সর্বোপরি ন্যায়-নীতির প্রশ্নে তাঁর এই পুত্রস্নেহ এক বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। মাতা হিসেবে একজন নারীর এই দ্বিধান্বিত অবস্থায় কী ভূমিকা পালন করা উচিত? সমাজ-সংসারই বা এরূপ সংকটাপন্ন অবস্থায় নারীর কাছে কী প্রত্যাশা করে? বাল্মীকির রামায়ণে যেমনি, ঠিক ভাসের প্রতিমানাটকেও তেমনি এরূপ দোদুল্যমনা নারীর মুক্তির উপায় হিসেবে একটি আপাত সমাধানের পথ উন্মোচন করে স্বামীর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য, অন্য কথায় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, বহুবিবাহ সমাজব্যবস্থায় সপত্নী এবং সপত্নী-পুত্রদের প্রতি সমান স্নেহ-ভালোবাসা, প্রজার মনোতুষ্টি, সর্বোপরি ন্যায়-নীতি-দণ্ডের ভারসাম্য রক্ষা—সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আদায় করে নেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে কৈকেয়ী একজন সার্থক মাতা, সার্থক বধূ এবং সপত্নীপুত্র রামকে বনবাসে পাঠানোর পরেও নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। রামায়ণের বাল্মীকি কিংবা প্রতিমানাটকের ভাস একই সমাজব্যবস্থার একই প্রতিনিধি। শুধু নাম এবং সময়ের প্রভেদ। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন নারীকে বিপরীতমুখী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, নীতি সবকিছুকে পক্ষে রেখে শুধু একজন নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত রাখার একটি সুকৌশল ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কৈকেয়ীকে রাজমাতার স্থানও দেওয়া হয়নি। জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা, তাঁর মান-মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি নীতিবাক্য দ্বারা তাঁর পাদুকা রাজসিংহাসনে রেখে রাজ্যশাসনও কৈকেয়ীর বঞ্চনার আর একটি দিক।

সুমিত্রা : সুমিত্রা ভারতীয় চিরায়ত অভিজাত সমাজের আর এক নারী। তিনিও সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথা মেনে নিয়ে রাজা দশরথকে স্বামী হিসেবে বরণ করেন। তিনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের গর্ভধারিণী এবং একই সঙ্গে সপত্নী পুত্রদের স্নেহময়ী মাতা। রাজমহিষী হিসেবে সুমিত্রা অন্য স্ত্রীদের মতোই পতিভক্তিপরায়ণা, পতিসেবায় নিবেদিতপ্রাণা। তিনি রাজ্য বিপর্যয়ের মুখে শোকাতুর স্বামীর পাশে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা, আশ্বাস ও সেবাযত্ন করে স্ত্রীর যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। সপত্নী কৈকেয়ীর মনোবাসনা পূরণের লক্ষ্যে পারিবারিক বিপর্যয়ের মুখেও তিনি কৈকেয়ীর প্রতি বিরূপ আচরণ করেননি। উপরন্তু নিজ মাতার প্রতি ভরতের বিরূপ আচরণকে সমর্থন না করে বরং ভরতকে

Dhaka University Institutional Repository

নিজ মাতার প্রতি যথাযথ আচরণ এবং মাতৃমর্যাদা প্রদানের নির্দেশ দেন। তিনি ছিলেন সপত্নী কৌশল্যার পরমস্নেহের এবং সুখ-দুঃখের সমব্যথী। পারিবারিক সকল ক্রিয়াকর্মে সর্বদাই তিনি তাঁর পাশে থাকতেন। তাই আমরা দেখতে পাই, বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে রূপায়িত সুমিত্রা এবং ভাস-রচিত প্রতিমানাটকের সুমিত্রা এক ও অভিন্ন। রামায়ণে চিত্রায়িত চরিত্রের মতোই সুমিত্রা রাজমহিষী, সপত্নীদের প্রতি সমব্যথী, সংবেদনশীল এবং আচার-আচরণে উদার মনের পরিচয় দানকারিণী এক মহীয়সী নারী। এছাড়াও নিজ-পুত্রদের প্রতি যে মাতৃস্নেহ, ঠিক একই রূপ মাতৃস্নেহই সপত্নী-পুত্রদের প্রতি তাঁর অন্তরে বিরাজমান। তৎকালীন সমাজের উচ্চস্তরের অভিজাত সম্প্রদায়ের এক সার্থক প্রতিনিধি সুমিত্রা।

রাজকার্য এবং রাজ্য উত্থান-পতনে মহিষী সুমিত্রার কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। তিনি একজন মাতা হিসেবে কৌশল্যার পাশে থেকে পারিবারিক শান্তি এবং রাজ্যের ভারসাম্যাবস্থা আনয়নে কৌশল্যার সহযোগী হিসেবে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন। সন্তানদের স্নেহ-ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি আচরণে কোনো বৈষম্য করেননি; বরং সপত্নী-পুত্র রামের বনবাস জীবন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য নিজ গর্ভজাত-পুত্র লক্ষ্মণকে রামের সহযাত্রী করতে দ্বিধান্বিত হননি। সুমিত্রার উপর্যুক্ত চরিত্রের কয়েকটি দিক প্রতিমানাটকের কয়েকটি সংলাপ থেকে তুলে ধরা হলো :

কৌশল্যা – মহারাঅ! বচ্ছলক্খণ-- (ইত্যর্ধোক্তে) (মহারাজ! বৎসলক্ষ্মণ –) ।

রাজা – (সহসোত্থায়) ক্বাসৌ ক্বাসৌ লক্ষ্মণঃ? ন দৃশ্যতে। ভোঃ কষ্টম্! (দেব্যৌ সসংভ্রমমুত্থায় রাজানমবলম্বেতে)

কৌশল্যা – মহারাঅ! বচ্ছলক্খণস্স জণণী সুমিত্তেত্তি বত্তুং মএ উবক্কন্দং (মহারাজ! বৎসলক্ষ্মণস্য জননী সুমিত্রেতি বক্তুং ময়োপক্রান্তম্)।

রাজা – অয়ি সুমিত্রে!
তবৈব পুত্রঃ সৎপুত্রো যেন নক্তন্দিবং বনে।
রামো রঘুকুলশ্রেষ্ঠশ্ছায়য়েবানুগম্যতে ॥৯॥

প্রতিমানাটকম্, ২য় অঙ্ক[৭]

অর্থাৎ, “কৌশল্যা – মহারাজ! বৎস লক্ষ্মণ —— (অর্ধেক উচ্চারণ করতেই)

রাজা – (হঠাৎ উঠে) কোথায় —— কোথায় সেই লক্ষ্মণ?
দেখছি না তো? উঃ কী করি।
(মহিষীরা সসম্ভ্রমে উঠে রাজাকে ধরলেন)

কৌশল্যা – মহারাজ! ‘ইনি বৎস লক্ষ্মণের জননী সুমিত্রা’ এই বলতে চেয়েছিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা – সুমিত্রা! তোমার পুত্রই সুপুত্র যে দিনরাত বনে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামকে ছায়ার মতো অনুগমন করছে।”

এছাড়া,

সুমন্ত্রঃ – ইয়ং তত্রভবতো লক্ষ্মণস্য জননী দেবী সুমিত্রা।

ভরতঃ – অম্ব! লক্ষ্মণেনাতিসন্ধিতোঽহমভিবাদয়ে।

সুমিত্রা – জাদ! জসোভাই হোহি। (জাত! যশোভাগী ভব)।

প্রতিমানাটকম্, ৩য় অঙ্ক[৮]

অর্থাৎ, “সুমন্ত্র – ইনি মাননীয় লক্ষ্মণের জননী দেবী সুমিত্রা।

ভরত – মা! লক্ষ্মণ দ্বারা বঞ্চিত আমি (জ্যেষ্ঠের অনুগমন সৌভাগ্যে) অভিবাদন করছি।

সুমিত্রা – বৎস! যশস্বী হও।”

আরো বলা যায়,

সুমিত্রা – পইদীও পরিচারআ সজ্জণাঅ পুত্তঅস্স মে বিজঅং বড়্ঢয়ন্তি (প্রকৃতয়ঃ পরিচারকাঃ সজ্জনাশ্চ পুত্রকস্য মে বিজয়ং বর্ধয়ন্তি)।

(নেপথ্যে)

ভো ভো জনস্থাননিবাসিনস্তপস্বিনঃ। শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ।

হত্বা রিপুপ্রভবমপ্রতিমং তমৌঘং
সূর্যোঽন্ধকারমিব শৌর্যময়ৈর্ময়ূখৈঃ।
সীত্যমবাপ্য সকলাশুভবর্জনীয়াং
রামো মহীং জয়তি সর্বজনাভিরামঃ ॥১০॥

প্রতিমানাটকম্, ৭ম অঙ্ক[৯]

অর্থাৎ, “সুমিত্রা – প্রজা, পরিচারক ও সজ্জনেরা আমার পুত্রের বিজয় ঘোষণা করছেন।

(নেপথ্যে) জনস্থানবাসী তপস্বিগণ! আপনারা শুনুন। সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা অন্ধকার বিনাশ করেন, সেইরকম শত্রু থেকে জাত ঘোর সংকটকে শৌর্যে বিধ্বস্ত করে সর্বশুভলক্ষণা সীতাকে উদ্ধার করে সকলের নয়নাভিরাম রাম পৃথিবী জয় করলেন।”

প্রচলিত বহুবিবাহব্যবস্থায় কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীর মতোই সুমিত্রাও আর এক নারী—যিনি তাঁদের মতোই এই সমাজব্যবস্থা মেনে নিয়ে রাজা দশরথকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেন। পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীরা হবেন পতিব্রতা, নিষ্ঠাবতী, স্নেহময়ী এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। সুমিত্রাও এসব গুণের অধিকারিণী, কোনো অবস্থাতেই ব্যতিক্রমী নন। পুরুষশাসিত সমাজে বংশানুক্রমিকভাবে বা

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার সূত্রে (by heredity) পুরুষরাই রাজসিংহাসনে আরোহণ করবেন—এই প্রথাটাই যেন ভারতের চিরায়ত প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা। তাই রাজা দশরথের মৃত্যুর পর তাঁর কোনো স্ত্রীকেই সিংহাসনে আরোহণ করতে দেখা যায়নি। পুত্ররা তথা পুরুষরাই তা সে যদি নাবালকও হয়; সেই সিংহাসনে বসবে। এ বিষয়টিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফল।

অবদাতিকা, বিজয়া, নন্দিনিকা : *প্রতিমানাটক* ভাসের রামায়ণ-আশ্রিত নাটক হলেও নাটকের পরিপূর্ণতা দানের জন্য তথা একটি সফল নাটক রচনার জন্য ভাস কবিকল্পনায় রামায়ণের চরিত্রের বাইরে বেশ কিছু অপ্রধান চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র হচ্ছে : অবদাতিকা, বিজয়া ও নন্দিনিকা। এছাড়াও তিনি 'চেটী', বিজয়া নাম্নী 'প্রতিহারী' এবং 'তাপসী' — এই তিনজন নারীচরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতিমানাটকে সীতার সখী হিসেবে অবদাতিকা, কৈকেয়ীর পরিচারিকা হিসেবে বিজয়া ও নন্দিনিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও পরিচারিকা হিসেবে চেটী, রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষিকা হিসেবে প্রতিহারী এবং অরণ্যাশ্রমে তপস্যারতা ও অরণ্যে সীতার পরিচর্যাকারিণী হিসেবে তাপসী নামক নারীচরিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, উক্ত নাটকে বিজয়া নামে দুটি নারীচরিত্র বিদ্যমান: একজন পরিচারিকা, অন্যজন প্রতিহারী। প্রতিমানাটকের এই চরিত্রগুলো একেবারেই নতুন এবং ভাসের কল্পিত সৃষ্টি।

ভাসের *প্রতিমানাটক* তৎকালীন শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় যেমন উচ্চস্তর ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জনগণ রয়েছেন, ঠিক তেমনি তাদের পরিচর্যা ও সেবাযত্নের জন্য নিম্নস্তরের তথা শ্রমজীবী শ্রেণির জনগণও রয়েছেন। এই শ্রেণিবিভক্তি শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রেই নয়, নারীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রতিমানাটকে তাই আমরা রাজমহিষীর পরিচারিকা হিসেবে বিজয়া ও নন্দিনিকাকে দেখতে পাই। এই স্তরের নারীরা পরিচারিকা হিসেবে কাজ করলেও রাজঅন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে তাদের এক ধরনের সখ্যতা গড়ে উঠত। যেমন, আমরা দেখতে পাই রাজবধূ সীতার সখী হিসেবে অবদাতিকাকে। রাজঅন্তঃপুরের অবরোধবাসিনী নারীদের সুখ-দুঃখের অংশীদারী ছিলেন এই স্তরের নারীরা। এই স্তরের নারীদের রাজঅন্তঃপুরের কার্যাবলিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না থাকলেও রাজঅন্তঃপুরের কার্যাবলিকে তাদের মূল্যায়ন করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, সমাজের এই ধরনের নিচুস্তরের শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতাবোধ আর দশজনের মতোই সমভাবে বিদ্যমান ছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, বিজয়া ও নন্দিনিকা পরিচারিকা

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া সত্ত্বেও রামচন্দ্রের সিংহাসনবঞ্চনার বিষয়টি সুনজরে দেখেননি এবং এর ফলে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা 'দেশশুদ্ধ লোকের সর্বনাশ', অর্থাৎ, প্রজাদের জীবনে কষ্টভোগ নেমে আসার বিষয়টিকেও তারা তাদের প্রতিপালনকারিণীর 'পাপকাজ' বলে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয়, অগোচরে বল্কল নিয়ে আসায় অবদাতিকার মনে যে অন্যায়বোধ জাগ্রত হয়, তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে অবদাতিকার নিম্নোক্ত সংলাপে :

অবদাতিকা – অহো অচ্চাহিদং। পরিহাসেণ বি ইমং বক্কলং উবণঅন্তীএ মম এত্তিঅং ভঅং আসী, কিং পুণ লোভেণ পরধণং হরন্তস্স (অহো অত্যাহিতম্। পরিহাসেনাপীমং বল্কলমুপনয়ন্ত্যা মমৈতাবদ্ ভয়মাসীৎ, কিং পুনর্লোভেন পরধনং হরতঃ)।

প্রতিমানাটকম্, ১ম অঙ্ক[১০]

অর্থাৎ, "অবদাতিকা — কি সর্বনাশ! পরিহাসচ্ছলে অন্যের বল্কল এনেও আমার এমন ভয় হচ্ছে, ভাবছি লোভে পড়ে যারা পরের ধন হরণ করে তাদের কী অবস্থা হয়?"

নাট্যকার ভাসের এক সাহসী পদক্ষেপ নারীকে দ্বাররক্ষিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ করা। সাধারণত তৎকালীন সমাজে পুরুষদেরই দ্বাররক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায়। কিন্তু ভাস তাঁর প্রতিমানাটকে নারীকে এই পেশায় নিয়োজিত করেন এবং তাদের বিশ্বস্ত হিসেবে প্রতিপন্ন করে সংবাদ আদান প্রদানের কাজটিও সুসম্পন্ন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ক্রমস্তর বিন্যস্ত সমাজে ভাস শ্রমজীবী পেশার ক্ষেত্রে নারীদের তেমন অবমূল্যায়ন করেননি; বরং তাদের মন, মনন, মেধা ও নৈতিকতার বিষয়টিকে সু-উচ্চে স্থান দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাজ্যের উত্থান-পতনে শ্রমজীবী মানুষও যে উদ্বিগ্ন হয়, সে বিষয়টিকেও ভাস গুরুত্ব দিয়েছেন।

নটী : সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো : প্রস্তাবনা বা স্থাপনা অংশে সূত্রধার নটী অথবা তাঁর সহযোগীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে নাট্যকাহিনির অবতারণা করেন এবং মঞ্চে নাটকীয় পাত্র-পাত্রী প্রবেশের ইঙ্গিত দেন। নাট্যকাহিনির অবতারণা এবং মঞ্চে পাত্র-পাত্রী প্রবেশের এটি একটি কৌশল। তাই নটী সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তবে এই চরিত্রটি নাট্যকাহিনির মূলচরিত্রের কোনো অংশ নয়; প্রস্তাবনা তথা স্থাপনা অংশে নটী সূত্রধারের সঙ্গে সংলাপে অবতীর্ণ হয়ে নাটকের সূচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভাস-রচিত রামায়ণ-আশ্রিত প্রতিমানাটকের নটী সূত্রধার-পত্নী এবং নাটক পরিচালনায় সূত্রধারের সহকারিণী। এই চরিত্রটিও নাট্যকাহিনির প্রয়োজনে ভাসের নিজস্ব উদ্ভাবন। ভাস তাঁর প্রতিমানাটকে নটীকে নিয়মানুযায়ী সূত্রধারের সঙ্গে প্রস্তাবনা তথা স্থাপনা অংশেই উপস্থাপন করেছেন। এ নাটকে সূত্রধার নটীকে স্নিগ্ধ-সুন্দর-মনোরম শরৎ ঋতুকে অবলম্বন করে সংগীত পরিবেশন করতে বললে নটী তাতে সম্মতি প্রকাশ করে গাইতে শুরু করেন। এ সময় সূত্রধার শরৎকালে প্রস্ফুটিত কাশফুলের ন্যায় শুভ্রবর্ণের হংসীগুলোর নদীতীরে বিচরণের গতির সঙ্গে রাজবাড়ির প্রতিহারীর চলনের গতির তুলনা করেন। অতঃপর সূত্রধার ও নটী উভয়েই প্রস্থান করেন এবং প্রতিহারীর অঙ্কে প্রবেশের মাধ্যমে নাটকের সূচনা হয়।

প্রতিমানাটকে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি নটী চরিত্রে নাট্যকার তার নান্দনিক দিকটি তুলে ধরেছেন। মানবজীবন শুধু যে বস্তুগত দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত নয়, তার জীবনধারায় নান্দনিক উপভোগ যে প্রয়োজন, তারই একটি দিক নটী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

মন্থরা : ভাসের প্রতিমানাটকের মন্থরা চরিত্রটি রামচন্দ্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হলেও সমগ্র নাটকের পরিণতি ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মূল রামায়ণে যেমন, তেমনি ভাসের নাটকেও মন্থরার স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকের চূড়ান্ত মুহূর্তে মহারাজ দশরথের নিকট গোপনে কানে কানে কথা বলার ঠিক পর মুহূর্তেই রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত নাটকে ভাস রামায়ণের মতো কৈকেয়ীর সঙ্গে তার কু-মন্ত্রণার বিষয়টি উল্লেখ না করলেও এথেকে বোঝা যায় যে, কৈকেয়ী-মন্থরার কু-মন্ত্রণার বিষয়টিই মন্থরা দশরথের নিকট ঐ কান-কথায় ব্যক্ত করেন। আমরা জানি, কৈকেয়ীর বিবাহের পরই কৈকেয়ীর সঙ্গে দাসী হিসেবে মন্থরার অযোধ্যায় আগমন এবং পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরেই কৈকেয়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে মন্থরা নানা কাজের মধ্য দিয়ে কৈকেয়ীর একজন শুভাকাঙ্ক্ষিণী এবং আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। তাই আমরা অযোধ্যার রাজপরিবারে এবং রাজকীয় কার্যে মন্থরার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করি—যা একজন শ্রমজীবী নারীর জীবনে এবং রাজকার্যে ব্যতিক্রমভাবে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

খ. *অভিষেকঃ* : সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অমর কাহিনিকার ভাসের রামায়ণ-আশ্রিত অন্য একটি নাটক *অভিষেক*। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আমরা দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এ নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছি। উক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতা অনুসরণে

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এখন উক্ত নাটকের নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরতে প্রয়াসী হব। *অভিষেক* নাটকে মূল নারীচরিত্র সীতা এবং তারা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন রাক্ষসী এবং রাবণের দূত শঙ্কুকর্ণের সংলাপের মধ্য দিয়ে রাবণ-মহিষী মন্দোদরী, রাবণের সংলাপের মধ্য দিয়ে হিমালয়-দুহিতা দেবী পার্বতী এবং রামচন্দ্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে মাতা কৈকেয়ী ইত্যাদি নারীচরিত্রের। আমরা মূলত সীতা এবং তারার চরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মহাকাব্য রামায়ণের সীতাহরণ পরবর্তী রামের সীতা উদ্ধারের কাহিনি, সীতা উদ্ধার, লঙ্কায় রামের অভিষেক এবং অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পূর্ব-কাহিনি *অভিষেক* নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়।

সীতা : *অভিষেক* নাটকেও সীতা রামায়ণের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। সীতা এই নাটকের নায়িকা, অযোধ্যারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের পত্নী এবং লক্ষ্মণের ভ্রাতৃবধূ।

প্রতিমানাটকের মতোই *অভিষেক* নাটকের সীতা স্বামীর প্রতি অনুরক্তা, পতিপ্রেমে বিশ্বস্ত, পতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব এবং পতিসঙ্গলাভে বিরহিণী। এখানে সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় আনা হয়েছে এবং সর্বদা রাক্ষসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। সীতার মন জয় করার জন্য রাবণ একাধারে যেমন তাঁর সৌন্দর্যের প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেছেন, তেমনি প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যে তাঁকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা প্রলোভনও দেখিয়েছেন। কিন্তু সীতার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা ও নিবেদিতপ্রাণা হওয়ার কারণে সীতা স্বধর্মচ্যুত হননি। অবশেষে রাক্ষসরাজ রাবণ রামের কল্পিত মৃত্যুকাহিনি শুনিয়েও তাঁর মন দুর্বল করতে পারেননি। বরং সীতা দৃঢ় মনোবল নিয়ে রাবণের স্তুতিবাক্য উপেক্ষা করে স্বামী রামচন্দ্রের প্রতি দৃঢ় আস্থাপোষণ করেছেন।

একজন নারী হিসেবে সীতা এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন, একজন নারী শুধু পুরুষের কামনার বস্তু হতে পারেন না। একজন নারীর কাছে সমাজ-সংসার ও স্বামীর স্থান অনেক উপরে। রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধ, লঙ্কাজয় এবং সীতা উদ্ধারের পর তাঁর অগ্নিপরীক্ষার বিষয়টিকে সীতা নির্দ্বিধায় এবং চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। শুধু দৈহিকভাবে নয়, মনের পবিত্রতা এবং নিজের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকার কারণেই সীতার মনে কোনো দোদুল্যতা এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। তিনি স্বেচ্ছায় অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হন—এই বিশ্বাসে যে, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতার স্পর্শ নেই। তাই স্বয়ং অগ্নিদেব তাঁকে রক্ষা করবেন এবং রক্ষা করেছিলেনও। সীতার পতিপ্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তা নিম্নলিখিত সংলাপ দুটির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

সীতা – হদ্ধি অদি ধীরা খুম্‌হি মন্দভাআ। জা অয্যউত্তবিরহিদা রক্‌সরাঅভবনং আণীদা অণিট্‌ঠাণি অণরিহাণি জহমণোরহপ্পবুত্তাণি বঅণাণি সাবিঅমাণা জীবামি মন্দভাআ। আদু অয্যউত্তসাঅঅপ্‌চ্চএণ কহং বি অত্তাণং পয্যবঝাবেমি। কিং ণু খু অজ্জ পজ্জালিঅমাণে কম্মআরগ্‌গিমণ্ডলে উদঅপ্সেও বিঅ কিঞ্চি হিঅঅপ্পসাদো সমুপ্পণ্ণো। কিং ণু খু মং অন্তরেণ পসণ্ণহিঅও অয্যউত্তো ভবে (হা ধিগ্‌ অতিধীরা খল্বস্মি মন্দভাগা। আর্যপুত্রবিরহিতা রাক্ষসরাজভবনমানীতানিষ্টান্যনর্হাণি যথামনোরথ-প্রবৃত্তানি বচনানি শ্রাব্যমাণা জীবামি মন্দভাগা। অথবা আর্যপুত্রসায়কপ্রত্যয়েন কথমপ্যাত্মানং পর্যবস্থাপয়ামি। কিন্নু খল্বদ্য প্রজ্বাল্যমানে কর্মকারাগ্নিমণ্ডলে উদকপ্রসেক ইব কিঞ্চিদ্‌ হৃদয়প্রসাদঃ সমুৎপন্নঃ। কিন্নু খলু মামন্তরেণ প্রসন্নহৃদয় আর্যপুত্রো ভবেৎ)।

অভিষেকঃ, ২য় অঙ্ক[১১]

অর্থাৎ, "সীতা – হায়, হতভাগিনী আমি অত্যন্ত ধীরস্বভাবা হয়ে পড়েছি! আর্যপুত্র রামের বিরহভোগ করছি আমি! আমাকে রক্ষোরাজের প্রাসাদে নিয়ে এসে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও অনুচিত কথাবার্তা শোনানো হচ্ছে—তবুও, পোড়াকপাল আমার, আমি বেঁচে আছি। অথবা প্রাণটা আর্যপুত্র রামের — একথাটা মনে করে নিজেকে আশ্বস্ত করছি। কিন্তু আজ যেন কর্মকারের জ্বলন্ত আগুনের হাপরে জলের ছিটের মতো কিছুটা মনের শান্তি হচ্ছে! কি জানি, আমাকে ছাড়া আর্যপুত্র রামের মনে খুশি আছে কিনা!"

হনূমান্‌ – ... এষা কনকমালেব জ্বলনাদ্‌ বর্ধিতপ্রভা।
পাবনা পাবকং প্রাপ্য নির্বিকারমুপাগতা ॥২৫॥

অভিষেকঃ, ৬ষ্ঠ অঙ্ক[১২]

অর্থাৎ, "হনুমান্‌ – ইনি (সীতা) স্বর্ণমালার মতো আগুনে পুড়ে আরো যেন ঝলমলে হয়ে উঠেছেন। এমনিতেই তিনি পবিত্র, পাবক অগ্নিকে পেয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে আছেন।"

সীতা ভাসের *অভিষেক* নাটকের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র। ভাস রামায়ণের অনুকরণে সীতার চরিত্র অঙ্কন করেছেন। সীতা রূপে-গুণে, চারিত্রিক মাধুর্যে, স্বামী সেবায় এবং সর্বোপরি সমাজ-সংসারে অতুলনীয়া। একজন রাজপুত্রবধূ অথচ একজন আদর্শ রাজার স্ত্রী হিসেবে তাই হওয়া উচিত। কারণ পুরুষশাসিত সমাজে রাজপুত্রবধূর এর ব্যতিক্রম হওয়াটা যেমন সামাজিক আচার বহির্ভূত, তেমনি নীতিবিগর্হিত। ফলে সীতাকেই অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় এবং সীতাও স্বেচ্ছায় প্রজামনোরঞ্জনের নামে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হন।

Dhaka University Institutional Repository

তারা : ভাসের *অভিষেক* নাটকের তারা চরিত্রটি রামায়ণের চরিত্রেরই অনুরূপ। রামায়ণে যেমন ভাসের নাটকেও তেমনি তারা বানরী-চরিত্র হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। সীতা উদ্ধারে রাম অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় বানরদেরও সাহায্য নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গেই বানর-প্রধান বালীর পত্নী হিসেবে তারা চরিত্রের অবতারণা। এই নাটকেও তারা একাধারে বালী-পত্নী, কনিষ্ঠভ্রাতা সুগ্রীবের পত্নী এবং বালীর ঔরসজাত পুত্র অঙ্গদের মাতা।

ভাস তাঁর নাটকে কাহিনির ধারাবাহিকতা রক্ষার নিমিত্তে খুব স্বল্প সময়ের জন্য তারা চরিত্রের সংযোজন করেন এবং দু-একটি সংলাপের মধ্য দিয়েই তাঁর চারিত্রিক দিক তুলে ধরেন। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন তাঁর বুদ্ধিমত্তা, অন্যদিকে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কনিষ্ঠভ্রাতা সুগ্রীবের সঙ্গে স্বামীর যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করেননি; বরং নিরুৎসাহিতই করেছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই যুদ্ধের অন্তরালে একটি প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। আর এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তার বিষয়টি উন্মোচিত হয় বালীর মৃত্যুসময়ে রাম-বালীর সংলাপের মধ্য দিয়ে :

বালী – (মোহমুপগম্য পুনঃ সমাশ্বস্য শরে নামাক্ষরাণি বাচয়িত্বা রামমুদ্দিশ্য)

যুক্তং ভো! নরপতিধর্মমাস্থিতেন
যুদ্ধে মাং ছলয়িতুমক্রমেণ রাম!
বীরেণ ব্যপগতধর্মসংশয়েন
লোকানাং ছলমপনেতুমুদ্যতেন ॥১৭॥

হন্ত ভোঃ।

ভবতা সৌম্যরূপেণ যশসো ভাজনেন চ।
ছলেন মাং প্রহরতা প্ররূঢ়মযশঃ কৃতম্ ॥১৮॥

ভো রাঘব! চীরবল্কলধারিণা বেষবিপর্যস্তচিত্তেন মম ভ্রাতা সহ যুদ্ধব্যগ্রস্যাধর্ম্যঃ খলু প্রচ্ছন্নো বধঃ।

রামঃ – কথমধর্ম্যঃ খলু প্রচ্ছন্নো বধ ইতি?

বালী – কঃ সংশয়ঃ ?

রামঃ – ন খল্বেতৎ। পশ্য,
বাগুরাচ্ছন্নমাশ্রিত্য মৃগাণামিষ্যতে বধঃ।
বধ্যত্বাচ্চ মৃগত্বাচ্চ ভবাঞ্ছন্নেন দণ্ডিতঃ ॥১৯॥

বালী – দণ্ড্য ইতি মাং ভবান্ মন্যতে।

রামঃ – কঃ সংশয়ঃ?

বালী – কেন কারণেন?

রামঃ – অগম্যাগমনেন?

বালী – অগম্যাগমনেনেতি। এষোঽস্মাকং ধর্মঃ!

রামঃ – ননু যুক্তং ভোঃ!
ভবতা বানরেন্দ্রেণ ধর্মাধর্মৌ বিজানতা।
আত্মানং মৃগমুদ্দিশ্য ভ্রাতৃদারাভিমর্শনম্ ॥২০॥

অভিষেকঃ, ১ম অঙ্ক[১৩]

অর্থাৎ, "বালী – (অজ্ঞান হয়ে, পরে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে, রামের নামের অক্ষরসমূহ উচ্চারণ করে রামকে উদ্দেশ করে) হে রাম! আপনি রাজধর্মকে আশ্রয় করে রয়েছেন, আপনি সেই বীর, যিনি ভুবনসমূহের ছলনাকে দূর করতে উদ্যত—আপনিও ধর্মের পথ ত্যাগ করে যুদ্ধে আমাকে সরাসরি ছলনা করেছেন, এ তো খুবই যুক্তিযুক্ত! ॥১৭॥

হায় কি কাণ্ড!

আপনি সৌম্যদর্শন এবং যশস্বী; ছলনা আশ্রয় করে আমাকে প্রহার করায় আপনার প্রচুর অখ্যাতি জন্মেছে। ॥১৮॥

হে রাঘব! আপনি চীর ও বল্কল ধারণ করেছেন; বেশ-বৈপরীত্যের ফলে আমার ভাই সুগ্রীবের মন বিপর্যস্ত ছিল। (সেই অবস্থায়) তার সঙ্গে আমি যখন যুদ্ধরত—তখন আমাকে যে গোপনে বধ করা হলো, সেটা অধর্মের কাজ হয়েছে!

রাম – লুকিয়ে বধ করাটা এখানে অধর্মের কাজ কি করে হলো?

বালী – সন্দেহ কি?

রাম – না, কখনই নয়। দেখ –

ফাঁদ পেতে পশুদের বধ করা হয়ে থাকে। তুমি বধ্য পশু হওয়ার জন্য লুকিয়ে থেকে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি। ॥১৯॥

বালী – আপনি আমাকে দণ্ডের যোগ্য মনে করেন?

রাম – এতে আর সন্দেহ কি?

বালী – কি কারণে?

রাম – অগম্যা রমণীর সঙ্গে সম্বন্ধের কারণে।

বালী – অগম্যাকে স্পর্শ করা (আবার কি)? এ আমাদের ধর্ম!

রাম – বাঃ, বেশ (বলেছ) তো! ওহে – তুমি বানরপ্রধান, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম জেনেও নিজে (একেবারে) পশু হয়ে ভাইয়ের স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করেছ। ॥২০॥"

রাজশক্তি এমন—যার কাছে অন্যসব কিছুই তুচ্ছ। তারার ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনেও এই রাজশক্তি কাজ করেছে। ফলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে ভগবান রামচন্দ্র শুধু 'শ্লীলতাহানি'র বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রাম-বালীর সংলাপের অগ্রগতিতে রামচন্দ্র অন্য

বিষয়গুলোকে এড়িয়ে গেছেন। ফলে তার বৈধব্য ছিল অনিবার্য, অন্যকথায় তার বৈধব্য এক ধরনের অন্যায় ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি। এখানে তারার প্রতিবাদ অর্থহীন। উল্লেখ্য যে, তৎকালে মানবসমাজের মতো বানরসমাজেও সামাজিক স্তরভেদ এবং শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিষয়টি তথা ন্যায়-নীতির বিষয়টি বিদ্যমান ছিল। ফলে নারীর অবদমন যে বানর সমাজেও ছিল—তাই ভাস তাঁর নাটকে উপস্থাপন করেছেন।

ভাস তাঁর *অভিষেক* নাটকে পরোক্ষভাবে অনেক রাক্ষসীর কথা উল্লেখ করলেও 'বিজয়া' নাম্নী এক রাক্ষসীর কথা প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। ভাস তাঁর নাটকে এই রাক্ষসীকে 'প্রতিহারী' অর্থাৎ, দ্বাররক্ষিকার ভূমিকায় উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়টি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় এই কারণে যে, রাক্ষস সমাজে নারীরা পারিবারিক কাজের পাশাপাশি দ্বাররক্ষিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত থেকে রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমরা বলতে পারি, বিজয়া তৎকালীন রাক্ষস সমাজের এক ব্যতিক্রমধর্মী নারীচরিত্র।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অমর কাহিনিকার মহাকবি ভাসের রামায়ণ-আশ্রিত *প্রতিমানাটক* ও *অভিষেক* নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দুটি সার্থক নাটক। মহাকাব্য রামায়ণের অধিকাংশ কাহিনি অবলম্বন করে নাটক দুটি রচিত হলেও এতে কবি কল্পনার সৃষ্ট অন্যান্য চরিত্রও স্থান পেয়েছে। আমরা এই নাটক দুটির শুধুমাত্র নারীচরিত্রের বিষয়টি তুলে ধরে তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অবস্থানসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান তেমন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ছিল না। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীরা অবহেলিত ছিলেন। তাদের স্বাধীন মতামতের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করেই তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ হতো। ঘটনাক্রমে হয়তো কোনো নারী পারিবারিক কর্মকাণ্ডের বাইরে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনো পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পরতেন।

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনিকে বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র মানবসমাজকেই বেছে নেননি, মানবসমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত প্রকৃতি, পরিবেশ, পশুপাখি, বানর, রাক্ষস ইত্যাদি প্রজাতিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, মানবসমাজের সঙ্গে রাক্ষস ও বানর সমাজের যে একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের ক্রিয়াকর্মে প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করত—তারও উল্লেখ করেছেন। মহাকবি ভাস রামায়ণের এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করেননি এবং তাঁর নাটক দুটিতেও তাদের ভূমিকা তুলে ধরেছেন।

৫.৩ মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটক :

ক. *দূতবাক্যম্* : আমরা ইতোপূর্বে মহাকবি ভাসের রামায়ণ-আশ্রিত *প্রতিমা* ও *অভিষেক* নাটকের বিভিন্ন স্তরের কয়েকটি নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করেছি। এই আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা এখন মহাকবি ভাসের মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটকসমূহের সমাজের বিভিন্ন স্তরের কয়েকটি নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করব। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভাস তাঁর মহাভারত-আশ্রিত *দূতবাক্যম্*, *কর্ণভারম্* এবং *পঞ্চরাত্রম্* নাটক তিনটিতে কোনো নারীচরিত্রের অবতারণা করেননি। তবে উক্ত নাটক তিনটিতেই অন্যান্যের সংলাপের মাধ্যমে বেশকিছু নারীচরিত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, *দূতবাক্য* নাটকে দুর্যোধন ও বাসুদেবের সংলাপের মাধ্যমে দ্রৌপদী সম্পর্কে বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষ করে দুর্যোধনের সংলাপের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার চিত্রকর্মটি উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্রৌপদী : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, দ্রৌপদী আলোচ্য নাটকের কোনো বাস্তব বা প্রত্যক্ষ চরিত্র নয়; সংলাপের মাধ্যমে উল্লিখিত চরিত্র। মহাভারতে যেমন, ভাসের নাটকেও তেমনি দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

দূতবাক্য নাটকের কাহিনি-সংক্ষেপ আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, কুরু-পাণ্ডবের সিংহাসন নিয়ে বিবাদের ঘটনার পরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণ দূতের ভূমিকায় শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে কৌরব সভায় প্রবেশ করলে কৌরব প্রধান দুর্যোধন তাঁকে অপমানিত করার নিমিত্তে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার চিত্রকর্মটি প্রদর্শনের জন্য উপস্থাপন করেন। এই চিত্র প্রদর্শনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা এ কথাটি বলতে পারি যে, একজনকে অপমানের জন্য নানা পথ উন্মুক্ত থাকলেও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা এবং একই সঙ্গে একজন নারীর অসহায়ত্বের সুযোগে তাকে প্রকাশ্যে অবমাননা ও লাঞ্ছিত করার চিত্রকর্মটি ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের এ এক নিষ্ঠুর উদাহরণ। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর এই লাঞ্ছনা ও অবমাননার জন্য উন্মুক্ত সভায় কেউ, এমনকি তাঁর পঞ্চস্বামী পর্যন্ত সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেননি। প্রকাশ্য সভায় একজন নারীর বস্ত্রহরণ কতখানি অবমাননাকর ও লজ্জার তা কোনো পুরুষের পক্ষে না হোক, একজন নারীর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু মহাভারতে এই ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছিল এবং ভাসও তাঁর নাটকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকর্মকে উপস্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে এই কাহিনিটিকেই ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, ভাস তাঁর নাটকে দ্রৌপদীর এই অবমাননাকর চিত্রটিকে উপভোগের বিষয় এবং দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশ স্পর্শ ও ভয়ে দ্রৌপদীর বিস্ফারিত নেত্রকে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। ভাস এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি; তিনি আরো অগ্রসর হয়ে দ্রৌপদীর ভয়ার্ত মুখচ্ছবিকে 'রাহুমুখ-গ্রাসিত চন্দ্রলেখার মতো' সাদৃশ্যমূলক উপমা ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ সবগুলোই ভাসের কল্পিত এবং এ বিষয়গুলোকে তিনি দুর্যোধনের সংলাপের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন :

দুর্যোধনঃ — অহো দর্শনীয়োঽয়ং চিত্রপটঃ। এষ দুঃশাসনো দ্রৌপদীং কেশহস্তে
গৃহীতবান্। এষা খলু দ্রৌপদী,
দুঃশাসনপরামৃষ্টা সম্ভ্রমোত্ফুল্ললোচনা।
রাহুবক্ত্রান্তরগতা চন্দ্রলেখেব শোভতে ॥৭॥
দূতবাক্যম্[১৪]

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকে নারী ছিলেন অসহায় এবং তার স্বাধীন ইচ্ছার কোনো গুরুত্বই ছিল না। নিরপরাধ হলেও একজন নারীকে সামাজিক বিধি-বিধান ও প্রতিকূল পরিস্থিতিজনিত নিপীড়ন মাথা পেতে নিতে হতো।

খ. *কর্ণভারম্* : *কর্ণভার* নারীচরিত্র বিহীন নাটক হলেও কর্ণের সংলাপের মাধ্যমে উক্ত নাটকে কর্ণমাতা কুন্তী এবং রাধার কথা উল্লিখিত হয়েছে। কুন্তী কর্ণের গর্ভধারিণী মাতা। আর রাধার নিকট কর্ণ লালিত-পালিত হয়ে রাধার পুত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলোচ্য নাটকে উক্ত দুই নারীচরিত্রের কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় না।

গ. *পঞ্চরাত্রম্* : আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নাট্যকার ভাস *পঞ্চরাত্র* নাটকে প্রত্যক্ষভাবে কোনো নারীচরিত্রের অবতারণা না করলেও অন্যদের সংলাপের মধ্য দিয়ে বেশকিছু নারীচরিত্রের উল্লেখ করেছেন। যেমন, সূত্রধারের সংলাপের মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের কথা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্রাহ্মণের সংলাপের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে স্ত্রীলোক ও সন্তানহারা জননীর কথা, ভীষ্ম, ভগবান তথা ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনের সংলাপের মাধ্যমে দ্রুপদরাজ-তনয়া দ্রৌপদী, দ্রোণের সংলাপের মাধ্যমে অপহৃতা সীতা, বৃদ্ধগোপালকের সংলাপের মাধ্যমে গোপ মায়েদের ও গোপ বালিকাদের, গোমিত্রকের সংলাপের মাধ্যমে গোরক্ষাণিকা, বৃহন্নলা তথা ছদ্মবেশী অর্জুন, বিরাট রাজা, যুধিষ্ঠির ও উত্তরের সংলাপের মাধ্যমে বিরাট-রাজকন্যা উত্তরা, ভীমসেনের সংলাপের মাধ্যমে ভীমসেন-মাতা,

Dhaka University Institutional Repository

বৃহন্নলা তথা ছদ্মবেশী অর্জুনের সংলাপের মাধ্যমে সুভদ্রা এবং ভীষ্মের সংলাপের মধ্য দিয়ে স্ত্রীলোকগণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

উত্তরা : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিরাট-রাজকন্যা উত্তরা সংলাপের মাধ্যমে উল্লিখিত চরিত্র; প্রত্যক্ষ চরিত্র নয়। অনুপম শিল্পরীতি এবং নিপুণ কলাকৌশলে রচিত বীররস প্রধান নাটক পঞ্চরাত্রে রাজকুমারী উত্তরা চরিত্রের উল্লেখ আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের নারীর অবস্থানের একটি দিক প্রতিফলিত হয়। তৎকালীন সমাজে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মতো নারীকেও দ্রব্যসামগ্রী হিসেবে গণ্য করা হতো এবং কখনো কখনো দ্রব্যসামগ্রীর মতোই তাদেরকে 'পণ' হিসেবে ব্যবহার করা হতো। রাজকন্যা উত্তরা এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। উক্ত নাটকে ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতায় উত্তরার পিতা বিরাটরাজার নিকট যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হলে রাজা (বিরাটরাজ) অর্জুনকে গো-গ্রহণের বিজয় পণ হিসেবে নিজ কন্যা উত্তরাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন :

> রাজা – অর্জুন! গোগ্রহণ বিজয়শুল্কার্থং প্রতিগৃহ্যতামুত্তরা।
>
> *পঞ্চরাত্রম্*, ২য় অঙ্ক[১৫]

রাজ্যস্বার্থে বা অন্যকোনো অভিপ্রায় পরিপূরণের জন্য নারীর ব্যবহার তা সেটি 'পণ' বা অন্যকোনো মাধ্যম হিসেবেই হোক না কেন—সে সমাজে একটি প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী তা সে যেকোনো সামাজিক স্তরেরই হোক না কেন, এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। নারীর এ অবমাননাকর অবস্থা স্বীকৃত প্রথা হিসেবেই গণ্য হতো এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উদ্যোগ তেমন লক্ষণীয়ভাবে দেখা যায় না।

এছাড়া বিভিন্ন সংলাপে উল্লিখিত অন্যান্য নারীর কোনো ভূমিকা উক্ত নাটকে পরিলক্ষিত হয় না।

ঘ. *দূতঘটোৎকচম্* : নাট্যকার মহামতি ভাস বিরচিত *দূতঘটোৎকচম্* নাটকে আমরা মূলত গান্ধারী, দুঃশলা ও প্রতিহারী—এই তিনটি নারীচরিত্রের উল্লেখ পাই। এছাড়া দুঃশলার সংলাপের মাধ্যমে বধূ উত্তরা এবং ঘটোৎকচের সংলাপের মাধ্যমে দুর্যোধনের ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ দ্রৌপদীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে উক্ত নাটকের বিভিন্ন স্তরের কয়েকটি নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরা হলো।

গান্ধারী : *দূতঘটোৎকচম্* নাটকেও গান্ধারী মহাভারতের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী, কন্যা দুঃশলা ও দুর্যোধন-দুঃশাসন প্রমুখ শতপুত্রের জননী এবং অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু ও ভীম-পুত্র ঘটোৎকচের পিতামহী। কিন্তু নাটকটিকে সুবিন্যস্ত করার জন্য গান্ধারী-দুঃশলার বিলাপ একান্তই ভাসের সৃষ্টি। গান্ধারী অভিজাত

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের এক নারীচরিত্র। রাজসিংহাসন লাভকে কেন্দ্র করে দুই পরিবার তথা কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধকে গান্ধারী মনে-প্রাণে কামনা করেননি। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যুদ্ধমাত্রই ধ্বংস ও মৃত্যু। আর এ যুদ্ধে স্বজনদেরই ধ্বংস এবং মৃত্যু অনিবার্য। তাই তিনি পৌত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে দুঃখিতা ও ব্যথিতা। কারণ শিশুসম অভিমন্যুকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে তিনি মনে-প্রাণে সমর্থন করতে পারেননি। তবে তিনি এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পুত্রদের এরূপ কর্মকাণ্ডে এবং কুলযুদ্ধের ফলে বংশনিধনের আশু সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর একমাত্র কন্যা দুঃশলার পতির হত্যা অনিবার্য জেনেও তিনি কন্যাকে সান্ত্বনা দেন। এছাড়া স্বামীর একান্ত অনুগতা হয়ে স্বামীর আদেশে তিনি অভিমন্যুর অন্তিমযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে মনস্থির করেন। এই পতিভক্তিও তাঁর চরিত্রের একটি অনন্য দিক।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গান্ধারীকে একজন সার্থক মাতা, মাতামহী ও স্ত্রী হিসেবে দেখতে পাই। রাজঅন্তঃপুরের একজন রাজমহিষীর পরিবার ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা ও দুর্ভাবনা তাঁর চরিত্রের দূরদৃষ্টিতার এক উত্তম উদাহরণ। তবে আমরা একই সঙ্গে একথাও বলতে পারি, তাঁর ভাবনা বা দুর্ভাবনাকে স্বামী-পুত্র কেউই মূল্য দেননি এবং আশু যুদ্ধ, ধ্বংস ও স্বজনহত্যা রোধে তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হয়তো নারী বলেই তাঁর পরিবার ও রাজ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতা স্বামী-সংসারে স্থান পায়নি। তৎকালীন সমাজে একজন নারীর এ করুণ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করা ব্যতীত আর করণীয় কিছুই নেই।

দুঃশলা : মহাভারতের ন্যায় *দূতঘটোৎকচ* নাটকেও দুঃশলা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কন্যা, দুর্যোধন-দুঃশাসন প্রমুখ শত ভ্রাতার ভগ্নী এবং জয়দ্রথ-পত্নী। ফলে দুঃশলাও একজন অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীচরিত্র।

সিংহাসনলাভকে কেন্দ্র করে পারিবারিক দ্বন্দ্বে যে যুদ্ধের সূচনা হয়—তাতে শিশুসম ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমন্যু-হত্যাকে তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি। কারণ একজন বধূ হিসেবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বৈধব্যের বিষয়টি যে নিদারুণ কষ্টকর এবং মনোদুঃখের কারণ হয়, দুঃশলা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। একজন নারীর প্রতি তাঁর এই সমবেদনা তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। দুঃশলা শুধু সমবেদনা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি সশরীরে বৈধব্যবেশে অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার কাছে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন। তাঁর এই সহমর্মিতার বিষয়টিও তাঁর চরিত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। শুধু তাই নয়, নিজ স্বামীর মৃত্যুর ফলে তাঁর যে মনোবেদনা এবং

Dhaka University Institutional Repository

মনোকষ্টের সৃষ্টি হতো তা কল্পনা করা একজন নারী হিসেবে অত্যন্ত যথার্থ। তাই তিনি উত্তরার স্বামী অভিমন্যু-হত্যাকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা এবং অন্যায্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু দুঃশলা নিরুপায় ও অসহায়। রাজ্যের উত্থান-পতনে কিংবা ভাল-মন্দে গান্ধারীর মতো নারীর উপলব্ধি এবং অভিমত যেমন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মূল্যহীন, তেমনি দুঃশলার অভিমত-উপলব্ধিও মূল্যহীন। দুঃশলাকে একজন নারী হিসেবে এই পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শুধু একজন নীরব পর্যবেক্ষকের ভূমিকাই পালন করে নিজ ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকতে হয়েছে। অভিমন্যুর মৃত্যুর ফলে তাঁর স্বামীহত্যার অনিবার্যতায় তিনি শঙ্কিতা এবং তাঁর এই শঙ্কাকে প্রকাশের জন্য বৈধব্য বেশে উত্তরার নিকট যাওয়ার বিষয়টি তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং অদূর ভবিষ্যতে দুঃখময় জীবনের দিকটিই উন্মোচন করেছে। তাঁর এই উদ্বেগে পিতা-মাতার কাছ থেকে সান্ত্বনা লাভ শুধু সান্ত্বনা হিসেবেই থেকে গেছে।

দূতঘটোৎকচ নাটকে উপর্যুক্ত দুটি চরিত্র ছাড়াও নাট্যকার দ্বার রক্ষিকা হিসেবে একজন শ্রমজীবী নারী তথা প্রতিহারী চরিত্রের অবতারণা করেছেন এবং তার সংলাপের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে দুঃশলার স্বামী-হত্যার আশঙ্কায় তাঁর ক্রন্দনের বিষয়টি পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে অবহিত করেছেন।

ঙ. *উরুভঙ্গম্* : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *উরুভঙ্গ* মহাভারতের কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের অন্তিম সময়ে গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের মৃত্যুদৃশ্যকে অবলম্বন করে রচিত। এই নাটকে ভাস তিনটি নারীচরিত্রের অবতারণা করেছেন : গান্ধারী, মালবী ও পৌরবী। এছাড়া প্রথম সৈনিকের সংলাপের মাধ্যমে দ্রৌপদী এবং দুর্যোধনের সংলাপের মাধ্যমে কুন্তী, সুভদ্রা, দ্রৌপদী ও অপ্সরা উর্বশীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। আমরা নিম্নে উক্ত তিনটি প্রত্যক্ষ তথা বাস্তব নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরব :

গান্ধারী : *উরুভঙ্গ* নাটকে গান্ধারীকে মূলত দুর্যোধনের মাতা, পুত্রবধূ মালবী ও পৌরবীর শ্বশ্রূমাতা, ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্মিণী এবং দুর্যোধন-পুত্র দুর্জয়ের পিতামহী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই বলাই বাহুল্য, গান্ধারী একজন অভিজাত সম্প্রদায়ের নারী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ নাটকটি ভাস অসাধারণ নাট্যকৌশলে নতুন আঙ্গিকে উপাস্থাপন করেছেন।

কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতরভাবে আহত (ভীম কর্তৃক উরুভঙ্গ) মৃত্যু-পূর্ববর্তী দুর্যোধনের করুণ অবস্থায় মাতা গান্ধারীর মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। *দূতঘটোৎকচ* নাটকে আমরা কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে গান্ধারীর বংশনাশের উদ্বিগ্নতার বিষয়টি লক্ষ করেছি যা সত্যি সত্যিই বাস্তবে রূপলাভ করেছে। দীর্ঘযুদ্ধে একে একে পুত্র হারানোর শোক এবং সবশেষে দুর্যোধনের মতো বীরপুত্রকে হারানোর শোকে বিহ্বল মাতা গান্ধারী তাঁকে পরজন্মেও পুত্র হিসেবে লাভ করার

Dhaka University Institutional Repository

মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। গান্ধারীর এই মনোবাসনা তাঁর অপত্যস্নেহেরেই ফলশ্রুতি এবং তিনি যে একজন সার্থক মাতা—সে কথাটিও পুত্র দুর্যোধন উদার চিত্তে পরজন্মে তাঁর-ই গর্ভে জন্ম নেওয়ার আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন :

নমস্কৃত্য বদামি ত্বাং যদি পুণ্যং ময়া কৃতম্।
অন্যস্যামপি জাত্যাং মে ত্বমেব জননী তব ॥৫০॥
ঊরুভঙ্গম্[১৬]

শুধু তাই নয়, একজন যথার্থ ও উপযুক্ত পুত্রের প্রতি অধিকার নিয়েই তিনি পুত্রের যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু-শয্যায় পুত্র হারানো শোকসন্তপ্ত পিতাকে সান্ত্বনাবাণী দিয়ে আশ্বস্ত করার অনুরোধ করেন। এ দুটি বিষয় গান্ধারী চরিত্রের অন্যতম দিক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, পারিবারিক জীবনে গান্ধারী একজন সার্থক মাতা এবং সার্থক মাতা হিসেবেই তিনি পুত্রদের লালন-পালন করে তাদের আদর্শ পুত্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এছাড়া অবিচল স্বামীভক্তির কারণে পুত্রের মৃত্যুশয্যায়ও পিতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথায় তাঁর স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা ও পতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

মালবী ও পৌরবী : *ঊরুভঙ্গ* নাটকে মালবী ও পৌরবী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র রাজা দুর্যোধনের দুই পত্নী এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর দুই পুত্রবধূ। এই দুইজনই সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধে দুর্যোধন গুরুতরভাবে আহত হলে অন্যান্যের সঙ্গে দুর্যোধনের অনুসন্ধানে তাঁর দুই রানি মালবী ও পৌরবী রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। রণক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর সন্ধান পেয়ে তাঁরা নিরতিশয় ব্যথিতা ও দুঃখিতা হন। স্বামীর আশু মৃত্যু সম্ভাবনায় মালবীর অশ্রুসিক্ত অবস্থা দেখে স্বামী দুর্যোধন তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং অশ্রুসংবরণ করতে অনুরোধ করেন।

একজন নারী মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্বামীর কষ্টকর অবস্থা দেখে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হবেন এবং তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবেন। মালবীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বামী দুর্যোধনের সান্ত্বনার পরও তাঁর ক্রন্দন পতিপ্রেম এবং পতির প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ করে। দুর্যোধনের অন্য স্ত্রী পৌরবী দৃঢ়চেতা এবং স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি শ্রদ্ধায় সহমরণে যেতে প্রস্তুত : "পৌরবী— এক্কাকিদপ্পবেসণিচ্চআ ণ রোদামি (এককৃতপ্রবেশনিশ্চয়া ন রোদামি)।"[১৭] এ ক্ষেত্রে স্বামীর সান্ত্বনাবাক্য তাঁকে এই প্রতিজ্ঞা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। মালবীর মতো পৌরবীও পতিভক্তিপরায়ণা এবং স্বামীর প্রতি একান্তই অনুগতা।

Dhaka University Institutional Repository

ঊরুভঙ্গ নাটকে মালবী ও পৌরবীর সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি এবং সংক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র পাওয়া যায়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য ধর্ম এবং সমাজ বিধি-বিধান কর্তৃক স্বীকৃত, প্রয়োজনে সহমরণে যাওয়ারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

চ. *মধ্যমব্যায়োগঃ* : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভাস বিরচিত *মধ্যমব্যায়োগ* নাটকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এই নাটকে ভাস মূলত হিড়িম্বা এবং ব্রাহ্মণী—এই দুই নারীচরিত্রের উল্লেখ করেছেন। আমরা নিম্নে এই দুই নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরব।

হিড়িম্বা : মহাভারতের ন্যায় হিড়িম্বা মূলত একজন রাক্ষস-নারী ও ঘটনা পরম্পরায় মানবচরিত্র দ্বিতীয় তথা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পত্নী এবং ভীমের ঔরসজাত ঘটোৎকচের জননী।

জীবনের ঘটনাচক্রে রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমের অমিত বিক্রমে মুগ্ধ হয়ে প্রেমাকৃষ্টা হন এবং ভীমও তাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। হিড়িম্বার আচার-আচরণ এবং জীবনাচরণে ভীম এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, তাকে কখনো রাক্ষসী হিসেবে বিবেচনা না করে মানবী হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, ভীম তাকে শুধু 'দেবী' নয় 'করুণাময়ী দেবী' হিসেবে সম্বোধন করেন। একজন রাক্ষসীর মানবস্বামীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা রাক্ষস সমাজে অত্যন্ত বিরল। সেদিক থেকে হিড়িম্বা একটি ব্যতিক্রমী রাক্ষসী চরিত্র।

শুধু পতিভক্তি নয়, পুত্র-স্নেহের দিক থেকেও হিড়িম্বা এক অনন্য উদাহরণ। পুত্রেরও মাতার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা ছিল। মাতৃ-আজ্ঞা পালন যেমন তার কাছে শিরোধার্য ছিল, তেমনি মাতৃ-আজ্ঞা পালনে পুত্র নির্দ্বিধায় যেকোনো অবস্থার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিলেন। মাতা-পুত্রের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অত্যন্ত বিরল। শুধু তাই নয়, পিতা-মাতার মিলনেও পুত্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং এতে মাতার দীর্ঘদিনের বিরহের অবসান ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হিড়িম্বাকে পারিবারিক জীবনে একজন আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতা হিসেবেই দেখতে পাই।

ব্রাহ্মণী : ভাস তাঁর *মধ্যমব্যায়োগ* নাটকের পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য কেশবদাস নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁর পত্নী ব্রাহ্মণী এবং তাদের তিনপুত্রের চরিত্র উপস্থাপন করেছেন। এই সবগুলো চরিত্রই ভাসের কল্পিত।

Dhaka University Institutional Repository

রাক্ষসী হিড়িম্বার মধ্যাহ্নভোজে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রদের বিনিময়ে নিজ জীবন উৎসর্গ করতে রাজি হলে ব্রাহ্মণী পতির জীবনরক্ষায় নিজ জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কারণ, পত্নীর নিকট পতিই একমাত্র ধর্ম, একমাত্র অবলম্বন। পতির জীবনের তুলনায় তাঁর জীবন মূল্যহীন। শুধু তাই নয়, স্বামীর জীবন এবং বংশরক্ষার্থেও নিজ জীবন উৎসর্গ করা শ্রেয়তর :

> ব্রাহ্মণী– অয্য! মা মা এবং। পদিমত্তধম্মিণী পদিব্বদতি নাম। গহীদফলেণ এদিণা সরীরেণ অয্যং কুলং চ রক্খিদুমিচ্ছামি (আর্য, মা মৈবম্। পতিমাত্রধর্মিণী পতিব্রতেতি নাম। গৃহীতফলেনৈতেন শরীরেণার্যং কুলং চ রক্ষিতুমিচ্ছামি)।
>
> *মধ্যমব্যায়োগঃ*[১৮]

ব্রাহ্মণীর উপর্যুক্ত উক্তিতে তাঁর পতিসেবার দিকটি বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তিন পুত্রের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি তাঁর বেশি দুর্বলতায় এক ধরনের পক্ষপাতিত্বের আচরণ প্রকাশ পায়। সমাজ-সংসার পুত্র-কন্যাদের প্রতি যেমন সম-আচরণ প্রত্যাশা করে, তেমনি সম-স্নেহ ভালোবাসাও প্রত্যাশা করে। এ বিষয়টি ব্রাহ্মণীর চরিত্রের এক বড় দুর্বল দিক। তাই বলা যায়, পতি প্রেমের দিক থেকে তিনি সার্থক ও আদর্শ পত্নী হলেও মাতৃত্ব-আচরণের দিক থেকে তাঁকে আদর্শ-মাতা হিসেবে কল্পনা করা যায় না।

***বালচরিতম্* :** মহাকবি ভাস বীর, ভয়ানক এবং রৌদ্র-রসের মিথষ্ক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক চরিত্রের সমন্বয়ে শিশুদের উপযোগী অদ্ভুত রস পরিবেশন করেছেন তাঁর *বালচরিতম্* নাটকে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নাটকটি মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণকাহিনি অবলম্বনে রচিত। আলোচ্য নাটকে নয়টি নারীচরিত্র : দেবকী, দুজন প্রতিহারী, ধাত্রী, চণ্ডালযুবতীগণ, কাত্যায়নী, ঘোষসুন্দরীগণ, রাজস্ত্রী, কৌমোদোকী এবং নন্দগোপের সংলাপের মধ্য দিয়ে যশোদা, বৃদ্ধগোপালকের সংলাপের মধ্য দিয়ে পুতনা রাক্ষসী, দামকের সংলাপের মধ্য দিয়ে গোপিনীদের, বসুদেবের সংলাপের মাধ্যমে সঙ্কর্ষণ-মাতা রোহিণী, নারদের সংলাপের মধ্য দিয়ে অপ্সরাদের এবং ভট ধ্রুবসেনের সংলাপের মধ্য দিয়ে মদনিকা নাম্নী কুঁজী ইত্যাদি নারীচরিত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বালচরিত নাটকে বহু সংখ্যক নারীচরিত্র থাকলেও দেবকী, ধাত্রী এবং প্রতিহারী ব্যতীত অন্যকোনো নারীর বাস্তব ভূমিকা নাটকে পরিলক্ষিত হয় না। তাই আমরা উক্ত তিনজন নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

দেবকী : দেবকী রাজা উগ্রসেনের কন্যা, বসুদেবের সহধর্মিণী, মথুরারাজ কংসের ভগ্নী এবং সর্বোপরি কৃষ্ণ-জননী। এই নাটকে দেবকীকে সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণা

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুত্রের জীবনরক্ষার্থে দেবকী নিজ পুত্রকে অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে দ্বিধা করেননি। এটি তাঁর আদর্শ মাতৃত্বের দিকটি উন্মোচন করেছে সত্য; কিন্তু ভ্রাতা কর্তৃক পুত্রহত্যার বিরুদ্ধে তিনি কোনো সরব প্রতিবাদ করতে পারেননি কিংবা বলা যায়, সরব প্রতিবাদ করার কোনো অবস্থাই তাঁর অনুকূলে ছিল না। আবার একথাও বলা যায়, তিনি সরব প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া তাঁর সন্মুখেই একটি কন্যাশিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদকে কোনো মূল্য এবং গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শুধু নিজ-সন্তান নয়, অন্যের সন্তানের জন্য তাঁর এই সমবেদনা তাঁর শাশ্বত মাতৃত্বেরই আরেকটি রূপ। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এরূপ আদর্শ মাতৃত্ব চিরকালই প্রশংসিত হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি আমরা বলতে পারি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীর এরূপ ভূমিকা ছাড়া আর অন্য কিছু করার তথা প্রতিবাদমুখর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। রাজ্যের এরূপ সংকটময় অবস্থায় একজন রাজকন্যা কিংবা রাজভগ্নী হওয়া সত্ত্বেও সমাজ-সংসারে তাঁর কোনো সদর্থক ভূমিকা রাখা হয়নি।

ধাত্রী : ভারতীয় মহাকাব্য, পৌরাণিক বা লৌকিক উপাখ্যানসহ বিভিন্ন কাহিনিমূলক আখ্যানে ধাত্রীচরিত্রের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। সদ্যসন্তান প্রসবা নারীর সন্তানকে পরিচর্যার জন্য, অন্যকথায় লালন-পালনের জন্য এরূপ ধাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুধু সন্তান পরিচর্যা বা লালন-পালনের জন্যই নয়, অনেক সময় বা অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংকটে এরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেমন : *বালচরিত* নাটকে উল্লিখিত ধাত্রী কৃষ্ণের জীবনরক্ষার জন্য একটি কন্যাশিশুকে মাতৃস্নেহ দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাই ধাত্রীকে 'বিকল্প মাতা' হিসেবেও আমরা উল্লেখ করতে পারি। অবশ্য তৎকালীন সমাজে একমাত্র অভিজাত পরিবারেই এরূপ ধাত্রীব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এসব ধাত্রীদের অবস্থান নিম্নতর শ্রমজীবীর তুলনায় সামান্য উচ্চস্তরের ছিল।

প্রতিহারী : তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সুরক্ষা, সংবাদ আদান-প্রদান এবং রাজপ্রাসাদের এরূপ অন্যান্য কাজে পুরুষরক্ষীদের পাশাপাশি নারীরক্ষিকাদেরও নিয়োজিত করা হতো। এদের বলা হতো প্রতিহারী এবং সংখ্যার দিক থেকে এরা একাধিকও ছিলেন। এই প্রতিহারীরা রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। *বালচরিত* নাটকে যেমন দেখা যায়, যশোধরা নামে একজন প্রতিহারী রাজা কংসকে দেবকীর কন্যাসন্তান প্রসবের সংবাদ দেন এবং এই কন্যাকে হত্যা না করার জন্য দেবকীর অনুরোধের কথাও রাজাকে অবহিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিহারীরা সাধারণত সমাজের শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পাশাপাশি রাজকার্যে অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক অমর মহাকাব্য মহাভারত। তৎকালীন সমাজের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়গুলো যেমন মহাভারতে স্থান পেয়েছে, তেমনি মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রজাতি শ্রেণির সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্ক স্থাপনের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। নাট্যকার ভাস মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর নাটকগুলো রচনা করেন এবং নাটকে নিজ-কল্পিত বেশ কিছু চরিত্র সংযোজন করেন। আমরা মূলত ভাসের এসব নাটকের নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মহাকাব্য রামায়ণে যেমন, তেমনি মহাকাব্য মহাভারতেও নারীর অবস্থা ও অবস্থানের তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় নারীকে শুধু পারিবারিক এবং স্বামী-সন্তানের ক্রিয়া-কর্মের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। মনে হয় যেন, পরিবার আর স্বামী-সন্তান নিয়েই শুধু তাদের জীবন আবর্তিত হবে এবং একজন নারী হবেন বাৎসল্য প্রেমে উজ্জীবিত, স্বামীর একান্ত অনুগতা, সর্বোপরি স্বামীর আদেশ হবে তার শিরোধার্য। তার নিজ জীবন মূল্যহীন, পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাই তার জীবনের শ্রেয় ও পেয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় তাই দেখা যায়, নারীর নিজস্ব কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। ভাস বিরচিত মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটকসমূহের নারীচরিত্রের তদ্রূপ অবস্থা ও অবস্থানই লক্ষণীয়। ভাস এসব নাটকের ঘটনা বিন্যাসে কিছুটা সংযোজন-বিয়োজন এবং নতুন চরিত্র সৃষ্টি করলেও কোনো নাটকেই নারীর অবদান ও শৃঙ্খলিত অবস্থান থেকে মুক্তির পথ দেখাননি। সমাজের ক্রমস্তর বিন্যস্তব্যবস্থাকে তিনিও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৫.৪ ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত নাটক

ক. *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ভাস বিরচিত ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি আশ্রিত নাটক *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্* এবং *স্বাপ্নবাসবদত্তম্*। এই দুটি নাটকই ভাসের পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি। প্রথমোক্ত নাটকটি রাজনীতিকেন্দ্রিক এবং পুরুষোচিত ভাবসম্পন্ন। নাটকটিতে মূলত তিনটি নারীচরিত্র যথা, অঙ্গারবতী, বিজয়া ও নটী এবং প্রতিহারী ও বৎসরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সংলাপের মাধ্যমে 'রাজমাতা' (রাজা উদয়নের মাতা) ও 'রাজমহিষীদের' এবং কাঞ্চুকীয়, রাজা, রানি (দেবী), বিদূষক, যৌগন্ধরায়ণ, ভট, দ্বিতীয় সাধারণ কর্মচারী ও মহাসেনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী ভরতরোহক প্রমুখের সংলাপের মধ্য দিয়ে অবন্তিরাজকন্যা 'বাসবদত্তা'র কথা উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও বিদূষকের সংলাপে একজন 'ধাত্রী' ও 'দাসী'র এবং রানির (দেবী) সংলাপে বৈতালিকী উত্তরার (গান্ধর্ব বিদ্যায় পারদর্শিনী নারী) উল্লেখ লক্ষ করা যায়। আমরা নিম্নে আলোচ্য নাটকের বিভিন্ন স্তরের কয়েকটি নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরব।

অঙ্গারবতী : অঙ্গারবতী অবন্তিরাজ মহাসেনের (প্রদ্যোত) প্রধানা মহিষী, কন্যা বাসবদত্তা এবং দুই পুত্র গোপালক ও পালকের মাতা এবং বৎসরাজ উদয়নের শ্বশ্রূমাতা। ভাস তাঁর অন্যান্য নাটকের রাজমহিষীর তুলনায় অঙ্গারবতীকে কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষভাবে রাজকার্যে সংশ্লিষ্টতার দিকটি তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, কন্যার বিবাহ এবং রাজকার্যে অঙ্গারবতীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও আমরা লক্ষ করি। পূর্ব-রাজনৈতিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কন্যার উপযুক্ত পাত্র হিসেবে তিনি বন্দি উদয়নকেই কন্যার বীণা-বাদনশিক্ষক এবং পরবর্তীতে জামাতা হিসেবে নির্বাচন করেন। রাজা উদয়নকে মনে মনে জামাতা হিসেবে নির্বাচন করলেও রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে রাজমহিষীকে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেন। রাজমহিষীর এই সিদ্ধান্ত পরস্পর বিবাদমান দুটি রাজ্যের শত্রুতার আপাত অবসান ঘটাতে সাহায্য করে। অঙ্গারবতীর হৃদয় অপত্যস্নেহে পরিপূর্ণ। তাই উদয়নের সঙ্গে কন্যার পলায়নে তিনি আপাত বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেও কন্যাস্নেহে আকুল হয়ে উদয়ন ও বাসবদত্তার চিত্রপটের মাধ্যমে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।

অঙ্গারবতীর পতিভক্তির বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। স্বামী মহাসেন যেমন তাঁর প্রতিটি কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেন, ঠিক তেমনি তিনিও স্বামীর প্রতিটি কথা পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। নিম্নের উক্তিটি তারই সাক্ষ্য বহন করে :

> দেবী – ণ গণেদি। কিং বালো অপণ্ডিদো বা (ন গণয়তি। কিং বালঃ অপণ্ডিতো বা)?
>
> *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*, ২য় অঙ্ক[১৯]

অর্থাৎ, "দেবী – মহাসেনকে মান্য করেন না? তবে কি ইনি বালক, না কি নির্বোধ?"

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত অঙ্গারবতী রাজমহিষী, পত্নী এবং মাতা হিসেবে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। পরস্পর বিবাদমান এই সংঘর্ষে যেমন লোকক্ষয়, অর্থব্যয় হতো, তেমনি নানাভাবে উভয় রাজ্যের সাধারণ জনগণ নির্যাতিত

Dhaka University Institutional Repository

হতো। উদয়নের সঙ্গে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থায় এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দূরীভূত হয়। পারিবারিকভাবে অঙ্গারবতী একজন শান্তিপ্রিয় মাতা এবং পত্নী। কন্যার অকস্মাৎ পলায়নে তিনি দুঃখিতা হলেও পারিবারিক শান্তির জন্য বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেন এবং স্বামীর নির্দেশ অনুসারে পারিবারিক কর্তব্যাদি সুসম্পন্ন করেন।

বিজয়া : বিজয়া বৎসরাজ উদয়নের দ্বাররক্ষিকা এবং ভাস তাকে 'প্রতিহারী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ভাস পুরুষের মতো নারীকেও রাজকার্যের এই গুরু দায়িত্ব পালন করাতে দ্বিধাবোধ করেননি। আমরা সমগ্র নাটকে দেখতে পাই, একজন নারী অত্যন্ত সততা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আনুগত্য নিয়ে এই কার্যটি পালন করেছেন। রাজকার্যে সংবাদ আদান-প্রদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এই কাজটি যে একজন নারী করতে সক্ষম, বিজয়া তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শুধু তাই নয়, এই সংবাদ আদান-প্রদানে দ্বাররক্ষিকা বিজয়াও রাজার ভাল-মন্দ, শুভাশুভ ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করেছেন। ফলে সমাজের এই শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের বিশেষ করে নারীর প্রভুভক্তির বিষয়টি যেমন সুস্পষ্ট হয়, তেমনি রাজা ও রাজকার্যের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্যও প্রকাশ পায়।

নটী : ভাস তাঁর যে কয়টি নাটকে নটী চরিত্রের অবতারণা করেছেন—তার মধ্যে আলোচ্য নাটকটিও অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও নটী সূত্রধার-পত্নী এবং নাটক পরিচালনায় সূত্রধারের সহকারিণী। নটী এবং সূত্রধারের সংলাপের মধ্য দিয়েই নাটকের সূচনা হয়েছে। অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও তাই নটীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সমাজের শ্রমজীবী নারীরা শুধু পারিবারিক কাজেই নিজ জীবনকে সীমায়িত করেননি, রাজা এবং প্রজাদের মনোরঞ্জন ও বিনোদনের জন্যও অবদান রেখেছেন।

ভাস তাঁর *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* নাটকে অত্যন্ত সুদক্ষ ও সার্থকভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রাজমহিষী হিসেবে অঙ্গারবতীর রাজকার্যে অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেছেন—যা ছিল তৎকালীন সমাজের বিরল ঘটনা। নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে কাজের বিভাজন সৃষ্টি না করে ভাস আরো দেখিয়েছেন যে, একজন শ্রমজীবী নারী পুরুষের মতোই রাজকার্যের গোপনীয়তা রক্ষা করে সংবাদ আদান-প্রদানে সক্ষম। বিজয়াকে তিনি এভাবেই একজন সক্ষম শ্রমজীবী নারী হিসেবে তুলে ধরেছেন।

তৎকালীন সমাজে নাটক ছিল অন্যতম বিনোদনের মাধ্যম। এই বিনোদনমূলক গণমাধ্যমে নারীদের সংশ্লিষ্ট করে সমাজে নারীর ভূমিকাকে ভাস এক অর্থে গৌরবান্বিত করে তুলেছেন এবং সূত্রধার ও নটী

Dhaka University Institutional Repository

তথা একজন নারীর সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা হওয়ার বিষয়টিও নারীর সামাজিক মর্যাদার ইঙ্গিত প্রদান করে। অন্যান্য সংলাপের মধ্য দিয়ে যেসব নারীচরিত্র উল্লিখিত হয়েছে—তাদের কোনো ধরনের ভূমিকার কথা জানা যায় না।

সবদিক থেকে বিবেচনা করলে আলোচ্য নাটকে রাজকার্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টিই আমরা লক্ষ করি এবং সেদিক থেকে নাটকটি ব্যতিক্রমও বটে।

খ. *স্বপ্নবাসবদত্তম্* : *স্বপ্নবাসদত্তম্* নাটকটি ভাসের অনবদ্য কল্পনার একটি সার্থক রূপায়ণ। রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রেম, বিরহ, মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগে সিঞ্চিত আলোচ্য নাটকটি তাই যুগ যুগ ধরে মানবহৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এছাড়া সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটকটি ভাসের অন্যতম এবং অভূতপূর্ব উদাহরণ।

স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে নারীচরিত্রের সংখ্যা মোট নয়টি : বাসবদত্তা, পদ্মাবতী, তাপসী, চেটী, পদ্মিনিকা, মধুকরিকা, দুইজন ধাত্রী (যথাক্রমে পদ্মাবতী ও বাসবদত্তার উপমাতা) এবং বিজয়া নাম্নী প্রতিহারী। এছাড়া কাঞ্চুকীয়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে মগধরাজ্যের মহারাজ-জননী আশ্রমবাসিনী মহাদেবী, ধাত্রী বসুন্ধরার সংলাপের মধ্য দিয়ে অবন্তিরাজ-মহিষী অঙ্গারবতী, চেটীর সংলাপের মধ্য দিয়ে অন্য এক চেটী কুঞ্জরিকা, বিদূষকের সংলাপের মধ্য দিয়ে অবন্তিসুন্দরী নামে যক্ষিণী এবং উদয়নের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিরচিকা (অন্তঃপুরচারিকা–উদয়নের পূর্ব-প্রেমিকা) নামে আরো পাঁচটি নারীচরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। আমরা নিম্নে উপর্যুক্ত নারীচরিত্রসমূহের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীর অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরব।

বাসবদত্তা : বাসবদত্তা *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকের প্রধান নায়িকা, অবন্তীরাজ মহাসেন প্রদ্যোত এবং অবন্তিরাজ-মহিষী অঙ্গারবতীর কন্যা, বৎসরাজ উদয়নের প্রথমা মহিষী এবং মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সপত্নী। সর্বোপরি তিনি অনন্যা সুন্দরী ও বিভিন্ন গুণে বিভূষিতা অভিজাত সম্প্রদায়ের এক নারী। সমগ্র নাটকে সরব উপস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রায় সমগ্র নাটকেই বাসবদত্তাকে 'ছদ্মবেশী আবন্তিকা' নারীচরিত্রের ভূমিকায় দেখা যায়।

ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তের নায়িকা বাসবদত্তা সর্বত্যাগিনী করুণ নারীচরিত্রের এক প্রেমময়ী মূর্তপ্রতীক। যৌবনের শুরুতেই তিনি বৎসরাজ উদয়নের প্রতি আকৃষ্টা হন এবং তাঁকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দিয়ে স্বামী হিসেবে বরণ করেন। রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে এবং স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় প্রিয়তম স্বামীকে ছেড়ে তিনি বেশ কিছুদিন ছদ্মবেশ ধারণ করে অজ্ঞাতবাসে চলে যান। একজন নারীর নিকট স্বামী প্রাণের চেয়েও

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়; কিন্তু রাজ্য ও স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তিনি চরমত্যাগের পরিচয় দেন। তাঁর মিথ্যামৃত্যু সংবাদে শোকাতুর স্বামীর করুণ অবস্থার বর্ণনা শুনে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। কিন্তু সংযত স্বভাবের অধিকারিণী বাসবদত্তা ধৈর্যসহকারে সকল মনোকষ্ট সহ্য করেছেন। স্বামীর অভাব ও অনুপস্থিতিতে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হলেও তিনি সংযত থেকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন।

বাসবদত্তা ত্যাগের আদর্শ প্রতীক হলেও মানবীয় গুণবিবর্জিতা নন। তাই নিজ স্বামীর সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহের কথা শুনে তাঁর স্বাভাবিক নারী হৃদয় অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং মনের অজান্তেই তিনি বলেন :

> ... অহো অচ্চাহিদং। অয্যউত্তো বি নাম পরকেরআ সংবুত্তো ! জাব উববিসামি
>
> (অহো অত্যহিতম্। আর্যপুত্রোঽপি নাম পরকীয় সংবৃত্তঃ! যাবদুপবিশামি)।
>
> *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, ৩য় অঙ্ক[২০]

অর্থাৎ, কি দুর্ভাগ্য আমার! আর্যপুত্রও আজ পরের হয়ে গেলেন!

তবে বাসবদত্তা এই কথা শুনে আশ্বস্ত হন, মগধরাজের অনুরোধেই তাঁর স্বামী পদ্মাবতীকে বিবাহ করেছেন। নাট্যকার ভাস এরূপ অবস্থায় অনেক নারীর স্বেচ্ছায় আত্মাহুতির কথা উল্লেখ করেও বাসবদত্তাকে সেই পথ বেছে নেওয়া থেকে বিরত রেখেছেন। কারণ বাসবদত্তার মতো একজন পতিব্রতা নারীর কাছে স্বামীর সঙ্গে মিলন সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। তাই স্বামীর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় তিনি সে পথ থেকে বিরত থাকেন। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায় :

> ... ধঞ্ঞা খু চক্কবাঅবহূ, জা অন্ণোন্ণবিরহিদা ণ জীবই। ণ খু অহং পাণাণি পরিত্তজামি। অজ্জউত্তং পেক্খামি ত্তি এদিণা মণোরহেণ জীবামি মন্দভাআ (ধন্যা খলু চক্রবাকবধূঃ, যাহন্যোন্যবিরহিতা ন জীবতি। ন খল্বহং প্রাণান্ পরিত্যজামি। আর্যপুত্রং পশ্যামীত্যেতেন মনোরথেন জীবামি মন্দভাগা)।
>
> *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, ৩য় অঙ্ক[২১]

অর্থাৎ, চক্রবাকবধূই ধন্যা; কেন না, প্রিয়তমের বিরহে সে বেঁচে থাকে না। কিন্তু হতভাগিনী আমি প্রাণও ত্যাগ করতে পারছি না। আমি এখনও বেঁচে আছি স্বামীকে দেখার আকাঙ্ক্ষায়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বাসবদত্তা নানাগুণে বিভূষিতা এক নারী। তিনি মালা গাঁথায় যেমন পারদর্শিনী, তেমনি বীণাবাদনেও পারদর্শিনী। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এ কারণেই নিজ-স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের 'মালা গাঁথার' দায়িত্বটি তাঁর উপর অর্পিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের অধিকারিণী বাসবদত্তা নিজ চিত্তকে সংযত রেখে দায়িত্বটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন এবং অনুযোগের সুরে আর

Dhaka University Institutional Repository

কারো নিকট নয়, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বিধাতার নিকট নিজের মনোকষ্টের কথাটি ব্যক্ত করেন। তাঁর স্বগতোক্তি :

> এদং পি মএ কত্তব্বং আসী! অহো অকরুণা খু ইস্সরা (এতদপি ময়া কর্তব্যবাসীৎ! অহো অকরুণাঃ খল্বীশ্বরাঃ)!
>
> *স্বপ্নবাসবত্তম্*, ৩য় অঙ্ক[২২]

অর্থাৎ, নিয়তির কি এটাই নির্দেশ যে, এই কাজটিও আমাকেই করতে হবে! দেবতারা এতটাই নিষ্ঠুর!

সপত্নী পদ্মাবতীর প্রতি তাঁর আচরণ অত্যন্ত অকৃত্রিম এবং ভগ্নীস্নেহতুল্য। পদ্মাবতীর রূপ-লাবণ্যে তাঁর মনে কোনোরূপ ঈর্ষার ভাব জাগ্রত তো হয়-ই নি; বরং তাঁর হৃদয়ে পদ্মাবতীর জন্য ভালোবাসা জাগ্রত হয়। তিনি উদারচিত্তে এবং স্বাভাবিকভাবে পারিবারিক ভারসাম্য এবং স্বামীর মঙ্গলকামনায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সৌহার্দ বজায় রেখেছেন।

বাসবদত্তার উপর্যুক্ত গুণাবলি তাঁর চরিত্রের সদর্থক দিকটি উন্মোচন করে এবং আমরা এসব গুণের জন্য তাঁকে অতিমানবীয় একজন নারী হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। কিন্তু নাট্যকার ভাস তাঁর এসব গুণাবলির পাশাপাশি মানবীয় গুণের দু-একটি দিক তুলে ধরেছেন। যেমন, পদ্মাবতীর বিবাহের মালা গাঁথার সময় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই 'সপত্নীমদন' নামক ঔষধটি মালার সঙ্গে যুক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। একজন নারী হিসেবে তাঁর এই ইচ্ছাকৃত কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তব নারীচরিত্রের দিকটি প্রতিফলিত হয়।

পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে বাসবদত্তার ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং পরিবারে সমাজে এবং রাষ্ট্রে তিনি একজন আদর্শ নারীচরিত্রের অধিকারিণী। পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ ও সদর্থক মনোভাব যেমন পারিবারিক শান্তি বজায় রেখেছে, তেমনি বধূ হিসেবে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। স্বামীর রাজ্য উদ্ধারে তিনি স্বল্পকালের জন্য হলেও স্বামীত্যাগ এবং নিজেকে মৃতঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। রাজ্যরক্ষায় একজন নারীর এরূপ ভূমিকা তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত বিরল। বাসবদত্তার এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ত্যাগ সকল নারীজাতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরূপ একজন আদর্শ স্থানীয় নারীকেও চরিত্রের শুদ্ধতার পরীক্ষার জন্য নাট্যকার সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে রেখেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এটি কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা নয় এবং সে কারণেই বাসবদত্তার মতো নারীকেও চরিত্রের শুদ্ধতার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মাবতী : *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকে পদ্মাবতী সহনায়িকা, মগধরাজকন্যা, মগধরাজ দর্শকের ভগ্নী, বৎসরাজ উদয়নের দ্বিতীয়া মহিষী এবং বাসবদত্তার সপত্নী। রূপে-গুণে, ঔদার্যে, গাম্ভীর্যে, ধৈর্যে, ধর্মে, দয়ায়, স্বার্থত্যাগে, ব্যক্তিত্বে, কোমল চরিত্রমাধুর্যে পদ্মাবতী এই নাটকের এক চিত্তাকর্ষক ও চিত্তহারিণী নারীচরিত্র। সমগ্র নাটকে পদ্মাবতীর সগৌরব উপস্থিতি ও আভিজাত্যের ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পদ্মাবতী অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজকন্যা। ফলে তাঁর আচার-আচরণ ও স্বভাবে যে ঔদার্য, মহত্ত্ব, দয়া-দাক্ষিণ্য থাকা প্রয়োজন—তার সবগুলো গুণই পদ্মাবতীর মধ্যে বিদ্যমান। আশ্রমবাসিনী মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি জনৈকা তাপসীকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সবার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানে যাতে কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়—সে ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছাপোষণ করেন। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এই মনোভাব তাঁর মনের ঔদার্য এবং সহানুভূতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যৌগন্ধরায়ণ নিজ ভগ্নী পরিচয়ে বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর নিকট 'ন্যাসরূপে' গচ্ছিত রাখার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে পদ্মাবতী তাতে সানন্দচিত্তে সম্মত হন। কারণ কোনো প্রার্থীকে বিমুখ করা ধর্মসম্মত নয় বলেই তিনি মনে করেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়েও তাঁর চরিত্রের সহানুভূতিশীলতার দিকটি প্রকাশিত হয়।

বহুবিবাহযুক্ত সমাজব্যবস্থায় পতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর অন্য দশজনের মতোই তিনি পিতা-মাতা ও জ্ঞাতিগণের সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বিগত-দার উদয়নকে বিবাহ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি। তবে এক্ষেত্রে তিনি উদয়নের 'সানুক্রোশ' অর্থাৎ 'সহানুভূতিশীল আদর্শ পত্নীপ্রেমিক' এই গুণটিকেই প্রাধান্য দিয়ে বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়টিও তাঁর উদার প্রেমিক মনের পরিচয় বহন করে। বিবাহের পর বিদূষক বসন্তকের সঙ্গে কথোপকথনে উদয়ন পদ্মাবতীর রূপ-গুণের প্রশংসা করেও বাসবদত্তার মতো তাঁর হৃদয় জয় করতে পারেনি—এরূপ মন্তব্য করলে পদ্মাবতী উদয়ন বা বাসবদত্তা কারো প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করেননি। আশ্রিতা বাসবদত্তাকে তিনি কখনো 'আর্যা' ব্যতীত অন্যকোনো নামে সম্বোধন করেননি। বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও অনুরাগকে পদ্মাবতী প্রেমিক হৃদয়ের এক অত্যুৎকৃষ্ট গুণ হিসেবে গণ্য করেন এবং বিদুষকের মন্তব্যে রুষ্ট না হয়ে মনে মনে প্রশংসা করে বলেন :

> পদ্মাবতী – অহো সদক্খিঞ্ঞস্স জণস্স পরিজণো বি সদক্খিঞ্ঞো এব্ব হোদি (অহো সদাক্ষিণ্যস্য জনস্য পরিজনোঽপি সদাক্ষিণ্য এব ভবতি)!
>
> *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, ৪র্থ অঙ্ক[২৩]

অর্থাৎ, প্রভুর যেমন দাক্ষিণ্য, তাঁর পরিজনেরও সেই একই রকম দাক্ষিণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে পদ্মাবতীর মহৎ হৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। বাসবদত্তা যেমন, পদ্মাবতীও তেমনি বাসবদত্তার প্রতি ভগ্নীস্নেহ ও সর্বদা প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। তাই ছদ্মবেশ উন্মোচনে বাসবদত্তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে তিনি মনোক্ষুণ্ন তো হন-ই নি; বরং বাসবদত্তার প্রতি সখীজনোচিত ব্যবহার করায় নিজেকে অপরাধী মনে করে তাঁর নিকট অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন:

পদ্মাবতী – অম্হহে! অয্যা খু ইঅং! অয্যে! সহীজণসমুদাআরেণ অজাণন্তীএ অদ্দিকন্দো সমুদাআরো। তা সীসেন পসাদেমি (অহো! আর্যা খল্বিদম্! আর্যে! সখীজনসমুদাচারেণাজানন্ত্যাতিক্রান্তঃ সমুদাচারঃ। তচ্ছীর্ষেণ প্রসাদয়ামি)।

স্বপ্নবাসবদত্তম্, ৬ষ্ঠ অঙ্ক[২৪]

তাই বাসবদত্তা তাঁর দাম্পত্যজীবনে 'প্রতিদ্বন্দ্বিনী' নন; বরং জ্যেষ্ঠাভগ্নীতুল্য এবং শ্রদ্ধারই পাত্রী।

উদয়ন বাসবদত্তার প্রতি বেশি অনুরক্ত হলেও পদ্মাবতীর ভালোবাসাকে অমর্যাদা করেননি বা কখনো উদাসীনতাও দেখাননি। তাই আমরা লক্ষ করি, পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে সঙ্গে নিয়েই বাসবদত্তার গৃহ থেকে আগত কাঞ্চুকীয় এবং বাসবদত্তার ধাত্রী তথা উপমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দ্বিধা করেননি। বরং তাদের স্বজন জ্ঞানেই অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মাবতীকে আমরা একজন সার্থক কন্যা, সার্থক বধূ এবং সার্থক সপত্নী হিসেবে অভিহিত করতে পারি। তবে রাজকন্যা বা রাজভগ্নী হিসেবে বাসবদত্তার মতো পদ্মাবতীর কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা পরিদৃষ্ট হয় না। তবুও আমরা বলতে পারি, ধীর ও শান্তস্বভাবা এবং স্থান-কাল বিবেচনায় সুদক্ষা পদ্মাবতী সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সব পরিস্থিতিকেই নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে সর্বাবস্থায় নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন। তাই রাজকন্যা হিসেবে সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে, বধূ হিসেবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, বহু বিবাহযুক্ত সমাজব্যবস্থায় স্বামীর প্রতি প্রেম-অনুরাগ ও আনুগত্য প্রদর্শনে এবং সর্বোপরি সপত্নীর গৃহ-জনদের সঙ্গে সদাচরণে পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে অতিক্রম করে এক উজ্জ্বল নারীচরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তাপসী : মগধরাজ্যের আশ্রমবাসিনী তপস্বিনী তাপসী সততা, নিষ্ঠা, আনুগত্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্না এক বিশেষ নারীচরিত্র। এসব গুণাবলির জন্য আশ্রমবাসিনী অন্যান্য তপস্বিনী তাঁকে মান্য করে চলেন। তাঁর উপর অর্পিত অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপেই পালন করেন। তাঁর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে রাজকন্যা পদ্মাবতী তাঁকে 'প্রণাম' জানাতে দ্বিধা করেননি। তিনি পদ্মাবতীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়টি দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। বাসবদত্তার রূপযৌবন দেখে তিনি অনায়াসেই তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত শ্রেণির নারী হিসেবে মনে করেন। এটি তাঁর দূরদৃষ্টিতারই পরিচয় বহন করে। এছাড়া রাজা উদয়নের প্রতি তাঁর উচ্চ ধারণাপোষণ পদ্মাবতীর মনে গভীর অনুরাগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবকিছু মিলিয়ে তাপসী চরিত্রটি তৎকালীন রাজন্যবর্গ, রাজকন্যা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণত আশ্রমবাসিনী তাপসীগণ কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ। ফলে প্রচলিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্রমধারায় এদের অন্তর্ভুক্ত করা একটু কঠিন। তবে এই জাতীয় নারী স্বাবলম্বী এবং নিজস্ব শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

চেটী : আলোচ্য নাটকে চেটী মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর পরিচারিকা, শুভাকাঙ্ক্ষিণী এবং সার্বক্ষণিক সহচারিণী। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে চেটী চরিত্রটি শ্রমজীবী নারীর প্রতিনিধি। তাই আমরা দেখতে পাই, আলোচ্য নাটকে চেটী প্রভুপত্নীর মনোরঞ্জন, শুভাকাঙ্ক্ষা ও মঙ্গল কামনায় সদাব্যস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ। শুধু তাই নয়, আরো লক্ষ করা যায় যে, প্রভুপত্নীর সঙ্গে তার এক ধরনের আত্মীয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আমরা তাকে উৎফুল্লচিত্তে পদ্মাবতীর বিবাহের আয়োজনে নিয়োজিত হতে দেখি। এছাড়া বাসবদত্তার তুলনায় পদ্মাবতীর প্রতি রাজা উদয়নের কম অনুরাগের কথা জানতে পেরে চেটী মনোক্ষুণ্ন হন :

চেটী – ভট্টিদারিত্র! অদক্খিঞ্ঞো খু ভট্টা (ভর্তৃদারিকে! অদাক্ষিণ্যঃ খলু ভর্তা)।

স্বপ্নবাসবদত্তম্, ৪র্থ অঙ্ক[২৫]

অর্থাৎ, চেটী – ভর্তৃদারিকে! আপনার পতি অবশ্যই দাক্ষিণ্যবর্জিত।

এ বিষয়গুলোকে চেটীর প্রভুভক্তির উদাহরণ হিসেবেই গণ্য করা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, শ্রমজীবী নারীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা যে, তারা সাধারণত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করবেন, বিপদে-আপদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে, সুখে-দুঃখে সমব্যথী হবেন এবং সর্বোপরি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করবেন। আলোচ্য নাটকের চেটী চরিত্রটি এসব গুণাবলিরই মূর্তপ্রতীক।

পদ্মিনিকা ও মধুকরিকা : আলোচ্য নাটকে পদ্মিনিকা ও মধুকরিকা দুজনই মগধ-রাজকন্যা পদ্মাবতীর সেবিকা ও সখী। এই দুইজনই প্রভুপত্নী পদ্মাবতীর বিভিন্ন কার্য বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। তাই লক্ষ করা যায়, তারা পদ্মাবতীর 'শিরঃপীড়ায়' উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং তাঁকে সুস্থ করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরূপ কাজের মধ্য দিয়েই প্রতিপালনকারিণীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও বিনম্র আনুগত্য প্রকাশ পায়।

শ্রমজীবী শ্রেণির নারী হিসেবে পদ্মিনিকা ও মধুকরিকা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। ফলে আলোচ্য নাটকে তাদের চরিত্রের সদর্থক দিকটি প্রকাশিত হয়।

ধাত্রী : তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ধাত্রী প্রথার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের পত্নীদের সন্তান প্রসবের পর সন্তানদের মাতৃস্নেহে লালন-পালনের জন্য ধাত্রী নিয়োগ করা হতো—যাদের সাধারণত 'উপমাতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। নাট্যকার ভাস আলোচ্য নাটকে নায়িকা বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর ধাত্রী তথা উপমাতা হিসেবে দুইজন নারীচরিত্রের অবতারণা করেন। (ভাস বাসবদত্তার উপমাতার নাম বসুন্ধরা উল্লেখ করলেও পদ্মাবতীর উপমাতার নাম উল্লেখ করেননি) এই দুইজন ধাত্রী তাদের শুধু কন্যাস্নেহেই প্রতিপালন করেনি; মাতৃস্নেহ দিয়েও তাদের অভিষিক্ত করেছেন। ফলে মাতা হিসেবে তারা কন্যাদের সুখ-দুঃখের সমব্যথী ছিলেন। শুধু তাই নয়, বাসবদত্তার ছদ্মবেশ উন্মোচন এবং তাঁর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে বসুন্ধরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যা পরবর্তীকালে রাজপরিবারের সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত সহায়ক হয়।

তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধাত্রীরা শ্রমজীবী শ্রেণির বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু রাজপরিবারে দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের মাতৃভাব এবং মাতৃস্নেহ জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমরা আলোচ্য নাটকের ঘটনা পরম্পরায় এই দুই ধাত্রীর মধ্যে উপর্যুক্ত গুণাবলিই লক্ষ করি।

বিজয়া : আলোচ্য নাটকে বিজয়া নাম্নী নারীচরিত্রটিকে রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষিকা তথা প্রতিহারীর ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। রাজসংবাদ আদান-প্রদানে বিজয়া অত্যন্ত সতর্ক এবং বিশ্বস্ত। এছাড়া প্রভুর মঙ্গলামঙ্গল এবং শুভাশুভের ব্যাপারেও বিজয়া ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। এসব কারণেই প্রতিহারীরা রাজার নিকট অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। প্রতিহারীরা শ্রমজীবী শ্রেণির অন্তর্গত এবং পরিবার ও রাজকার্যে এই শ্রমজীবী নারীকেও ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভাস তাঁর *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* নাটকের পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটক রচনা করেন। ভাস তাঁর অসামান্য নাট্যপ্রতিভার দ্বারা রাজনৈতিক ঘটনাকে মানবীয় প্রেম-বিরহ, নর-নারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবরূপ প্রদানের জন্য নাট্যকলা-কৌশল প্রয়োগ করেন। ফলে নাটকটি একটি মানবিক আবেদন নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্য উদ্ধার এবং রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির জন্য বাসবদত্তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, নিজ স্বার্থকে আপাত বিসর্জন দিয়ে অন্য নারীর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ, সপত্নীদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহের ঊর্ধ্বে রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং রাজকন্যাদের প্রতিপালন, সেবা-যত্ন ও সার্বক্ষণিক সাথি হিসেবে উপমাতা, সেবিকা, সখী, পরিচারিকা চরিত্রের উপস্থাপন এবং দ্বাররক্ষিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে একজন নারীর নিয়োগ—সবকিছু মিলিয়েই *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকটি মহামতি ভাসের এক অচিন্তনীয় সৃষ্টি। নারীচরিত্র বিশ্লেষণে নারীর সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে নারীর হৃদয় থেকে উদ্বেলিত ভাবাবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা এবং সংযম সব কিছু মিলিয়ে তিনি বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর চরিত্র অঙ্কন করেন। আমরা তাই এই দুই নারীচরিত্রের সুখানুভূতিতে আনন্দিত হই, তাদের দুঃখে দুঃখিত হই। এই দুই নারীচরিত্রই যেন আমাদের সমাজের আর দশটি নারীর মতো মূর্তমান মানবীচরিত্র। অন্যান্য নারীচরিত্র রচনায় ভাস এই মানবীয় দিকগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকের প্রতিটি নারীচরিত্রই শাশ্বত ভারতীয় সমাজের আদর্শ স্থানীয়া প্রতিনিধি। তাই আমরা দেখতে পাই, ভাসের এই নাটকটি যুগ ও কালের সীমানা পেরিয়ে আজও মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে আছে।

নাট্যকার ভাস যেমন মহাকাব্যের ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন, তেমনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক ও লোককাহিনিমূলক ঘটনাবলিকে অবলম্বন করেও নাটক রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক ও লোককাহিনিমূলক নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয় একদিকে বিবাদমান রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং অন্যদিকে মানবহৃদয়ের চিরকালের আবেদন যুবক-যুবতীর প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা। এ বিষয়গুলো সর্বকালে সর্বযুগে মানবহৃদয়ে সাড়া জাগায়। ভাস হয়তো এ বিষয়টি অনুধাবন করেই *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* এবং *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটক দুটি রচনা করেন। ঐতিহাসিক কাহিনির পাশাপাশি তিনি মানবীয় প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার আবরণে নাটক দুটি উপস্থাপন করেন। নাটক দুটি পাঠে আমরা বিবাদমান রাজ্যের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে ভুলে গিয়ে নায়ক-নায়িকার প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার উপর বেশি আকৃষ্ট হই। ভাস তাঁর নাট্যপ্রতিভার দ্বারা রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে দুটি নারীহৃদয়ের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যুক্ত করে নাটক দুটিকে আরো মানবীয় করে তোলেন এবং একে আরো সার্থক করে তোলার জন্য এর সঙ্গে যুক্ত করেন আরো বেশ কিছু নর-নারীর চরিত্র।

আমরা ইতোপূর্বে নাটক দুটির প্রধান প্রধান নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করেছি। সেই আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, রাজ্য উদ্ধারের জন্য ঐতিহাসিকভাবে যেমন, তেমন নাটকেও ভাস

Dhaka University Institutional Repository

বিবাদমান রাজ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে কিংবা সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য নারীকেই ব্যবহার করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে কখনো ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে, মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে, আবার কখনো স্বার্থত্যাগ করে সপত্নীর সঙ্গে জীবন নির্বাহ করতে হয়েছে। এসবই করতে হয়েছে পুরুষের ইচ্ছায়— নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যায়নই করা হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই, রাজ্য উদ্ধারই হোক, বা অন্য যেকোনো উদ্দেশ্য সাধনই হোক, নারী এবং শুধু নারীকেই ব্যবহার করতে কিংবা নারীকে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালনকারিণী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নারীর এই ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়ে তাদের চরিত্রের প্রশংসা করা হয়েছে, আবার কখনো বা তাদের চরিত্রের প্রতি সংশয় প্রকাশ করে চারিত্রিক শুদ্ধতার পরীক্ষাও দিতে হয়েছে। সমাজে নারীর প্রতি এরূপ মনোভাব পোষণ যেন একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে নারীর প্রতিবাদ করার কোনো উপায় দেখানো হয়নি—নীরবেই তাকে এসব সহ্য করতে হয়েছে কিংবা একান্ত নিভৃতে সেবিকা, পরিচারিকা কিংবা সখীর নিকট মনোকষ্টের কথা বলতে শোনা গেছে। সমাজে যেমন, তেমনি নাটকেও নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়নি। তাই আমরা বলতে পারি, নারীকে শুধু নারী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে, কখনো মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। অতএব লক্ষ করলে দেখা যাবে, রামায়ণ এবং মহাভারতের যুগে সমাজে নারীর যে অবস্থান ছিল, ভাসের যুগেও বিশেষ করে আলোচ্য নাটক দুটিতে তার কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। ক্রমস্তর বিন্যস্ত সমাজব্যবস্থায় সমাজের অন্যান্য নারীরা তাদের স্বপেশায়ই নিয়োজিত থেকেছেন।

৫.৫ পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত নাটক :

ক. *অবিমারকম্* : আমরা ইতোপূর্বে ভাস বিরচিত রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণকথা এবং ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত নাটকের নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এখন ভাস বিরচিত পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত নাটক *অবিমারকম্* এবং *চারুদত্তম্*-এর নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ভাস বিরচিত *অবিমারক* নাটকটি মূলত দুজন নর-নারীর প্রেমকাহিনি অবলম্বনে রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ মিলনাত্মক নাটক। এই নাটকে ভাস তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, যৌবনের উন্মাদনা, দুঃসাহসিকতা, উৎকণ্ঠা, আবেগ এবং শৃঙ্গার রসে পরিপূর্ণ এক অসামান্য কল্পনার সমাহার ঘটিয়েছেন। আলোচ্য নাটকে তেরটি নারীচরিত্র : নটী, কুরঙ্গী, দেবী, সুদর্শনা, ধাত্রী, নলিনিকা, মাগধিকা, বিলাসিনী, বসুমিত্রা, হরিণিকা, সৌদামিনী, প্রতিহারী ও চেটী এবং নারদের সংলাপের মধ্য দিয়ে সৌবীররাজ-মহিষী সুচেতনা ও কুরঙ্গীর কনিষ্ঠা

ভগ্নী সুমিত্রা এবং বিদূষকের সংলাপের মাধ্যমে সাধারণ গণিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিটি চরিত্রই ভাসের হাতে যেমন পূর্ণতা পেয়েছে, তেমনি জীবন্তও হয়ে উঠেছে। আমরা নিম্নে উপর্যুক্ত বিভিন্ন স্তরের কতিপয় নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরব।

কুরঙ্গী : কুরঙ্গী *অবিমারক* নাটকের নায়িকা, রাজা কুন্তিভোজের কন্যা, সৌবীররাজের ভাগ্নি ও একই সঙ্গে পুত্রবধূ এবং সৌবীররাজপুত্র অবিমারক তথা বিষ্ণুসেনের প্রিয়তমা প্রেমিকা ও পত্নী।

কুরঙ্গী বয়সে বালিকা, রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা—এক কথায় কুরঙ্গী উদ্ভিন্নরূপযৌবনা। তার রূপ-যৌবন দ্বারা তিনি কামদেবকেও আকর্ষণ করতে সমর্থ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি যে কোনো যুবকের হৃদয় মন্দিরে স্থান পাবার উপযুক্ত। প্রথম দর্শনেই (Love at first sight) তিনি যেমন অবিমারককে ভালোবাসেন, অবিমারকও তেমনি কুরঙ্গীকে ভালোবেসে ফেলেন। এই দুই যুবক-যুবতীর প্রেম-ভালোবাসাকে নাট্যকার ভাস মানবীয় প্রেমে রূপ দিয়ে নানা অলৌকিক ও অনৈসর্গিক ঘটনার অবতারণা করেছেন। আমরা কুরঙ্গীর চরিত্রে যেমন লজ্জা ও ভয়ের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, তেমনি দেখতে পাই, অভিজাত কন্যা হিসেবে কুলীনতা ও শালীনতার বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। কুরঙ্গী-অবিমারক-নলিনিকার সংলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের উপর্যুক্ত দিকগুলো ফুটে উঠেছে :

কুরঙ্গী – (সসম্ভ্রমম্) হা হীণং চারিত্তং। ভীদক্ষি (হা হীনং চারিত্রম্। ভীতাস্মি)।

অবিমারকঃ – ... ভদ্রে! ভয়ং ত্যজ কুরুষ্ব ময়ি প্রসাদং
কিং বা প্রলপ্য বহুধা শরণাগতোঽস্মি ॥১৯॥
(কুরঙ্গী সলজ্জং নলিনিকাং বিলোকয়তি)

নলিনিকা – ভট্টিদারঅ! উট্ঠেহি উট্ঠেহি। ভট্টিদারিআ ভণাদি। উট্ঠেহি কিল (ভর্তৃদারক! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। ভর্তৃদারিকা ভণতি। উত্তিষ্ঠ কিল)।

অবিমারকম্, ৩য় অঙ্ক[২৬]

অর্থাৎ, কুরঙ্গী – (হতবিহ্বল হয়ে) ছিঃ কী করেছি! ভয় হচ্ছে আমার।

অবিমারক – ভদ্রে, ভয় পরিত্যাগ কর। আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হও। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, আমি তোমার শরণাগত হয়েছি।
(কুরঙ্গী লজ্জা পেয়ে নলিনিকার দিকে তাকাল)

নলিনিকা – প্রভু, উঠুন আপনি। ভর্তৃদারিকা (রাজকুমারী) আপনাকে উঠতে বলেছেন।

অভিজাত শ্রেণির সন্তান হয়েও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা কুরঙ্গীচরিত্রের আরেকটি দিক। প্রেমিকের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জীবন বিসর্জনের প্রাক্কালে তিনি প্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

সখী নলিনিকাকে আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। সখী-প্রীতির এমন প্রকাশ নিতান্তই বিরল।

কুরঙ্গী রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্য-লজ্জা-ভয়-প্রেম ও সখী-প্রীতির এক মূর্ত মানবীয় প্রতীক। নাট্যকার ভাস তাঁর নিপুণ হস্তে কুরঙ্গীর মতো একটি পূর্ণাঙ্গ নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভাসের *অবিমারক* নাটক পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে একটি প্রেম কাহিনিমূলক নাটক। তাই ভাস অভিজাত কন্যা কুরঙ্গীর সমাজে আর কোনো ভূমিকার কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং, প্রেম-বিরহের বাইরে কুরঙ্গীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই।

দেবী : দেবী কুন্তিভোজের মহিষী, নাটকের নায়িকা কুরঙ্গীর মাতা, সৌবীররাজের ভগ্নী এবং নাটকের নায়ক অবিমারকের শ্বশ্রূমাতা। ভাস দেবী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মাতার শাশ্বত রূপ তুলে ধরেছেন। দেবী যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ, আবার সন্তানের বিপদে-আপদেও উৎকণ্ঠিতা ও আশঙ্কিতা। এ সবই মাতৃ হৃদয়ের সহজাত বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণির মহিষীদের ঘর-সংসারের চতুর্দেওয়ালে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিবার ও সমাজে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না—সেক্ষেত্রে অবিমারক নাটকের দেবী চরিত্রটি ব্যতিক্রমভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। জামাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার দূরদর্শিতাকে রাজা গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মহিষীর কথাকে গুরুত্ব দিয়েই কন্যার বিবাহ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ব্যতীত দেবী চরিত্রের অন্যকোনো ভূমিকা অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকার কথা ভাস উল্লেখ করেননি।

সুদর্শনা : সুদর্শনা কাশিরাজ-মহিষী, কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজ-মহিষী সুচেতনার ভগ্নী, নাটকের নায়ক অবিমারক তথা বিষ্ণুসেন ও জয়বর্মার মাতা এবং নায়িকা কুরঙ্গীর প্রকৃত শ্বশ্রূমাতা। দেবীর মতো সুদর্শনাও ভারতীয় সমাজের শাশ্বত মাতার গুণের আধার। এ ছাড়াও সুদর্শনা ভগ্নীপ্রেমের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভগ্নী সুচেতনার পুত্রের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত ভগ্নীর শোক নিবারণের লক্ষ্যে পুত্র অবিমারককে তার হাতে সমর্পণ করেন। দীর্ঘকাল পরে পুত্রের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হন এবং হৃষ্টচিত্তে পুত্র অবিমারকের কুরঙ্গীর সঙ্গে গান্ধর্বমতে বিবাহকে স্বীকার করে নেন—যা তার উদার চিত্তের পরিচয় বহন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা পারিবারিকক্ষেত্রেই শুধু সুদর্শনার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করি।

Dhaka University Institutional Repository

ধাত্রী : *অবিমারক* নাটকে ধাত্রী জয়দা কুরঙ্গীর উপমাতা। তৎকালীন সমাজে ধাত্রীমাতাদের রাজপরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সন্তান লালন-পালনের মধ্য দিয়ে ধাত্রীদের মধ্যে যে অপত্যস্নেহ মনের নিভৃতে গড়ে উঠে—তারই ফলশ্রুতিতে তারা সন্তানদের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্টা হন এবং তাদের শুভাশুভের ব্যাপারে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। আলোচ্য নাটকের জয়দা সেরকমই একজন ধাত্রী। কুরঙ্গীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার কারণে কুরঙ্গীর প্রেমিকার বংশপরিচয় জানার জন্য তিনি উদ্বিগ্না হন এবং কুরঙ্গীর প্রেমিক উচ্চবংশীয় নিশ্চিত হয়ে বিবাহে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। এছাড়া কন্যাসম কুরঙ্গীর মনের অবস্থা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেই অবিমারকের সঙ্গে তার মিলনের ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়টিও তার মাতৃহৃদয়ের প্রতিফলন। শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ হয়েও অভিজাত সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনে তাদের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান তৎকালীন সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

এছাড়া আলোচ্য নাটকে রাজকুমারী কুরঙ্গীর চারজন পরিচারিকার উল্লেখ রয়েছে: নলিনিকা, মাগধিকা, বিলাসিনী ও চন্দ্রিকা। এই চারজন পরিচারিকারই রাজকুমারীর প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত এবং রাজকুমারীর পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়। অনিন্দ্যসুন্দরী কুরঙ্গীর নান্দনিক শোভাবর্ধনের দায়িত্ব নলিনিকা, মাগধিকা ও বিলাসিনীর উপর অর্পিত হয়েছিল। তাই বলা যায়, তৎকালীন সমাজে শ্রমজীবী নারীর মধ্যে বেশ কিছু নারীর যে নান্দনিক উপলব্ধি ছিল বা নান্দনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল—সে বিষয়টি নায়িকা কুরঙ্গীর প্রসাধন-সহায়িকা নিয়োগের মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয়। এছাড়া নলিনিকা যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন, বিরহকাতর কুরঙ্গী প্রেমিক বিরহে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন এবং তার এই উপলব্ধিও নির্ভুল হয়।

এক্ষেত্রে তার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, একজন নারী হিসেবে প্রেমিক অবিমারকের সঙ্গে রাজকন্যা কুরঙ্গীর মিলনের ক্ষেত্রেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে তৎকালীন শ্রমজীবী শ্রেণির নারীদের রাজা, রাজ-মহিষী অথবা রাজকন্যার প্রতি আন্তরিকতা, আনুগত্য, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং নান্দনিক জ্ঞানের বিষয়গুলো জানা যায়। তাই রাজ পরিবারে তাদের ভূমিকা কোনো ভাবেই উপেক্ষণীয় নয়।

আলোচ্য নাটকে নটী ও কেতুমতী নামে প্রতিহারীর ভূমিকা ভাসের অন্যান্য নাটকের মতোই। এছাড়াও বসুমিত্রা ও হরিণিকা নামে দেবীর দুইজন পরিচারিকা এবং বিদ্যাধরের প্রিয়তমা সৌদামিনী নামে উল্লিখিত নারীচরিত্রসমূহের তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা যায় না। তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে গণিকা প্রথা প্রচলন থাকার কথাও ভাস উক্ত নাটকে বিদূষকের সংলাপের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, *অবিমারক* নাটকটি ভাসের একটি অবিমিশ্র প্রেমকাহিনি। এই কাহিনির মধ্য দিয়ে ভাস তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, রাজকন্যা কুরঙ্গীর প্রেমিকের বংশপরিচয় জানার জন্য রাজ পরিবারের সদস্যরা যেমন, তেমনি ধাত্রী পরিচারিকারাও উদ্‌গ্রীব। এথেকে বোঝা যায়, মানুষে মানুষে এই সামাজিক বিভাজন তৎকালীন সমাজে স্বীকৃত ছিল এবং সে অনুসারে তাদের কাজের পরিসীমাও সুনির্দিষ্ট ছিল। *অবিমারক* নাটকের সকল নারীচরিত্রই শুধু পারিবারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। তাদের কোনো আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থাকার কথা জানা যায় না।

খ. *চারুদত্তম্* : ভাস বিরচিত *চারুদত্তম্* নাটকে মোট নারীচরিত্রের সংখ্যা সাতটি : নটী, গণিকা, ব্রাহ্মণী, রদনিকা, মদনিকা, চেটী ও বিচ্ছিত্তিকা এবং গণিকা বসন্তসেনা ও চেটীর সংলাপের মধ্য দিয়ে বসন্তসেনার মাতা এবং বসন্তসেনার সংলাপের মধ্য দিয়ে পরভৃতিকা ও শারিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আমরা নিম্নে *চারুদত্তম্* নাটকের উল্লিখিত চরিত্রসমূহের মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করব।

বসন্তসেনা : বসন্তসেনা ভাসের *চারুদত্ত* নাটকের নায়িকা, পেশায় গণিকা; কিন্তু আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্না, শিল্পকলায় পারদর্শিনী, সূক্ষ্ম রুচিবোধসম্পন্না, উদারমনের অধিকারিণী, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্না, সমাজ সচেতনতা প্রভৃতি মানবিক গুণের অধিকারিণী এক বিদুষী নারীচরিত্র। তার রূপ-যৌবন যেমন ছিল ঈর্ষণীয়, তেমনি সম্পদ-ঐশ্বর্যে তৎকালীন সমাজে তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। ধনে-জনে-যৌবনে-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হলেও তিনি ছিলেন 'পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ প্রেমাকাঙ্ক্ষার' এক বাস্তব নারীচরিত্র। সমাজের এক উপেক্ষিত বেশ্যাবংশে জন্মগ্রহণ করেও এরূপ নারীচরিত্র সমাজে শুধু বিরলই নয়; এক আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বসন্তসেনা ভাসের অভূতপূর্ব কল্পনাশক্তির সমাজের এক ব্যতিক্রমী নারীচরিত্র।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বেশ্যাবংশে জন্মগ্রহণকারিণী নারীদের প্রতি যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়, ভাস বসন্তসেনার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই দৃষ্টিভঙ্গির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। একজন গণিকার কাছে অর্থ উপার্জনের জন্য যেকোনো পুরুষের কাছে উপগত হওয়াই প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু বসন্তসেনা সেই নিয়মকে ভেঙ্গেছেন। তিনি বেশ্যাবংশে জন্মগ্রহণের জন্মযন্ত্রণার অভিশাপ দূরে ঠেলে দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপরিচয়ের বিষয়টিকে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। বসন্তসেনা গণিকা, তবে জন্মদোষে; স্বভাবে নয়। নিম্নোক্ত সংলাপে এ বিষয়টি প্রকাশিত হয় :

গণিকা – ভোদু ভোদু। বিস্সখো ভোদু অয্যো। গণিআ খু অহং (ভবতু ভবতু। বিশ্বস্তো ভবত্বার্যঃ। গণিকা খল্বহম্)।

সংবাহকঃ – অভিজণেণ। ণ সীলেণ (অভিজনেন। ন শীলেন)।

চারুদত্তম্, ২য় অঙ্ক[২৭]

তাই আমরা বলতে পারি, উজ্জয়িনীর সেরা সুন্দরী বসন্তসেনা শুধু শারীরিক সৌন্দর্যেই সুন্দরী নয়; মনে-প্রাণে, স্বভাবে-আচরণেই তিনি সর্বাঙ্গীন সুন্দরী।

বসন্তসেনা প্রেমিক— প্রেমিকের হৃদয় নিয়েই তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। তার কাছে জগৎ জীবন আবির্ভূত হয়েছে সৌন্দর্যের আলোকছটায়। তাই প্রেমিক নির্বাচনে তিনি এমন এক মানুষকে নির্বাচন করেছেন— যে মানুষটি দরিদ্র; অথচ মানবীয় গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। আর দরিদ্র বিধায় লোকে তাকে অপবাদও দিতে পারে না। সে কারণেই বসন্তসেনা বলেছেন :

গণিকা – রমিদুং ইচ্ছামি, ন সেবিদুং (রন্তুমিচ্ছামি, ন সেবিতুম্)। ... অত্থি সত্থবাহপুত্তো চারুদত্তো ণাম (অস্তি সার্থবাহপুত্রশ্চারুদত্তো নাম)। ... অদো খু কামীঅদি। অদিদরিদ্দপুরুসসত্তা গণিআ অবঅণীআ হোই (অতঃ খলু কাম্যতে। অতিদরিদ্রপুরুষসক্তা গণিকা অবচনীয়া ভবতি)।

চারুদত্তম্, ২য় অঙ্ক[২৮]

বসন্তসেনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবনের সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাই দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আকর্ষণ তাকে নবজীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। এই স্বপ্নই তাকে প্রার্থিব সব আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে অপ্রার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ফলে বসন্তসেনা রাজশ্যালকের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ফিরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হননি, কিংবা বিলম্বও করেননি।

সমাজ-সংসারের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে তিনি যেমন সজাগ ছিলেন, তেমনি ঔচিত্য ও অনৈচিত্যের প্রশ্নেও তিনি সচেতন ছিলেন। তাই প্রেমিক চারুদত্তের গৃহে আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করলেও এক ধরনের অপরাধবোধ অনুভব করেছেন :

গণিকা – (আত্মগতম্) অভাইণী অহং অব্ভন্তরপ্পবেস্স (অভাগিন্যহমভ্যন্তরপ্রবেশস্য)।

চারুদত্তম্, ১ম অঙ্ক[২৯]

অর্থাৎ, গণিকা – (স্বগত) অন্দরে প্রবেশ করি, সে ভাগ্য আমার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বসন্তসেনা যেমন আত্মমর্যাদার প্রতি সজাগ, তেমনি সমাজের উঁচু-নিচু স্তরভেদে সকলের প্রতি মর্যাদা দিতে তিনি সদা প্রস্তুত। তাই পরিচারিকা মদনিকার প্রণয়কে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে 'আর্যা' বলে সম্বোধন করে সম্মানিত করেছেন। বসন্তসেনা সৌন্দর্যপিয়াসী। তার গৃহ অপরূপ শিল্পকর্মে সুসজ্জিত এবং নৃত্য, গীত, শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছিল তার গৃহের নিত্যদিনের আয়োজন। এ সবই তার পরিশীলিত মন-মননের পরিচয় দান করে। নারী হলেও বসন্তসেনা অবলা নন। তাই দুর্বৃত্তের আক্রমণে তার উচ্চারিত বাক্য :

... এথ্থং সঅং এব অপ্পা রক্‌খিদব্বো (অত্র স্বয়মেবাত্মা রক্ষিতব্যঃ)।

চারুদত্তম্, ১ম অঙ্ক[৩০]

অর্থাৎ, এখানে তবে নিজেরই নিজ-সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বসন্তসেনাকে একজন মানবিক গুণ সম্পন্না নারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বসন্তসেনা তৎকালীন সমাজের সৃষ্ট হলেও সমাজ-উত্তীর্ণা নারী। গণিকা বংশে জন্মগ্রহণ করে তিনি একটি সুখী-সুন্দর পারিবারিক জীবনের প্রত্যাশা করেছেন—যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দরিদ্র অথচ প্রেম-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ চারুদত্তের মতো সৎ, উদার ও মহৎ চরিত্রের মানুষ। বসন্তসেনা সংস্কৃতিমনা। তার গৃহের সাজ-সজ্জা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তারই প্রমাণ। শুধু তাই নয়, বর্ণ ও কর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ যে সমান মর্যাদার অধিকারী বসন্তসেনার দাস-দাসীদের প্রতি আচরণ সেই চিরসত্যকেই তুলে ধরে। অগাধ সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করেও মার্জিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত বসন্তসেনা তাই সেই সমাজের এক অতুলনীয়া নারী।

ব্রাহ্মণী : ব্রাহ্মণী *চারুদত্ত* নাটকের নায়ক এবং উজ্জয়িনী নগরের অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব উদারচিত্তের অধিকারী চারুদত্তের সহধর্মিণী। নাটকে তার উপস্থিতি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও নিজস্বার্থের বিনিময়ে অর্থাৎ, নিজের সম্পদের বিনিময়ে তিনি স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে বসন্তসেনাকে মায়ের দেওয়া মুক্তাহার প্রদান করেন। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম এবং আনুগত্যই এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। অন্যের গচ্ছিত সম্পদ সুরক্ষার দায়িত্ব স্বামী চারুদত্তের হলেও তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় মাতৃস্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ মুক্তাহারটি দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। এটি তার একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলেই মনে করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ব্রাহ্মণীকে যেমন একজন পতিব্রতা নারী বলে আখ্যায়িত করতে পারি, তেমনি পরিবার ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

রদনিকা : রদনিকা আলোচ্য নাটকের নায়ক চারুদত্তের বিশ্বস্ত পরিচারিকা, শুভার্থিনী এবং তার (চারুদত্ত) শুভাশুভের প্রতি সদা সতর্ক। এ ছাড়া একনিষ্ঠ আনুগত্য এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে সদা ক্রিয়াশীল। শুধু তাই নয়, আত্মমর্যাদা এবং পর দ্রব্যের প্রতি লোভ-লালসাহীন এক অনবদ্য নারীচরিত্র এই রদনিকা।

রদনিকার উপর্যুক্ত চারিত্রিক গুণাবলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, তৎকালীন সমাজের নিচুস্তর ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এসব গুণাবলি এক অনন্য সাধারণ উদাহরণ। তাই আমরা রদনিকাকে একজন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরত্ব আরোপ করব। সমাজ-সংসার-পরিবারে রদনিকার মতো শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। তাই রদনিকা ভাসের সৃষ্ট শ্রমজীবী সমাজের এক অনন্য নারীচরিত্র।

মদনিকা, চতুরিকা ও বিচ্ছিত্তিকা : মদনিকা, চতুরিকা ও বিচ্ছিত্তিকা আলোচ্য নাটকের নায়িকা বসন্তসেনার অত্যন্ত বিশ্বস্তা ও নির্ভরযোগ্য পরিচারিকা। এই তিনজনের মধ্যে মদনিকার সঙ্গে বসন্তসেনার এক আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠে—যে কারণে বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি তার আকর্ষণ ও ভালোবাসার কথা নিঃসঙ্কোচে মদনিকাকে বলতে দ্বিধা করেননি। মদনিকা-সজ্জলকের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কথা জেনে প্রেমিক মনের অধিকারিণী বসন্তসেনা নিজ অলংকারে সজ্জিত করে মদনিকাকে প্রেমাস্পদের হাতে সমর্পণ করে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রেমের মর্যাদা দেন। প্রভু-ভৃত্যের পরস্পরের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস মদনিকা যেমন তার আচার-আচরণ ও সেবা-যত্নের দ্বারা অর্জন করেছেন, তেমনি বসন্তসেনাও তার কাজকর্মে পরম আস্থাস্থাপন করে নিজ হৃদয়ের কথা তাকে বলেছেন।

পরিচারিকা চতুরিকা যেমন চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগের কথা জেনে খুশি হয়েছেন, তেমনি মদনিকা-সজ্জলকের প্রণয় ও মিলনকে উদারচিত্তে গ্রহণ করে আবেগে-আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছেন। চতুরিকার চরিত্রের এই উদারতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাই আমরা দেখি, বসন্তসেনা-চারুদত্তের

Dhaka University Institutional Repository

অভিসারে চতুরিকার সহযাত্রী হওয়ার বিষয়টি তার প্রতি বসন্তসেনার আস্থা ও বিশ্বস্ততারই পরিচয় বহন করে।

বিচ্ছিত্তিকা বসন্তসেনার অন্যতম পরিচারিকা হলেও আলোচ্য নাটকে তার কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় না।

মদনিকা ও চতুরিকার চরিত্রের উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তৎকালীন সামাজিক স্তরবিন্যস্ত সমাজে প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠা কোনো অসম্ভব কিছু ছিল না। তাছাড়া প্রচলিত দাসপ্রথা থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টিও এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য দিক এবং মদনিকার মুক্তজীবন তারই ইঙ্গিত বহন করে।

আলোচ্য নাটকের নটী চরিত্রটি ভাসের অন্যান্য নাটকের নটী চরিত্রেরই অনুরূপ। এই নাটকেও নটী সূত্রধার-পত্নী এবং সূত্রধারের সঙ্গে তার সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা। এছাড়া নটীর আর কোনো ভূমিকার কথা জানা যায় না।

ভাস বিরচিত নাটকসমূহের মধ্যে *চারুদত্ত* নাটকটি সব দিক থেকেই শুধু ব্যতিক্রম নয়; অনন্য সাধারণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ভাস তাঁর কবি-কল্পনায় তৎকালীন সমাজের প্রথাসিদ্ধ ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে মুক্ত ও উদারচিত্তে *চারুদত্ত* নাটকটি রচনা করেন। প্রচলিত নাটকসমূহে রাজা ও রাজপরিবার এবং তাঁদের রাজকার্য, রাজজীবন ও প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা নিয়ে যে গণ্ডিবদ্ধ জীবনালেখ্য রচিত হতো—তা থেকে বেড়িয়ে আসার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ভাস গ্রহণ করেছেন আলোচ্য নাটকে। তাই রাজা নয়; রাজবধূ নয়; কিংবা রাজকন্যা-রাজপুত্রও নয়; সমাজের একেবারে উপেক্ষিত, অবহেলিত মানুষকে বিশেষ করে গণিকা বংশীয়া এক নারীকে নাটকের প্রধান চরিত্রে স্থান করে দিয়ে তিনি প্রথাসিদ্ধ ব্যবস্থাকে অতিক্রম করার সাহস দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়; রূপে-গুণে মাধুর্যে-ঐশ্বর্যে এবং উদারতায় তাকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। এছাড়াও নাটকের পারিপার্শ্বিক চরিত্রসমূহ এই সাধারণ মানুষ এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনকে আবর্তন করেই নাটকটি গড়ে উঠেছে। ভাস-পূর্ব নাটকে যা লক্ষ করা যায়নি, ভাস সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে এমন একটি নাটক আমাদের উপহার দিয়েছেন। বসন্তসেনা গণিকা বংশোদ্ভূত এক পরিশীলিতা ও মার্জিতা নারী। ভারতীয় শাশ্বত নারীর যে আশা-আকঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, ঘর বাঁধার স্বপ্ন তথা পারিবারিক জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই বসন্তসেনার মধ্যে বিরাজমান। একজন নারীর জীবনের আকাঙ্ক্ষা তার স্বামী

Dhaka University Institutional Repository

হবেন সৎ, চরিত্রবান, উদার ও মহৎ এবং সর্বোপরি তাঁর মধ্যে থাকবে এক প্রেমিক হৃদয়—যে প্রেম তাদের জীবনকে করবে মধুর ও মহীয়ান। আর সে-কারণেই রূপ-যৌবন ও ঐশ্বর্যের অধিকারিণী বসন্তসেনা চারুদত্তের মতো একজন মহান প্রেমিক মানুষকে নিজ জীবনের সঙ্গী করতে ব্যাকুল হয়েছিলেন। দেহ-মন-প্রাণ সবকিছু তাঁকে উৎসর্গ করার বাসনায় আকুল হয়েছিলেন। বসন্তসেনার প্রেমিকহৃদয় এ কারণেই মদনিকার প্রেমের সার্থক পরিণতিতে উদ্বেলিত হয়েছে এবং তাদের মিলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তাই নয়, দাসজীবনের করুণ অবস্থা থেকেও মদনিকাকে মুক্ত করতে তিনি ভুলে যাননি। ঠিক এর পাশাপাশি সর্বনাশা জুয়াখেলায় নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত সংবাহককে মুক্ত করার প্রয়াসে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। বসন্তসেনার এই উদার মনোভাব সমাজে প্রশংসার দাবি রাখে। সবকিছু মিলিয়ে বসন্তসেনা চরিত্রটি ভাসের অনবদ্য সৃষ্টি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মহামতি ভাসের পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত উপর্যুক্ত *অবিমারকম্* ও *চারুদত্তম্* নাটক দুটি বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপটের দিক থেকে ভিন্ন মাত্রাবিশিষ্ট। মানবীয় জীবনের শাশ্বত ও চিরন্তন প্রেমের কাহিনি অবলম্বন করে ভাস নাটক দুটি অপূর্ব কলাকৌশলে উপস্থাপন করেছেন। দুটি নাটকেই প্রেম প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও এ প্রেমকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রের কিছুটা দিক উন্মোচিত হয়েছে।

৫.৬ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, অশ্বঘোষ পরবর্তী এবং কালিদাস পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য নাট্যসাহিত্য রচিত হয়েছে—তার মধ্যে নাট্যকার ভাস স্বমহিমায় প্রদীপ্ত এবং কাব্য প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। সংখ্যার দিক থেকে যেমন, তেমনি বিষয় বৈচিত্র্য, চরিত্র উপস্থাপন এবং সংযত সংলাপ প্রয়োগে ভাস একটি স্বতন্ত্রযুগের সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, ভাস-পরবর্তী প্রায় সকল নাট্যকার ভাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে ভাস আজও আমাদের মধ্যে স্মরণীয়, বরণীয় ও চিরজাগরূক হয়ে আছেন। আর এটি সম্ভব হয়েছে ভাস বিরচিত তেরটি নাট্যকর্ম আবিষ্কারের ফলে—যার জন্য আমরা মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রীর নিকট ঋণী।

আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভাস বিরচিত তেরটি নাটকের সমাজের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করেছি। ভাস তাঁর নারীচরিত্র বিনির্মাণে অপূর্ব শিল্পরীতি প্রয়োগ করে একজন দক্ষ কারিগরের মতো প্রতিটি

Dhaka University Institutional Repository

নারীচরিত্রকে মানবীয় চরিত্র তথা প্রতিটি নারীচরিত্রকে বাস্তব রক্তমাংসে গড়া নারীচরিত্রে রূপায়িত করেছেন। তাই মনে হয়, ভাসের নাটকের নারীচরিত্রসমূহ যেন আমাদের সমাজেরই মূর্তমান নারীচরিত্রের প্রতিনিধি। এ কারণেই আমরা ভাসের প্রতিটি নারীচরিত্রর সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, আনন্দ-উল্লাসে যেমন আনন্দিত হই, তেমনি ব্যথিতও হই। তাই আমরা বলতে পারি, ভাস একজন জীবনঘনিষ্ঠ নাট্যকার। এই জগৎ এবং জীবনের বাস্তব কাহিনি তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য। ভাসের এই প্রতিভা শুধুমাত্র রামায়ণ রচয়িতা আদিকবি বাল্মীকির সঙ্গে তুলনীয়। বাল্মীকি যেমন দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন, ভাসও ঠিক বাল্মীকির মতোই দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে সু-উচ্চ মহিমায় নিজের অবস্থান বজায় রেখেছেন।

আমরা আলোচনার সুবিধার্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ভাস বিরচিত নাট্যসাহিত্যের শ্রেণিকরণকে আরেকটু পরিশীলিত আকারে নিম্ন সারণির সাহায্যে তুলে ধরতে পারি :

সারণি -১

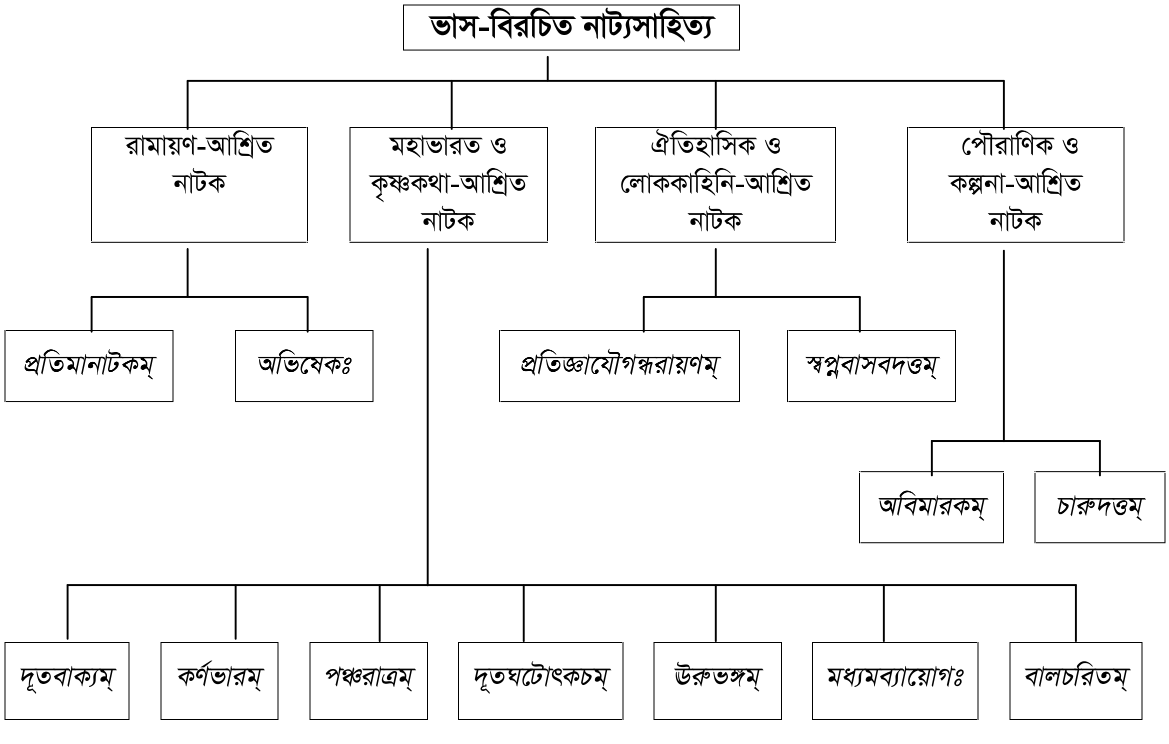

আমরা বর্তমান অধ্যায়ে ভাসের উপর্যুক্ত নাটকসমূহের নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনাকালে প্রতিটি নাটকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত এবং অন্যচরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত নারীচরিত্রসমূহকে নিম্নভাবে উপস্থাপন করছি।

সারণি-২

ভাসের নাট্যসাহিত্যে প্রত্যক্ষ ও সংলাপে উপস্থাপিত নারীচরিত্রসমূহ

ক্রমিক নং	নাটকের নাম	প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত নারীচরিত্র	সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত নারীচরিত্র
১.	*প্রতিমানাটকম্*	১১টি	৪টি
২.	*অভিষেকঃ*	৩টি	৩টি
৩.	*দূতবাক্যম্*	নেই	১টি
৪.	*কর্ণভারম্*	নেই	২টি
৫.	*পঞ্চরাত্রম্*	নেই	১২টি
৬.	*দূতঘটোৎকচম্*	৩টি	২টি
৭.	*উরুভঙ্গম্*	৩টি	৪টি
৮.	*মধ্যমব্যায়োগঃ*	২টি	নেই
৯.	*বালচরিতম্*	৯টি	৬টি
১০.	*প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*	৩টি	৬টি
১১.	*স্বপ্নবাসবদত্তম্*	৯টি	৫টি
১২.	*অবিমারকম্*	১৩টি	৩টি
১৩.	*চারুদত্তম্*	৭টি	৩টি
	মোট	৬৩টি	৫১টি

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরতে আমরা শুধুমাত্র সমাজের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীর অবস্থা ও অবস্থানই আলোচনা করেছি যা সারণি-৩ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো :

সারণি-৩

ভাসের নাট্যসাহিত্যের আমাদের আলোচিত নারীচরিত্রের সংখ্যা

ক্রমিক নং	নাটকের নাম	আলোচিত নারীচরিত্রের সংখ্যা
১.	*প্রতিমানাটকম্*	১২টি
২.	*অভিষেকঃ*	৩টি
৩.	*দূতবাক্যম্*	১টি
৪.	*কর্ণভারম্*	নেই
৫.	*পঞ্চরাত্রম্*	১টি
৬.	*দূতঘটোৎকচম্*	৩টি
৭.	*উরুভঙ্গম্*	৩টি
৮.	*মধ্যমব্যায়োগঃ*	২টি
৯.	*বালচরিতম্*	৩টি
১০.	*প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*	৩টি
১১.	*স্বপ্নবাসবদত্তম্*	৯টি
১২.	*অবিমারকম্*	১৪টি
১৩.	*চারুদত্তম্*	৭টি
	মোট	৬১টি

উপর্যুক্ত সারণির আলোকে আমরা ভাসের সর্বমোট ৬১টি উল্লেখযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ভাস বিরচিত মহাভারত-আশ্রিত তিনটি নাটক যথাক্রমে *দূতবাক্যম্*, *কর্ণভারম্* ও *পঞ্চরাত্রম্*-এ প্রত্যক্ষভাবে কোনো নারীচরিত্র উল্লিখিত হয়নি, তবে উক্ত তিনটি নাটকেই অন্যের সংলাপের মাধ্যমে উল্লিখিত নারীচরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তিনটি নাটকের সংলাপে উল্লিখিত চরিত্রসমূহের মধ্যে আমরা *দূতবাক্য* থেকে ১টি এবং *পঞ্চরাত্র* থেকে ১টি নারীচরিত্র আলোচনা করেছি। *কর্ণভার* থেকে কোনো নারীচরিত্র আলোচিত হয়নি। ভাসের নাটকের উল্লেখযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্রসমূহে অবস্থা ও অবস্থান আমরা নিম্ন সারণির সাহায্যে তুলে ধরতে পারি :

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪

ভাসের নাট্যসাহিত্যের আলোচিত নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক্রমিক নং	নাটকের নাম	রাজমহিষী বা রাজবধূ	রাজকন্যা	সখী ও সেবিকা	পরিচারিকা বা দাসী	ধাত্রী	প্রতিহারী	নটী	তাপসী	ব্রাহ্মণী	গণিকা	বিদ্যাধরী
১.	*প্রতিমানাটকম্*	১. সীতা ২. কৌশল্যা ৩. কৈকেয়ী ৪. সুমিত্রা		১. অবদাতিকা	১. বিজয়া ২. নন্দিনিকা ৩. চেটী ৪. মন্থরা (সংলাপে উল্লিখিত চরিত্র)		১. বিজয়া	১.নটী	১.তাপসী			
২.	*অভিষেকঃ*	৫. সীতা ৬. তারা (বানরী)					২. বিজয়া (রাক্ষসী)					
৩.	*দূতবাক্যম্ (নারীচরিত্র-বিহীন)*	৭. দ্রৌপদী (সংলাপে উল্লিখিত চরিত্র)										
৪.	*কর্ণভারম্ (নারীচরিত্র-বিহীন)*											
৫.	*পঞ্চরাত্রম্ (নারীচরিত্র-বিহীন)*		১. উত্তরা (সংলাপে উল্লিখিত চরিত্র)									
৬.	*দূতঘটোৎকচম্*	৮. গান্ধারী	২. দুঃশলা				৩. প্রতিহারী					
৭.	*ঊরুভঙ্গম্*	৯. গান্ধারী ১০. মালবী ১১. পৌরবী										

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক্রমিক নং	নাটকের নাম	রাজমহিষী বা রাজবধূ	রাজকন্যা	সখী ও সেবিকা	পরিচারিকা বা দাসী	ধাত্রী	প্রতিহারী	নটী	তাপসী	ব্রাহ্মণী	গণিকা	বিদ্যাধরী
৮.	*মধ্যমব্যায়োগঃ*	১২. হিড়িম্বা (রাক্ষসী)								১. ব্রাহ্মণী		
৯.	*বালচরিতম্*		৩. দেবকী			১. ধাত্রী	৪. যশোধরা					
১০.	*প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*	১৩. অঙ্গারবতী					৫. বিজয়া	২. নটী				
১১.	*স্বপ্নবাসবদত্তম্*	১৪. বাসবদত্তা ১৫. পদ্মাবতী		২. পদ্মিনিকা ৩. মধুকরিকা	৪. চেটী	২. বসুন্ধরা ৩. ধাত্রী	৬. বিজয়া		২.তাপসী			
১২.	*অবিমারকম্*	১৬. দেবী ১৭. সুদর্শনা	৪. কুরঙ্গী		৫. নলিনিকা ৬. মাগধিকা ৭. বিলাসিনী ৮. চন্দ্রিকা ৯. বসুমিত্রা ১০. হরিণিকা	৪. জয়দা	৭. কেতুমতী	৩. নটী			১. সাধারণ গণিকা (সংলাপে উল্লিখিত চরিত্র)	১.সৌদামিনী
১৩.	*চারুদত্তম্*				১১. রদনিকা ১২. মদনিকা ১৩. চেটী ১৪. বিচ্ছিত্তিকা			৪. নটী		২. ব্রাহ্মণী	২.বসন্তসেনা	

Dhaka University Institutional Repository

ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহের উপর্যুক্ত পারিবারিক অবস্থার আলোকে আমরা আমাদের আলোচিত নারীচরিত্রসমূহকে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার স্তরবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান দুইভাগে বিভাজিত করতে পারি :

সারণি-৫

ভাসের নাট্যসাহিত্যের আলোচিত নারীচরিত্রসমূহের সামাজিক স্তরবিন্যাস

অভিজাত শ্রেণি	শ্রমজীবী শ্রেণি
সীতা	অবদাতিকা
কৌশল্যা	বিজয়া (পরিচারিকা)
কৈকেয়ী	নন্দিনিকা
সুমিত্রা	চেটী
তারা (বানরী)	মন্থরা
দ্রৌপদী	নটী
গান্ধারী	তাপসী
মালবী	বিজয়া (রাক্ষসী প্রতিহারী)
পৌরবী	প্রতিহারী
হিড়িম্বা (রাক্ষসী)	ব্রাহ্মণী
অঙ্গারবতী	ধাত্রী
বাসবদত্তা	যশোধরা
পদ্মাবতী	বিজয়া (প্রতিহারী)
দেবী	পদ্মিনিকা
সুদর্শনা	মধুকরিকা
উত্তরা	বসুন্ধরা
দুঃশলা	নলিনিকা
দেবকী	মাগধিকা
কুরঙ্গী	বিলাসিনী
	চন্দ্রিকা
	বসুমিত্রা
	হরিণিকা
	জয়দা
	কেতুমতী
	সাধারণ গণিকা
	সৌদামিনী
	রদনিকা
	মদনিকা
	বিচ্ছিত্তিকা
	বসন্তসেনা

উপর্যুক্ত সারণিগুলো থেকে আমরা ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহের একটি অপেক্ষাকৃত অবস্থা ও অবস্থানের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বলা যায়, আমাদের এই সারণিগুলো বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি নির্যাসমূলক রূপরেখা। আমরা পূর্বেই

আলোচনা করেছি যে, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভাস রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথা, ঐতিহাসিক, লোককাহিনি, পৌরাণিক ইত্যাদি কাহিনি থেকে যে ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বন করে যে নাট্যসাহিত্য রচনা করেছেন তা একদিকে যেমন তৎকালীন সমাজের বাস্তব নারীচরিত্রের প্রতিফলন এবং একই সঙ্গে সে নারীচরিত্রসমূহ আমাদের সমাজের বিভিন্ন নারীচরিত্রের মধ্যে নানা আকারে ও প্রকারে প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাই আমরা ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহকে আজও জীবন্তরূপেই দেখতে পাই, আর ভাসের কৃতিত্ব এই নারীচরিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঠিক একইভাবে ভাসের নাট্যসাহিত্যের কল্পনা-আশ্রিত নাটকের নারীচরিত্রসমূহও অনুরূপ জীবন্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ভাস পর্যন্ত আমরা যে নারীচরিত্রসমূহের আলোচনা করেছি, তাতে লক্ষ করেছি যে, অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীরা যেমন, তেমনি শ্রমজীবী নারীরাও সমাজের গড্ডলিকা প্রবাহের মতো পরিবারকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীরা তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেছেন যা শ্রমজীবী নারীদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। তবে উভয় শ্রেণির নারীরাই তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজের অনুশাসনে নিগূঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। সমাজ তাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশে তেমন কোনো সুযোগ দেয়নি; কিংবা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যও দেওয়া হয়নি। তারা প্রতি পদে পদে শৃঙ্খলিত। এই শৃঙ্খল ভাঙার প্রচেষ্টা তারা নিজেরা যেমন করেননি, তেমনি সমাজও এই শৃঙ্খলা ভাঙার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। তাই সাধারণভাবে লক্ষ করা যায়, ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীরা পারিবারিক শৃঙ্খলেই আবদ্ধ, পরিবারের বাইরে সমাজজীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, কিংবা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা একেবারেই অনুপস্থিত। অবশ্য ব্যতিক্রমভাবে দুই-একজন নারী, যেমন, রানি কৈকেয়ী, দাসী মন্থরা কিংবা বসন্তসেনার মতো গণিকারা জীবনের ধারাবাহিকতায় ও জীবন পরিক্রমায় অল্প সময়ের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামান্য ভূমিকা রেখেছেন।

বেদ পরবর্তী আনুমানিক দুই থকে আড়াই হাজার বছর পর বিশাল প্রতিভার অধিকারী, মানবজীবনের রূপকার এবং অভূতপূর্ব কল্পনাশক্তির অধিকারী ভাসও নারীর এই শৃঙ্খলিত জীবনকে মুক্ত করার কোনো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তবে কল্পনায় তিনি বসন্তসেনার মতো গণিকাকে নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে নায়িকার আসন দিয়ে একটি সাহসী ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাই আমরা বলতে পারি, নারীর জীবনে এই অচলায়তন সীমারেখা শৃঙ্খলিতই থেকেছে এবং ভাসের নাট্যসাহিত্যও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ভাস, 'প্রতিমানাটকম্' *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২-৩৬৩

৬. ভি. বেঙ্কটাচলম্, *ভাস*, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদ), সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ৮০-৮১

৭. ভাস, 'প্রতিমানাটকম্' *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

১১. ভাস, 'অভিষেকঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ২৩২

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩০

১৪. ভাস, 'দূতবাক্যম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

১৫. ভাস, 'পঞ্চরাত্রম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

১৬. ভাস, 'উরুভঙ্গম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. ভাস, 'মধ্যমব্যায়োগঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, পৃ. ১০৭

১৯. ভাস, 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২০. ভাস, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

২১. প্রাগুক্ত

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

২৬. ভাস, 'অবিমারকম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, পৃ. ১০১

২৭. ভাস, 'চারুদত্তম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যকার ভাস এক অত্যুজ্জ্বল দেদীপ্যমান নক্ষত্রসম। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আবির্ভূত হয়েও তিনি যে প্রতিভা, মননশীলতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু ভাস পরবর্তী নাট্যসাহিত্যকেই প্রভাবিত করেনি, দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁর নাট্যসাহিত্যের অবদান সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভাস তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক বিরাট মহীরূহের মতো। ভাসকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। তাই আজও ভাসের নাট্যসাহিত্য আমাদের আকর্ষণ করে। আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি ভাসের নাট্যসাহিত্যের বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু, নর-নারীর চরিত্র রূপায়ণ, ঘটনা প্রবাহের গতিধারায় এক ধরনের আকর্ষণীয় ক্ষমতা এবং সর্বোপরি ঘটনার পরিণতি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। ভাস শুধু কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাঁর নাট্যসাহিত্য রচনা করেননি; বরং তৎকালীন সমাজের প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাহিনি ও বিখ্যাত নর-নারীর চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি নাট্যসাধনায় ব্রতী হয়ে এসব চরিত্রে যেমন কল্পনাশক্তি আরোপ করেছেন, তেমনি প্রায় প্রতিটি চরিত্রকে মানবীয় রূপ দান করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা যে মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেই শাশ্বত প্রেমমাধুর্যকে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন দিয়ে নর-নারীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন এবং মানবীয় গুণাবলি আরোপ করে তাদের জীবনে সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, মান-অভিমান-বিরহ এবং আশা-নিরাশার দোলাচলে প্রতিটি চরিত্রকে মূর্ত রূপ দান করেছেন। ভাসের নাট্যসাহিত্য পাঠে আমরা তাই প্রতিটি চরিত্রকেই যেন আমাদের জীবনের আশে-পাশের চরিত্র বলেই মনে করি। ফলে ভাসের নাট্যসাহিত্য আজও প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিনোদনের এক বিরাট উৎস।

ভাসের বহুমুখী ও বিচিত্র চরিত্রসমূহের মধ্যে আমরা শুধু এ কারণেই নারীচরিত্রকে নির্বাচন করেছি যে, তাঁর নাটকের নারীচরিত্রসমূহ পুরুষচরিত্রের তুলনায় অতি জীবন্ত এবং বর্তমানকালের নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের এ যেন এক পূর্ব-ইঙ্গিতবাহী চরিত্র। এসব কিছু বিবেচনা করেই আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্বাচন করেছি "ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী: অবস্থা ও অবস্থান" এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি একজন নারী কন্যা, জায়া ও মাতা হিসেবে তার পরিবারে এবং সমাজে কী

অবস্থায় বা কী অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন কিংবা পরিবারের বাইরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তারা কোনো ভূমিকা পালন করেন কিনা, কিংবা পালন করার সুযোগ পান কিনা?

মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের সমাজব্যবস্থা এক সময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে এবং সমাজের প্রয়োজন ও নারীর দৈহিক অবয়ব, কর্মক্ষমতা কিংবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক না কেন—এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উপনীত হয়েছিল। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথেই নারী ক্রমান্বয়ে শৃঙ্খলিত হয়েছেন, তার স্বাধীনতা হারিয়েছেন, নিপীড়িতা-নির্যাতিতা হয়েছেন এবং বৈষম্যেরও শিকার হয়েছেন। নারীর জীবনে এ এক করুণ অবস্থা। অথচ নারী ও পুরুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একে অন্যের পরিপূরক। সৃষ্টির এই শাশ্বত বাণী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে উপেক্ষিত হওয়ার ফলেই নারীর জীবনে এক করুণ বিপর্যয় নেমে এসেছে। আমরা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তাই অতীতের নারীজীবনের অবস্থা ও অবস্থানের কথা জানতে চেষ্টা করেছি এবং তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ঘেরাটোপে আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীদের অবস্থা ও অবস্থান কী রূপ ছিল এবং আমাদের পূর্বসূরি চিন্তকেরা তাদের সম্পর্কে কি ধরনের মনোভাব পোষণ করেছেন।

আমাদের মনে হয়েছে, সংস্কৃতসাহিত্যের বিশাল ক্যানভাসে ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহ তৎকালীন সমাজব্যবস্থার এক প্রকৃত প্রতিফলন। আর আমরা তাই ভাসের নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থানের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি। এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে ভাস-পূর্ব অশ্বঘোষ পর্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্যে বিধৃত নারীজীবনের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি।

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বিশাল বৈদিকসাহিত্যের আলোচনায় লক্ষ করেছি যে, বৈদিকযুগের নারীসমাজ পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের তুলনায় অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, সমাজে তাদের এক ধরনের গৌরব এবং মর্যাদাও ছিল। জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষা, ললিতকলা, সামরিক কলা-কৌশল, চিকিৎসাবিদ্যা, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণায় তারা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন। আমরা এক্ষেত্রে রোমশা (লোমশা), লোপামুদ্রা, অপালা, ঘোষা, বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, বিশ্‌পলার, মুদ্‌গলানী প্রমুখ নারীর নাম উল্লেখ করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারি—যাঁরা আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। আমরা আরো দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বৈদিক সমাজব্যবস্থায় একজন নারী শুধু স্ত্রী, জননী বা কন্যাই নন; একজন নারী পুরুষের মতোই একজন মানুষ এবং মানুষ হিসেবে তার যে অধিকার ভোগ করার কথা তাই তারা ভোগ করতেন।

বৈদিকযুগ-পরবর্তী মহাকাব্যের যুগে আমরা মূলত রামায়ণ ও মহাভারতে বিধৃত নারীজীবনের অবস্থা ও অবস্থান বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছি যে, এই যুগে নারীর জীবন নানা জটিলচক্রে আবদ্ধ হয়েছে। একদিকে, পুরুষশাসিত সমাজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কারণে, অন্যদিকে, ধর্মের নিগূঢ় বন্ধনে নারীকে প্রায় আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়েছে। তবে ঘটনার আকস্মিকতায় রামায়ণ ও মহাভারতের বেশ কয়েকজন নারী যেমন, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, মন্থরা এবং সত্যবতী, অম্বা পারিবারিক জীবনের বাইরেও ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছেন। তবে আমরা সার্বিকভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, এই মহাকাব্যের যুগে পুরুষের আধিপত্য, অসমশক্তি ও ক্ষমতা, সামাজিক বাধা-নিষেধ, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার নারীর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করেছে; তাদেরকে শুধু নারী হিসেবেই বিচেনা করেছে; কখনো পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে বিবেচনা করেনি।

মহাকাব্যযুগ পরবর্তী যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচিত হয়—তার মধ্যে আমরা *মনুসংহিতা* ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছি।

মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থ। এই শাস্ত্রীয় গ্রন্থে নারীদের অবদমনের বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান এবং লক্ষণীয়। পারিবারিক জীবনে যেমন, তেমনি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিকগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে—যা নারীজীবনের মান-মর্যাদাকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। তবে এর পাশাপাশি আমরা একথাও বলেছি যে, মনু তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা বিবেচনা করেই নারীর উপর এরূপ তীব্র আক্রমণ করেছেন। মনু সমাজের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য শুধু নারীকে দায়ী করেই একটি সুস্থিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেছেন—যাকে আমরা একদেশদর্শী ও পক্ষপাতমূলক পরিচয়বহনকারী বলে মনে করতে পারি। তাই বলা যায় যে, মনুসংহিতায় পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান তেমন সুদৃঢ় ছিল না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর অবদমনের বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। পরিবারের বাইরে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ নারীর বিভিন্ন ভূমিকা থাকলেও তাদের উপর আস্থা স্থাপন না করার বিষয়ে কৌটিল্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাজশাসনের বিধি-ব্যবস্থা সম্বলিত শাসককুলের সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বিভিন্ন দিক আলোচনার পাশাপাশি নারীজীবনের বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরেছেন এবং রাষ্ট্রকে সুরক্ষার জন্য তিনি নারীর প্রতি অধিক নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তবে মনুসংহিতার মতো কৌটিল্যও নারীর প্রতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। সবকিছু মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সুদৃঢ় ছিল না।

ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার জন্য আমরা বৈদিকসাহিত্য, মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত, শাস্ত্রগ্রন্থ *মনুসংহিতা* এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীজীবনের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বৈদিকসাহিত্যে কিছুটা নমনীয় লক্ষ করা গেলেও উক্ত অন্যান্য সাহিত্যে তা সুদৃঢ় ছিল না। বৈদিকসাহিত্যে নারীদের নিয়ে যে আশার আলো সঞ্চিত হয়েছিল, তা কালের পরিক্রমায় সমাজ বিবর্তনের ধারায় এবং সমাজকাঠামো পরিবর্তন তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে সীমিত হয়ে এসেছে।

ভাস-পূর্ব ধ্রুপদী সংস্কৃতসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা অশ্বঘোষ বিরচিত বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে নারীজীবনের রূপায়ণ এবং নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান আলোচনা করেছি। অশ্বঘোষের রচনাতেও আমরা লক্ষ করেছি যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীদের যে অবস্থা ও অবস্থান ছিল, অশ্বঘোষের নারীচরিত্রগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নাট্যকার ভাস-বিরচিত নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নির্ধারণ করেছি। এক্ষেত্রে আমরা যেমন ভাসের সমগ্র নাট্যসাহিত্য এবং তাঁর নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্রসমূহের বিচার-বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছি, তেমনি প্রতিটি নারীচরিত্রকে তার পারিবারিক জীবনে কন্যা, বধূ, মাতা হিসেবে অবস্থা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিকজীবনে তাদের অবস্থানের দিকটি তুলে ধরেছি।

আমরা ভাসের নারীচরিত্রসমূহের অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, কালের পরিক্রমায় ভাসের নাটকের নারীচরিত্রসমূহ উন্নত হওয়ার চেয়ে অধোগতি লাভ করেছে যা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

মহাকাব্যযুগে রচিত রামায়ণের নারীচরিত্রসমূহ আর ভাসের রামায়ণ-আশ্রিত নাটকের নারীচরিত্রের অবস্থা ও অবস্থানের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য আমরা লক্ষ করিনি। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় অভিজাত নারীরা যেমন রাজঅন্তঃপুরের কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে জীবন অতিবাহিত করেছেন, ঠিক ভাসের রামায়ণ-আশ্রিত নাটকগুলোর মধ্যেও অভিজাত নারীরা রাজঅন্তঃপুরের কার্যাবলির মধ্যে থেকেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। অথচ তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার উত্থান-পতনে রাজঅন্তঃপুরের অভিজাত নারীরা ইচ্ছা করলেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতেন; কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা তা করতে দেয়নি। পুরুষের অসীম ক্ষমতায় রাজঅন্তঃপুরের অভিজাত নারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। যেমন, আমরা দেখি, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে কিংবা বনবাস গমনে স্ত্রী হিসেবে সীতার যে ভূমিকা পালন করার কথা, শুধুমাত্র সমাজ-সংস্কার কিংবা ধর্মের নামে তা তিনি পালন করতে পারেননি। কৈকেয়ীর রাজনৈতিক চক্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও অবশেষে তাঁকে পূর্ব-অভিশাপের দোহাই দিয়েই কাঙ্ক্ষিত কাজটিকে সম্পন্ন করতে হয়েছে। নাট্যকার ভাস রামায়ণ-পরবর্তী যুগের মানুষ হয়েও কল্পনায় রাজঅন্তঃপুরের অভিজাত নারীদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। তাই আমরা বলতে পারি, অভিজাত শ্রেণির নারীরা পারিবারিক অবস্থার দিক থেকে কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা পেলেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালনের সুযোগ পাননি। তবে রানি কৈকেয়ী ও দাসী মন্থরা ব্যতিক্রমভাবেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং রাজনীতিতে আপাত সাফল্য লাভ করেন। অবশ্য এই ঘটনাটি একটি বিরল ব্যতিক্রম। কিন্তু একই সঙ্গে ভাস তাঁর রামায়ণ-আশ্রিত নাটকে যেসব নিম্নশ্রেণির তথা শ্রমজীবী শ্রেণির নারী অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাদের প্রতি কিছুটা হলেও উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। অথবা আমরা বলতে পারি, সমাজে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের তেমন অবমূল্যায়ন করেননি।

মহাকাব্য মহাভারতের নারীচরিত্রসমূহের সঙ্গে ভাসের মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটকসমূহের নারীচরিত্রের মধ্যে আমরা গুণগত কোনো পার্থক্য লক্ষ করিনি। প্রায় সমসাময়িককালে দুটি মহাকাব্যই রচিত এবং এই দুটি মহাকাব্যেই তৎকালীন সমাজব্যবস্থার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। ভাসের রামায়ণ-আশ্রিত নাটকের নারীচরিত্রের মতো মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটকের নারীচরিত্রও প্রায় একই সমাজের অন্তর্গত এবং তারা একই পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন, প্রায় একই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অবস্থানে থেকেছেন। রামায়ণের মতো মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটকের অভিজাত নারীরা পারিবারিক অবস্থার দিক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

রাজঅন্তঃপুরের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পেলেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকলেও তারা সে ভূমিকা পালন করতে পারেননি। আমরা আমাদের আলোচনায় বলার চেষ্টা করেছি যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কারণেই এই অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ভাস রামায়ণ-আশ্রিত নাটকের শ্রমজীবী নারীদের প্রতি যে উদার মনোভাব পোষণ করেছেন, মহাভারত ও কৃষ্ণকথা-আশ্রিত নাটকের শ্রমজীবী নারীদের প্রতিও একই উদার মনোভাব পোষণ করেছেন।

ভাসের ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি-আশ্রিত নাটকের নারীচরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছি যে, ভাস প্রত্যক্ষভাবে নারীকে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপন করেছেন— যা ভাসের পূর্ববর্তী নাটকসমূহ থেকে অত্যন্ত ব্যতিক্রম। এদিক থেকে নারীকে পারিবারিক জীবনের বাইরে এনে সামাজিক ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টিকে আমরা আন্তরিকভাবেই স্বাগত জানাই। কিন্তু ভাস যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন—সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভাস শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের অভিলাষেই নারীকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন। নারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে রাজ্য-উদ্ধার, সৈন্যবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নাটকের ঘটনা বিন্যাসে নারীকে একদিকে যেমন মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি চারিত্রিক শুদ্ধতার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় কিংবা চারিত্রিক শুদ্ধতার জন্য প্রস্তুত থাকা যে একজন নারীর জন্য অবমাননাকর তা ভাসের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাই আমরা বলতে পারি, ভাসের নিকট রাজ্য-উদ্ধারের ঘটনাই মুখ্য হয়ে দাড়িয়েছে; আর নারীর অবমাননার বিষয়টি গৌণ স্থান পেয়েছে। এ দুটি নাটকেও ভাস পূর্বের নাটকগুলোর মতোই শ্রমজীবী নারীদের প্রতি একই উদার মনোভাব পোষণ করেছেন।

ভাস-বিরচিত পৌরাণিক ও কল্পনা-আশ্রিত নাটকের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন মানবীয় প্রেম-প্রীতির কথা জানতে পারি, তেমনি তৎকালীন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অবস্থার কথাও জানতে পারি। ভাস এ পর্যায়ে প্রচলিত প্রথার বাইরে এসে এক নগরগণিকাকে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে রূপদান করার অসীম সাহস দেখিয়েছেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এবং আজও নগরগণিকা উপেক্ষিতা, অবহেলিতা ও মর্যাদাহীনা। ভাস এই নগরগণিকাকে আমাদের নিকট সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সংস্কৃতিমনা নারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। শুধু

Dhaka University Institutional Repository

তাই নয়, এই নগরগণিকার নিজ জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা এবং প্রেমিক মন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তৎকালীন সমাজ তার সুরক্ষার প্রতি কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই আমরা দেখি, তার স্বভাবের চেয়ে জন্মদোষকেই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে রাজবংশীয় ব্যক্তি দ্বারা আক্রমণ করে তাকে নিগৃহীত করা হয়েছে। সমাজ-সংসার বা রাষ্ট্র এর কোনো প্রতিবাদ করেনি। এ বিষয়টি ভাসের নারীদের প্রতি এক ধরনের অবহেলা বা উদাসীনতা কিংবা প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় গণিকার জীবন ও মর্যাদার প্রতি এক ধরনের উপেক্ষা বলেই আমরা মনে করেছি।

ভাসের সমগ্র নাট্যসাহিত্যের নারীচরিত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সামগ্রিক বিচারে প্রাচীন ভারতের বৈদিকসাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বেশ উন্নত হলেও সমাজ বিবর্তনের ক্রমধারায় রামায়ণ, মহাভারত, *মনুসংহিতা*, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম ইত্যাদিতে নারীর সামগ্রিক অবস্থা উন্নত হওয়ার পরিবর্তে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অঙ্গনে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের অধোগতিই হয়েছে। সুদূর বৈদিকসাহিত্য থেকে ভাস পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণির নারীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; কিন্তু অবস্থানের দিক থেকে অভিজাত ও শ্রমজীবী দুই-ই সমান। তারা পুরুষের সমস্তরে তো যায়-ই নি; বরং ক্ষেত্র বিশেষে দুই ধরনের নারীই পুরুষের নিগ্রহের শিকার।

পারিবারিক অবস্থার বাইরে যে সমস্ত অভিজাত নারী ঘটনাক্রমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে, তা নিতান্তই বিরল ঘটনা। এই বিরল ঘটনাকে আমরা কোনোভাবেই সামাণ্যীকরণ (Generalization) করতে পারি না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সর্বস্তরের নারীই কম-বেশি পুরুষতন্ত্রের নিগ্রহের শিকার। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সাফল্যের যুগে আমাদের সামগ্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হলেও নারীর সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থান প্রায় একই রূপ থেকে গেছে। যে সামান্য পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, তা যেমন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নয়, তেমনি আশানুরূপও নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের প্রতি পুরুষদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হলে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। অথচ আমাদের প্রত্যাশা, পুরুষদের এই দৃষ্টিভঙ্গির আশু পরিবর্তন হবে। আর এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা বৈদিকযুগ থেকে ভাস পর্যন্ত নাট্যসাহিত্যের নারীর অবস্থা ও অবস্থানের একটি অনুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল, মানুষের চিন্তাধারাও তেমনি পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার হাত ধরেই মানবসভ্যতার অগ্রগতি এবং ক্রমবিকাশ হয়ে আজকের সভ্যতায় উপনীত হয়েছে। বর্তমান এই উন্নত

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যতায় মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। লিঙ্গ দিয়ে বিবেচনা করা অভিপ্রেত নয়, সমীচীনও নয়। মানুষ মানুষই। একজন পুরুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে, একজন নারীরও তদ্রূপ ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই নারী শুধু নারী নয়, নারী পুরুষের মতোই স্বমর্যাদায় মহীয়ান একজন মানুষ। এই চেতনাবোধ জাগ্রত হলেই নারী পুরুষের সমাধিকার অর্জন করবে, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর হবে। একটি সুস্থিত ও সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস

ভাস, 'অবিমারকম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১২খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২

ভাস, 'অভিষেকঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০

ভাস, 'উরুভঙ্গম্,' *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০

ভাস, 'কর্ণভারম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১২খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২

ভাস, 'চারুদত্তম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮১

ভাস, 'দূতঘটোৎকচম্' *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০

ভাস, 'দূতবাক্যম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০

ভাস, 'পঞ্চরাত্রম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯

ভাস, 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১

ভাস, 'প্রতিমানাটকম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*,' ১খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯

ভাস, *প্রতিমানাটকম্*, শ্রীজগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৭

ভাস, 'বালচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮১

ভাস, 'মধ্যমব্যায়োগঃ', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১০ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১

ভাস, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯

ভাস, *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর (সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮১

ভাস, *স্বপ্নবাসবদত্তম্*, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪১১সন

দ্বৈতীয়িক উৎস

গ্রন্থ : বাংলা

অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ (অনূদিত ও সম্পাদিত), *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৪

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৩৬৯

অশ্বঘোষ, 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯

অশ্বঘোষ, 'সৌন্দরনন্দম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০

অশ্বঘোষ, 'শারিপুত্রপ্রকরণম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১

আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী* (বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮

আহমাদ মাযহার, *রবীন্দ্রনাথ নারী বাংলাদেশ*, জাগৃতী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯

এমাজউদ্দীন আহমদ ও হারুণ-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৭

কালিদাস, 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮১

কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত), *মহাভারত*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, রাজসংস্করণ, তুলি-কলম, ১৯৮৭

কো. আন্তোনভা, গ্রি. বোন্গার্দ-লেভিন প্রমুখ, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২

ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রী, *প্রাচীন ভারতে নারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৭

গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত), *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী*, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯২, ২য় ভাগ, নবম সংস্করণ, ১৯৯১ এবং ৩য় ভাগ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯১

গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়, *বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, বিশ্ব জ্যোতির্বিদ সঙ্ঘ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৭৬ সাল

চৈতালী দত্ত, (সম্পাদনা ও ভাষান্তর), *মনুসংহিতা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮

জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, শ্রী, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, [বৈদিক ও লৌকিক] সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯০

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রী, *বাঙালীর সারস্বত অবদান*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৮

দীনেশ চন্দ্র সেন, শ্রী, *বাংলার পুরনারী*, দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৩৯

Dhaka University Institutional Repository

দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৯৯

ধনঞ্জয়, *দশরূপক* (বঙ্গানুবাদ), ড. বিষ্ণু বসু, কলকাতা, ১৩৮১

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *মহাভারতের নারী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ২০১০

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য *মহাভারতের একশোটি দুর্লভ* মুহূর্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১১

ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *রামায়ণ*, (প্রকৃতি, পর্যাবরণ ও সমাজ), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৩

পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত (সম্পাদিত), *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৩

পূরবী বসু, *নোবেল বিজয়ী নারী: গৃহে কর্মে সংগ্রামে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

পূরবী বসু, *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩

প্রত্যুষকুমার রীত *ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় রামায়ণ-মহাভারত চর্চা* প্রসঙ্গ: *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, লোক সেবা শিবির, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩

প্রদীপ রায় (অনূদিত), *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* (মূল Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*) অবসর, ঢাকা, ২০০৩

ফিওদর করোভকিন, *পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬

বশীর রায়হান, (বাংলায় ভাষান্তর), *দ্য প্রিন্স*, (মূল Niccolo Machiavelli, *The Prince*), প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৮

বাণভট্ট, 'হর্ষচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৮ খণ্ড, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭

বিজনবিহারী গোস্বামী, শ্রী, (অনূদিত ও সম্পাদিত), *অথর্ববেদ*, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২

বিনোদবিহারী গোস্বামী, শ্রী (অনূদিত ও সম্পাদিত), *যজুর্বেদ সংহিতা*, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৬

বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ* বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৬৯

বুদ্ধদেব বসু, *মহাভারতের কথা*, এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮১, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪২০

ভরত, *নাট্যশাস্ত্রম্*, পণ্ডিত কেদারনাথ সাহিত্যভূষণ (সম্পাদিত), ভারতীয় বিদ্যাপ্রকাশন, দিল্লী, বারাণসী, ১৬৮৩

ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, এম. রামকৃষ্ণ কবি (সম্পাদিত), গায়কোয়াড ওরিয়েন্টাল সিরিজ নং-৬৮, ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরোদা, ১৯৩৪

ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, ৩ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৬

ভি, বেঙ্কটাচলম্, *ভাস*, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৯৫

মনোমোহন ঘোষ, *প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা*, বিশ্বভারতী, ১৩৫২ সাল

মলয়কুমার ভট্টাচার্য্য, *ভাসের নাট্যপ্রতিভা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬

মহর্ষি বাল্মীকি, আদিকবি, *রামায়ণম্*, প্রথম খণ্ড, আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী (অনুবাদ, আলোচনা, সম্পাদনা), নিউলাইট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬

মহর্ষি বাল্মীকি, আদিকবি, *রামায়ণম্*, দ্বিতীয় খণ্ড, আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী (অনুবাদ, আলোচনা, সম্পাদনা), নিউলাইট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ৩ খণ্ড, আদিপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

মহর্ষি- শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ৪ খণ্ড, আদিপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

মহর্ষি- শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ৫খণ্ড, সভাপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

মহর্ষি- শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ৬ খণ্ড, বনপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

মহর্ষি- শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ৭ খণ্ড, বনপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

মহর্ষি- শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ১৩ খণ্ড, উদ্‌যোগপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

মহর্ষি- শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ১৫ খণ্ড, উদ্‌যোগপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

মহর্ষি- শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, ৩১ খণ্ড, স্ত্রীপর্ব্ব, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, (কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র), দ্বিতীয় খণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০১

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, (কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র), প্রথম খণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০২

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদিত ও অনূদিত), *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৬

মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২

মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পাদিত), *আমি নারী*, (তিনশ বছরের (১৮-২০ শতক) বাঙালী নারীর ইতিহাস), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪

মাহমুদা ইসলাম, *নারী: ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, *প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২

যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়*, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৫

রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, দ্বিতীয় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬

রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত), *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, প্রথম খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭

রাজশেখর বসু, *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত* (সারানুবাদ), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৯৪

রাজশেখর বসু, *বাল্মীকি রামায়ণ* (সারানুবাদ), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৯৬ সাল

রাধাগোবিন্দ বসাক (সম্পাদিত), *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স, প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮০

রাধাগোবিন্দ বসাক (সম্পাদিত), *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স, প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৮৯

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*, সাহিত্য নিকেতন, কলিকাতা, ১৯৭৪

সাগরনন্দী, *নাটক লক্ষণরত্নকোষ*, শ্রী সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৮৫

সিরাজ সালেকীন, *ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

সিরাজ সালেকীন, *রবীন্দ্রচেতনায় নারী*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

সুকুমারী ভট্টাচার্য, *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১

সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০১

সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৬

সুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, শ্রী, সপ্ততীর্থ, *মহাভারতের চরিতাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৩, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৭৯, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১৬

সুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, শ্রী, সপ্ততীর্থ, *রামায়ণের চরিতাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৬, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৬

সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, জেন্ডার গ্রন্থমালা ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন*, জেন্ডার গ্রন্থমালা ৩, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা*, জেন্ডার গ্রন্থমালা ৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর*, জেন্ডার গ্রন্থমালা ৫, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭

সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, জেন্ডার গ্রন্থমালা ৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮

সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী ও সমাজ*, জেন্ডার গ্রন্থমালা-২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৯

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৭০

প্রবন্ধ : বাংলা

অভিজিৎ রায়, 'রবীন্দ্র-জীবনে নারী : একটি বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীয় অনুসন্ধান', *ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এক রবি–বিদেশিনীর খোঁজে*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫

অভিজিৎ রায়, 'রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা এবং ওকাম্পো–প্রভাব', *ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এক রবি–বিদেশিনীর খোঁজে*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

করুণাসিন্ধু দাস, 'অর্ধেক মানবী', নারীবিদ্যা-১, *নক্ষত্র*, XLI বর্ষ, ১৯৩-১৯৪ (নারী ও শারদ) সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১, কলকাতা, ভারত

করুণাসিন্ধু দাস, 'ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে শুধু তোমারে জানি', নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (পঠিত ১১-০২-২০১৩ তারিখ এবং অপ্রকাশিত)

চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী, 'মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পটভূমিকায় নারীজীবন', *প্রতীচী*, প্রথম আন্তর্জাতিক বাংলা পত্রিকা, প্রমথনাথ বিশী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রকাশন, দ্বিতীয় বর্ষ, নিদাঘ সংখ্যা, ২০০৫

দীপিকা ঘোষ, 'নারীর ক্ষমতায়ন', *বিষয় রবীন্দ্রনাথ*, গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম গ্রাফোসম্যান সংস্করণ, ২০১৪

দীপিকা ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্র', *বিষয় রবীন্দ্রনাথ*, গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম গ্রাফোসম্যান সংস্করণ, ২০১৪

নৃপেন্দ্রলাল দাশ, 'মহাভারতের নিবিড় পাঠ', সংবাদ (দৈনিক পত্রিকা), ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৫ চৈত্র, ১৪১৮

পূরবী বসু, 'পুরাণের পঞ্চকন্যা : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নবরূপায়ণ', *কালি ও কলম*, (সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা), নবম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আষাঢ় ১৪১৯, জুন ২০১২, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফেরদৌসী হক, 'বিষবৃক্ষ : বঙ্কিমচন্দ্রের নারী' *ভারত বিচিত্রা*, নান্টু রায় (সম্পাদিত), ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা জুন, ২০১১

ফেরদৌসী হক, ' চোখের বালি : রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারী', *ভারত বিচিত্রা*, নান্টু রায় (সম্পাদিত), ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১২

ফেরদৌসী হক, 'রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে নারী', *ভারত বিচিত্রা*, নান্টু রায় (সম্পাদিত), ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা, আগস্ট, ২০১২

বাসুদেব ঘোষ, 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদে ও মনুসংহিতায়', *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, চুয়াল্লিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১ (প্রকাশ কাল ফেব্রুয়ারি ২০০২)

মনোজিৎকুমার দাস, 'অন্ধকার বৃত্তে অবরুদ্ধ সেকালের মেয়েরা', *ভারত বিচিত্রা,* নান্টু রায় (সম্পাদিত), ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা, মার্চ, ২০১২

মানসুরা হোসাইন, 'নারীর ক্ষমতায়ন : লক্ষ্য অর্জনে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ', প্রথম আলো (দৈনিক পত্রিকা) ঢাকা, বাংলাদেশ, সোমবার, ১৫ নভেম্বরর, ২০১০

মালবিকা বিশ্বাস, 'সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব ও সাহিত্যে অপ্রধান রূপক' *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, জুলাইঃ ১৯৯৬, শ্রাবণ , ১৪০৬, প্রকাশকাল ১৯৯৯

মালবিকা বিশ্বাস, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্ : নামকরণ প্রসঙ্গ পুনর্বিবেচনা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যাঃ ৬৯, ফেব্রুয়ারি ২০০১

মালবিকা, বিশ্বাস, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে নারীজীবনের রূপায়ণ', *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ২-৩, আষাঢ় ১৪২০, জুন ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রাচীন সাহিত্য' *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৭

রিফাত আরা শাহানা, 'নারী ও মানুষ', *বেগম*, ঈদ সংখ্যা, ২০১২, ঢাকা, বাংলাদেশ

লাইলা খালেদা, 'নারীর প্রতি সহিংসতা', *বেগম*, ঈদ সংখ্যা, ২০১২, ঢাকা, বাংলাদেশ

সাদিয়া আফরোজ মুক্তি, 'নারী জাগরণের শতবর্ষে আমাদের করণীয়', *বেগম*, ঈদ সংখ্যাা, ২০১২, ঢাকা, বাংলাদেশ

সাধনকুমার ভট্টাচার্য, 'ভারতীয় নাট্য-চিন্তা', ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, ৩ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২

সাবিনা ইয়াসমিন, 'নজরুলের গল্পে নারীর অবস্থা ও অবস্থান', *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বর্ষ : ৫২, সংখ্যা : ১, অক্টোবর, ২০১৪

স্বপন বসু, 'স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন ও বাঙালী সমাজ', নারীবিদ্যা-২, *নক্ষত্র*, XLI বর্ষ, ১৯৩-১৯৪ (নারী ও শারদ) সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১, কলকাতা, ভারত

গ্রন্থ : ইংরেজি

Ayyar, A. S. P., *Bhasa*, Madras, edition, 1957

Ayyar, A. S. P., *Two Plays of Bhasa*, Madras, 1941

Baumer, Rachel Van M. and Others, *Sanskrit Drama in Performance,* Vol. 11, Edited, 1st Indian Edition: 1993, 1st published: University of Hawaii Press, Delhi, 1981

Bhasa, *Svapnavasavadatta*, M. R. Kale (edited), Delhi, 1982

Bhasa, *Swapnavasavadattam*, Kumudranjan Roy (edited), Sanskrit Book Depot., Calcutta, 1971

Bhat, G.K. Dr., *Bhas-Studies*, (Collected papers, Vol. 1) Kolhapur, 1968

Bhattacharji, Sukumari, *Literature in the Vedic Age*, Vol.1, The Samhitas, K P Bagchi & Company, Calcutta, First Published, 1984

Bhattacharji, Sukumari, *Literature in the Vedic Age,* Vol., 2, Brahamanas, Araynakas, Upanisads and Sutras, K P Bagchi & Company, Calcutta, First Published, 1986

Bhattacharya, Biswanath, *A Critical Survey of Bhasa's Mahabharatan Dramas,* Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, First Published, 1991

Dasgupta, S.N., and S. K. De, *A History of Sanskrit Literature: Classical Period,* Vol., 1, University of Calcutta, 1947

Dhaka University Institutional Repository

Devadhar, C.R., (ed.), *Bhasanataka Cakram*, Poona, 1937

Devadhar, C.R., *Plays Ascribed to Bhasa*, Pune, 1927

Ghosh, Monomohan, Dr. (translated and edited), *The Natyasastra*, Vol. 1, Manisha, Calcutta, India, Revised Third Edition, 1995

Goswami, Krishnagopal, Professor (Critically edited), *Bhasa: Pañcaratram*, Goswami Prakasani, Calcutta, 1977

Guhathakurta, Meghna (edited), *Contemporary Feminist Perspectives*, the University Press Limited, Dhaka, Bangladesh, First Published, 1997

Jagirdar, R.V., *Drama in Sanskrit Literature*, Bombay, 1947

Kane, P.V. Mahamahopadhyaya (edited), *The Harshacarita of Banabhatta,* Delhi, India, 1997

Keith, A. B., *A History of Sanskrit Literature*, London, 1928

Keith, A. B., *The Sanskrit Drama*, Oxford, 1924

Khosla, Sarla, *Aśvaghosa and his Times*, Intellectual Publishing House, New Delhi, 1st edition, 1986

Krishnamachariar, K., *History of Classical Sanskrit Literature*, Madras, 1937

Macdonell, A.A., *A History of Sanskrit Literature*, London, Reprinted: Delhi, 1997

Mainkar, T. G., *Studies in Sanskrit Dramatic Criticism*, Varanasi, 1971

Mehta, Tarla, *Sanskrit Play Production in Ancient India,* Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, First Edition, 1995

Miles, Rosalind, *The Women's History of the World*, Salem House, Massachusetts, 1988

Pisharoti, A. Krishna, *Bhasa's Works: A Criticism,* Trivendrum, 1925

Pusulker, A. D., *Bhasa: A Study,* Delhi, 1968

Ram, Sadhu, *Essays on Sanskrit Literature,* Munshiram Manoharlal Oriental Booksellers and Publishers, Delhi, First Edition, 1965

Rao, Amiya and B.G. Rao, *Three Plays of Bhasa : A New Translation*, Orient Longman, New Delhi, 1971

Rao, M.V. Krishna, *Studies in Kautilya*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Delhi, Third revised edition, 1979

Dhaka University Institutional Repository

Richmond, Farley P., Darius L. Swann, and Others (edited), *Indian Theatre*, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, First Indian Edition, 1993

Satya Shrava, M.A., *A Comprehensive History of Vedic Literature*, (Brahmana and Aranyaka Works), Pranuva Prakashan, New Delhi, First Edition, 1977

Shastri, Ganapati, M. M. T., *Bhasa's Plays: A Critical Study*, Trivendrum, 1925

Unni, N.P. Dr., *New Problems in Bhasa's Plays*, Trivendrum, 1978

Unni, N.P., *Kautilya Arthasastra* (a study), Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi, 1983

Wells, H.W., *Classical Drama of India,* Calcutta, 1963.

Winternitz, Maurice, *A History of Indian Literature,* Vol. 1, First Edition, Delhi, 1981, Reprint, 1996

Winternitz, Maurice, *A History of Indian Literature*, Vol. II, Munshiran Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, Third edition, 1991

প্রবন্ধ : ইংরেজি

Bhasa : æThe Sanskrit Dramatist", http://www.google.com

Das, Subhamoy, æFour Famous Female Figures of Vedic India", http://www.about.com

Jayaswal, Kashi-Prasad, æThe Plays of Bhasa, and King Darsaka of Magadha", *Journal of Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. IX, 1913

Jha, Bijay Kumar and Dr. G.S. Rathore, æMahakavi Bhasa: Father of Indian Drama", http://www.google.com

'Kautilya', http://www.britannica.com

Prasad, J.S. R.A., Dr, æThe Place of Women in Sanskrit Literature", http://www.google.com

Pusalkar, A.D., æThe Ramayana : Its History and Character", in *Cultural Heritage of India*, 2nd edition, Calcutta: Ramakrishna Misson, Institute of Culture, 1969, Vol. 2

æStatus of Women in the Vedas and Vedic Society", http://www. google.com

æWomen in Manu", http://www.google.com

Dhaka University Institutional Repository